সারস্বত-গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ৫

প্রেমিক-গুরু

বা

প্রেমভক্তি ও সাধন পদ্ধতি

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

—ভক্তিতত্ত্ব।

পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ পরমহংস
প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

১৩৩১ বঙ্গাব্দ

[মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হইতে
শ্রীকুমার চিদানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
২৩৮নং নবাবপুর রোড ঢাকা, জাহ্নবী-প্রেসে
প্রিণ্টার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ তৎ সৎ

উৎসর্গ পত্র

দেবি !

হৃদয়-মন্দিরে মানস-মুকুরে
তুলেছি তোমার "ফটো"
আর তার মাঝে কত স্থান আছে
এ হৃদি নহে'ত ছোট।

তোমার সাধের জড় জগতের
প্রীতির যতেক আছে,
সকল আনিয়া দিব সাজাইয়া
ঐ প্রতিমার কাছে।

সন্ধ্যায় উষায় শুভ্র জ্যোছনায়
রাখিব দুয়ার খুলি,
নিভৃত কুটিরে হেরিয়া তোমারে
আপনা যাইব ভুলি।

সহস্র ওঙ্কারে জপিব তোমারে
স্থাপিয়া হৃদয়-পটে ;
শারদী সেফালী অর্পিব অঞ্জলি
ও রাঙা চরণ-তটে।

প্রেমময়ি! তোমার প্রেম প্লাবনের "পলি" পড়িয়াই না এ উষর-হৃদি সরস হইয়াছিল! আমি অন্ধকারমাঝে দিশেহারা হইয়া ঘুরিতে ছিলাম, তুমিই না প্রথমে প্রেমের আলো জ্বালিয়া হৃদয় দেখাইয়াছিলে? তুমিই গুরুরূপে এ সুপ্ত প্রাণে প্রেমবীজ উপ্ত করিয়া ছিলে। সেই বীজে বৃক্ষ জন্মিয়া কিরূপ ফুল-ফল প্রসব করিতেছে, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই "প্রেমিক-গুরু" পুস্তকখানি তোমার উদ্দেশে নিবেদন করিলাম।

আর একটী কথা—কিন্তু রাজরাজেশ্বরীকে সে কথা বলিতে ভিখারীর স্বতঃই সাহস হয়না!—এই ফুলে চখের জল মিশাইয়া তোমার পূজা না করিলে আমার যে তৃপ্তি হইবে না। এস, রসময়ি! মনোময়ী মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়াসনে বসিয়া পূজা লও। তোমার প্রেম-পাথারে আমার প্রেম-প্রবাহ মিশিয়া লয় হইয়া যাউক—সিন্ধুতে বিন্দু মিলিত হউক। ওগো! তাই তোমায় ডাকি—

করুণা করিয়া—প্রেমে ভাসাইয়া—পাষাণ গলায়ে যাও।

আসিয়া আমার উপহার গ্রহণ কর।

তোমার প্রেম-ভিখারী—

শ্রীনলিনীকান্ত

গ্রন্থকারের বক্তব্য

শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মুক্তাফলভূষিতদিব্যমূর্ত্তিম্ ।
বামাঙ্গপীঠে স্থিতদিব্যশক্তিং মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপানিধানম্ ॥

এই ধ্যান-লক্ষ্য কল্পতরু শ্রীগুরুর কৃপাকণা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রেমভক্তিলাভ করা যাইতে পারে না; সেই প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধুর বিন্দু দয়াতে "প্রেমিক-গুরু" অদ্য সাধারণের করে প্রেমানন্দভরে অর্পণ করিলাম।

প্রেমভক্তি অহেতুক; সাধু গুরুর কৃপাই তাহার একমাত্র হেতু। প্রেমময় ভগবান্ কিম্বা তাঁহার ভক্তের কৃপা ব্যতীত লাভ করা যায়না এবং যে ভক্তির কথা শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, সেই প্রেমভক্তিতত্ত্ব ভাষার সাহায্যে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সেইজন্য প্রেমভক্তি প্রভৃতির কথায় প্রায়ই এখন বাগাড়ম্বর ও ভাব এবং ভাষার একটা কৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভক্তি স্বতঃই হৃদয়গ্রাহিনী —তাই ভক্তির কথা শুনিলে বুদ্ধিমানের হৃদয় পুলকিত ও সাধুর হৃদয় আনন্দযুক্ত হয় এবং ভক্তের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। এহেন ভক্তিতত্ত্ব —ভক্তিহীন আমি—কিরূপে প্রকাশ করিব?

যাঁহার কৃপায় পঙ্গু সচল হয়,—মূক বাচাল হয়, তাঁহারই কৃপাদেশে আমি "প্রেমিক-গুরু" লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। এই পুস্তকের সুন্দর অংশগুলি শ্যামসুন্দরের দ্যুতি, আর নিকৃষ্ট অংশগুলি আমারই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত স্বরূপতঃ এক; সুতরাং ভক্তি

ভগবানের ন্যায় সর্ব্বথা পূর্ণ। যদি এই গ্রন্থে ভক্তির সেই পূর্ণতা বিকশিত না হইয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার।

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি প্রভৃতির নানাপ্রকার ভেদভাব বর্ত্তমান থাকিলেও ভক্তিতত্ত্ব স্বরূপতঃ একই প্রকার। ভক্তির সাধন আরম্ভ করিয়া প্রেমলাভ পর্য্যন্ত সাধকের ক্রমোন্নতি অবস্থার এক একটী স্তরের নামানুসারে ভক্তিও নানা নামে বিভক্ত হইয়াছে। তবে প্রেমলাভই ভক্তমাত্রের চরম-লক্ষ্য। আমরাও এই পুস্তকে সাধন-ভক্তির বৈধী অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ অসমোর্দ্ধ-প্রেম-মাধুর্য্যলাভ ও তদবস্থার বিষয় বিবৃত করিয়াছি। প্রেমভক্তির কোন অঙ্গই আমরা পরিত্যাগ করি নাই। বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজে প্রেমভক্তির যত প্রকার সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে, এই পুস্তকে তাহার সকলগুলিই আলোচিত হইয়াছে। কারণ পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিতে হইবে। কেবলমাত্র একটী বিশুদ্ধ পন্থা প্রকটিত করিলে সকলের অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। মানব মাত্রেরই প্রতিভা, প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং স্ব স্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী সাধনপন্থা না পাইলে, সাধারণের উপকারের আশা অতি অল্প। একই মাপের জামা দোকানে রাখিলে, অধিকাংশ খরিদ্দারকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তবে দু'এক জনের গায়ে লাগিতে পারে বটে; এই কারণে আমরা ভক্তসমাজের সর্ব্বসম্প্রদায়ের মতই এক একটী পথ ভাবিয়া তাহার সাধন-রহস্য বিবৃত করিয়াছি। বৈধী ও রাগাত্মিকা এই উভয় ভক্তির বিষয়ই সমানভাবে আলোচিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গোপীভাব, রামানুজ-সম্প্রদায়ের দাস্যভাব, বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের বাৎসল্যভাব, পঞ্চরসিকের সহজভাব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও সাধনগুলি সমানভাবে—সমান আদরে গৃহীত হইয়াছে।

ভাবসাধনার শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় কিম্বা বৈধ ও অবৈধ উভয় পন্থাই আলোচনা করিয়াছি। এই পুস্তকে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও ভক্তবর্গের প্রবচন ও পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। *

এই পুস্তকখানি লেখা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বৃন্দাবন, পুরী, কলিকাতা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের গণ্যমান্য গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের স্বাক্ষরিত একখানি বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে, "ভণ্ড তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবগণ সাধনার নামে, মদ্য ও মেয়েমানুষ লইয়া সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি করিতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন সাধনপন্থায় বৈষ্ণবীর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যাহারা সাধনকার্য্যে বৈষ্ণবীর সাহায্য লইয়া থাকে, তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।" বাস্তবিক ভণ্ড তান্ত্রিক ও বৈরাগিগণ ব্যভিচারস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে কত প্রকার অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার দমনকল্পে বৈষ্ণবসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আগ্রহ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু সত্যের খাতিরে ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা বৈধ উপায় পরিত্যাগ করিয়া, যেন সত্যকে লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য সাধক-গোপীর সাহায্য ব্যতীত রাগমার্গের সাধক গোপ্যানুগতিময়ী ভক্তিলাভ করিতে পারেন সত্য ;—সাধন-পথে স্ত্রীলোকের সাহায্য না লইলেও প্রেম-ভক্তি লাভ করা যায় বটে; কিন্তু যে সকল সাধক বুঝিয়া সাধনায় সাধকগোপী (স্ত্রীলোক) আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা কি কেহ বৈষ্ণব নহেন? বৈষ্ণবচূড়ামণি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও

* শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" ও "উজ্জ্বল-নীলমণি", শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দাস গোস্বামীর "উজ্জ্বল রস-চিন্তামণি", শ্রীযুক্ত রসময় দাসের "রসসার" প্রভৃতি বৈষ্ণ গ্রন্থই প্রথম স্কন্ধ প্রেমভক্তিতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি।

বিল্বমঙ্গলঠাকুর প্রভৃতি কি আর গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গোস্বামীদিগের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইবেন না ? কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই অবৈধরূপে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া—ব্রাহ্মণ হইয়া ধোবানী ও বেশ্যা লইয়া সাধনা করিয়াছিলেন ; সুতরাং ব্যভিচারী ভিন্ন তাঁহারা বৈষ্ণব-চূড়ামণি হইবেন কিরূপে ? কিন্তু ইহাদিগের ভাব-বিবশ-কণ্ঠনিঃসৃতা কবিতাবলী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও হৃদয়- তন্ত্রী এক নূতনতানে বাজিয়া উঠে, হৃদয়-কন্দরে এক মাধুর্য্যের উৎস খুলিয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাতিশয় শ্রদ্ধার সহিত ইহা শ্রবণ করিতেন। যথা :—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অতএব এই পন্থা যে গৌরাঙ্গদেবের অননুমোদিত একথা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ? তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সকল পদাবলীতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। বরং আমাদের মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেব যে উজ্জ্বল-রসাত্মক প্রেমভক্তির মহিমা প্রচার করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই পরমপুরুষার্থ লাভের দুর্গমপথ সুগম করিবার জন্যই স্বকীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই সমুদয় রসিক-ভক্তকে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন।

উক্ত বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষরকারী গোস্বামিগণ কি চণ্ডীদাসাদির ন্যায় উজ্জলরসাত্মক-প্রেমভক্তিসাধক বৈষ্ণব-কুঞ্জের কলকণ্ঠ পিকরাজগণকে

পরিবর্জ্জন করিতে পারিবেন? গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতে তাঁহাদিগের স্মৃতি ও অস্তিত্বলোপ করিতে পারিবেন কি? তবে আমরা কেন বলিব না যে, "গোস্বামিগণ আপন সম্প্রদায়ের কলঙ্কক্ষালনার্থ কিম্বা সমাজের মঙ্গলার্থ ঐ বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করতঃ সত্যের অপলাপ করিয়াছেন? তাঁহাদিগের ঘোষণা করা উচিত ছিল, "উজ্জ্বলরসাত্মক সাধন অতিশয় দুষ্কর। অটলহৃদয় বীরভক্ত ব্যতিরেকে রমণীর সাহচর্য্যে কেহই ব্যভিচারের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং রায় রামানন্দের ন্যায় প্রকৃত অধিকারী না হইয়া যাহারা সাধকগোপীর (স্ত্রীলোকের) আশ্রয়ে মধুরাখ্য উজ্জ্বল-রসাত্মক সাধনের নামে সমাজ পঙ্কিল, সম্প্রদায় কলুষিত, ধর্ম্মপথ অপবিত্র ও দেশে ব্যভিচারস্রোত বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত নহে।—সাধারণ লোক তাহাদের স্বেচ্ছাচারী ও উন্মার্গগামী মনে করিবেন।" নতুবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে সাধকগোপীর পদাশ্রয়ে প্রেমরস লাভ করিবার পথটীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সত্যের অপলাপ করিবেন না। এই পথের উদ্ভাবন করিয়া একমাত্র বাঙ্গালী-বৈষ্ণব যে মহতী কীর্ত্তি ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শতমুখে তাঁহাদিগের মনীষা ও অনুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই মধুর ভক্তিরস দেশকাল পাত্র বিবেচনায় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য অথবা গোপন করা বিধেয়। ইহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অনুপযোগী, কাহারও পক্ষে বা দুরূহ। যে সকল ব্যক্তি ঘৃণিত বিবেচনায় লৌকিক উজ্জ্বলরস হইতে বিরত হইয়াছেন, তাঁহারা তৎসদৃশ মনে করিয়া ভগবতোজ্জ্বলরস হইতেও নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, অথবা শান্তি-প্রীতি বাৎসল্যরসের বিজাতীয় ভক্তগণ স্ব স্ব ভাব-বিরোধহেতু উজ্জ্বলভক্তিরস বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন। অতএব উভয় নিবৃত্ত ভক্তের নিকট ইহা গোপন করা বিধেয়। অপর কোন কোন ব্যক্তি

ভাগবতোজ্জলরস পরিমিত জ্ঞানে আপনাদিগকে বহুজ্ঞ বিবেচনা করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা দুরূহ। অতএব সেই সমুদয় অভিজ্ঞন্মন্য ব্যক্তি-দিগের নিকটেও ইহা গোপন করা উচিত। আর অপর সাধারণের'ত কথাই নাই, তাহাদিগের নিকট ইহা সর্ব্বথা গোপনীয়। আমার "তান্ত্রিক-গুরু" গ্রন্থে কুলাচার ও পঞ্চ ম-কারের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এসম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের "সাধনার স্তর ও সিদ্ধলক্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আধুনিক সাধকগণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত এক্ষণে আর কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মূল ও শাখাগুলির বিব-রণ, সাধনাচার, উদ্দেশ্য ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে,—ভূতনাথ না হইয়া ভূতের সহিত খেলা করিতে গেলে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। অতএব পথ ও মতগুলি সম্প্রদায় হইতে বাদ না দিয়া শক্তি থাকে'ত ভণ্ড ব্যভিচারীগণকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দাও। নতুবা সত্যের অপলাপ করিয়া সেই ভণ্ড ও ব্যভিচারীর নিকট হাস্যাস্পদ হইও না।

এই গ্রন্থে উজ্জলরসাত্মক মধুরভক্তিরস ও তৎপ্রাপ্তির উপায় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অনধিকারী ব্যক্তিগণ ইহার আলোচনা না করিয়া অন্যান্য ভাবভক্তি বা সাধনভক্তির আশ্রয়ে সাধনা করিবে। এই পুস্তকে সকল প্রকার ভক্তিরই আলোচনা করা হইয়াছে; কেন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই গ্রন্থ লেখা হয় নাই। ভক্তির সর্ব্বাধিকারী জনগণ এই গ্রন্থের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তির স্বরূপ ও তল্লাভের উপায় বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত কোন পুস্তকাদি না থাকায়, সন্ন্যাসধর্ম্ম ও তদধিকারীর বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। তাহা পাঠে আর ভণ্ড সন্ন্যাসিগণের

বচন-রচনে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এই স্কন্ধে শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অবতারগণ ও তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-মতের সামঞ্জস্যসম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

পরিশেষে উজ্জ্বলাখ্য মধুর-ভক্তিরস সাধন-পিপাসু ভক্তগণের নিকট নিবেদন এই যে, কলিকালের মানবগণ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, পক্ষান্তরে ইহার সাধনও সাতিশয় দুষ্কর। এইহেতু চণ্ডীদাসাদি বীর ভক্তের ন্যায় পরকীয়া রমণীর সহিত কঠোরসাধনে অগ্রসর না হইয়া শ্রীজয়দেবের ন্যায় স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীর সহিত কামানুগা-সাধন কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও তাহার ব্যবস্থা আছে। যথা :—

শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্ব্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অতএব যদি কেহ মূঢ়তা বশতঃ পরকীয়া রমণীতে অনুরক্ত হইয়া, প্রকৃত সাধনে অসমর্থ হয়, তাহা হইতে তাহাকে অবশ্য রৌরবের অন্ধকারময় গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, সাধক মাত্রেরই স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীর সহিত কুল ও রস-সাধনে দীক্ষিত হওয়া বিধেয়।

পাঠক! গ্রন্থ মধ্যে বহু অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহতত্ত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং ভ্রম প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। মরালধর্ম্মানুসরণকারী সাধকগণ ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রেম ভক্তির কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যও অনুভব করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমধিক বিস্তারেণ :—

শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম,
৮ই অগ্রহায়ণ, রাসপূর্ণিমা।
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

ভক্তপদারবিন্দ-ভিক্ষু :—
দীন—নিগমানন্দ

চতুর্থ সংস্করণের বক্তব্য

প্রেমিক গুরুর তৃতীয় সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রেমিকগুরুর আদর দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি ;—স্রোত ফিরিয়াছে, দেশে যে ধর্ম্মের সুবাতাস প্রবাহিত হইতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আশা করি এ গ্রন্থ একদিন সংসার প্রপীড়িত তৃষিত-কণ্ঠ-জনগণের শান্তি-বারি প্রদানে ভব-তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিবে। পরিশেষে প্রকাশকের নিবেদন এই যে, বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুলভ হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণে ভাল কাগজ দেওয়া হইল। কিমধিকমিতি।

সারস্বত মঠ,
অক্ষয় তৃতীয়া, ২৪শে বৈশাখ,
১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

গুরুচরণাশ্রিত—
শ্রীকুমার চিদানন্দ।

সূচীপত্র

পূর্ব্বস্কন্ধ

প্রেমভক্তি

উত্তর স্কন্ধ

জীবন্মুক্তি

পূর্ব্বস্কন্ধ

প্রেমভক্তি

প্রেমিক-গুরু

পূর্বস্কন্ধ

প্রেমভক্তি

ভক্তি কি ?

ভক্তিলাভ করিতে হইলে, অগ্রে "ভক্তি কি" তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। ভক্তি কাহাকে বলে ?

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

—শাণ্ডিল্যসূত্র।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলেন,—"পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে।" যাহার দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের কৃপা আকৃষ্ট হয় ও বাসনা সকল পূরণ করে, তাহাই ভক্তি। সোজা কথায় ভক্তি অর্থে, ভগবানে পরম প্রেম। যথা :—

সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।

—নারদসূত্র।

জ্ঞান-কর্ম্ম ভুলিয়া, বাসনা-কামনা ভুলিয়া, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া, ধনৈশ্বর্য্য ভুলিয়া, স্ত্রী পুত্র এমন কি, আপনা ভুলিয়া ভগবানে যে ঐকান্তিক অনুরক্তি, তাহার নাম ভক্তি। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন ;—

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
—বিষ্ণুপুরাণ।

"অবিবেকিগণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেরূপ প্রবল আসক্তি, হে ভগবান্ তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের সেরূপ আসক্তি যেন অপগত না হয়।" ইহার ভাবার্থ এই যে, ফল হেতু বিচারশূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এই ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্ত। ভক্ত ভগবানে আত্মহারা হইয়া যান। তিনি ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া ভগবান্‌কে আপনার ভাবিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বত্র পরিদর্শন করেন। জলে, স্থলে, চন্দ্র-সূর্য্যে, গ্রহ-নক্ষত্রে, মেঘে-সাগরে, গঙ্গায়-গোদাবরীতে, কাশী-প্রয়াগে, অগ্নি-বায়ুতে, অশ্বত্থে ও বটে,—সর্ব্বঘটেই বিশ্বব্যাপীরূপে তাঁহাকে দেখিয়া —তাঁহাতেই আত্মসমর্পিত হইয়া—মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া ভক্ত কৃতার্থ হইয়া থাকে। ভক্ত আকুলকণ্ঠে ভগবান্‌কে বলেন, প্রভো! তুমি সকলের সব, সবের সকল। আমি যে তপ, পূজা, হোম, ব্রত, নিয়ম কিছুই জানি না। আমি তোমাকে ভিন্ন কিছুই জানি না। আমি তোমাকে ভিন্ন কিছুই চাইনা। তোমাকে পাইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব। প্রাণাধিক! তুমি দয়া কর— আমায় তোমার চরণরেণু করিয়া লও।

ভগবান্‌ও এই ভক্তির অধীন। ভক্তের উপহার তিনি যেমন প্রীতি

পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন, এমন আর কিছুই নহে। ভক্তিপূর্ব্বক ডাকিলে, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তিতে পিত্তলের প্রতিমা অন্ন ভক্ষণ করেন, ভক্তিতে নোলক পরিবার জন্য পাষাণ-প্রতিমার নাকে ছিদ্র হয়, ভক্তিতে শালগ্রামশিলা অলঙ্কার পরিবার জন্য হস্ত বাহির করেন,—ভক্তিতে এমন হয়, ভক্তির অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। তাই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের ভক্তিতে স্ফটিক স্তম্ভ বিদারণ পূর্ব্বক নৃসিংহ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। ভগবান্ ভক্তাধীন—ভক্তির জন্য তিনি ক্রীড়া পুত্তলী। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মনের তদ্গত ভাবকেই ভক্তি বলা যায়। তাহা হইলেই ভক্তিকে ইচ্ছাশক্তির ঐকান্তিকী স্বমুখী বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির (will force) ঐকান্তিক চালনে তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সমুদ্রের জল যেমন আত্যন্তিক শৈত্যে জমিয়া বরফ হয়, তদ্রূপ নিরাকার, নির্ব্বিকার অনন্ত চিন্ময় ভগবান্ ভক্তের ঐকান্তিকী ইচ্ছাশক্তির বলে চিদ্ঘন হইয়া প্রকাশিত হন—জগন্ময় মনোময়রূপে আসিয়া দেখা দেন। যেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত দায়রার বিচারপতি তদীয় শিশু পুত্রের অনুরোধে বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তিশালী মনুষ্য হইয়াও ঘোড়া সাজিতে বাধ্য হন, তদ্রূপ জ্ঞানময় ও শক্তিময় বিরাট্ ভগবান ভক্তের আব্দারে তাহার মনোময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। উক্ত বিচারপতির সহিত অপরে কথা বলিতেও ভীত—সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু তদীয় পুত্র যেমন তাঁহার গোঁপ ধরিয়া ঘোড়া হইতে বাধ্য করে, তদ্রূপ অপরে ভগবানের বিশ্বরূপ ও বিরাট বিভূতি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যায় বটে, কিন্তু যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় তাঁহাকে "আমার" বলিয়া জানিয়াছেন, সেই ভক্তের নিকট ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছানুসারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদয় হন। এ তত্ত্ব ভগবৎ কৃপা ব্যতীত অন্যরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অনেকে মনে করে, জ্ঞান ভক্তির বিরোধী। সেই হেতুবাদে অস্মদ্দেশে অনেককাল ধরিয়া জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় ইহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অধুনা জ্ঞান-মার্গের সাধকগণ ভক্তিমার্গের সাধক দেখিলে "বিটল" উপাধিতে বিভূষিত করেন; আর ভক্তিমার্গের সাধকগণ জ্ঞানমার্গের সাধক দেখিলে "অরসিক" বলিয়া উপেক্ষা করেন। কেহই তাঁহাদের স্বীয় আচরণের ভাবী বিষময় ফলের কথা চিন্তা করেন না,—হিংসাদ্বেষ কলুষিতচিত্তে সে চিন্তার অবসরও হয় না। ভক্তগণ বলেন "জ্ঞানে মিষ্টত্ব আছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক—যেমন মিশ্রি।" আর জ্ঞানী বলেন, "ভক্তি সুপেয় বটে, কিন্তু তেমন মিষ্টত্ব নাই—যেমন দুগ্ধ।" কিন্তু তাঁহারা কেহই বুঝেন না যে, ঐ দুগ্ধ ও মিশ্রি কর্ম্মের আবর্ত্তনে মিশ্রিত হইলে ত্রিসমন্বয় ঘনামৃত অতি সুস্বাদু সরবত প্রস্তুত হইবে। জ্ঞানী বুঝেন না যে, দুগ্ধের সাহায্যে মিশ্রি গলিয়া অদৃশ্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব কখনই লোপ হইবে না। আর ভক্ত বুঝেন না যে, মিশ্রির সাহায্যে দুগ্ধের আস্বাদ যদিও অন্যরূপ হয়, তথাপি সে রূপান্তরিত হইবে না; বরং মিশ্রি তাহার মাধুর্য্যই বাড়াইয়া দিবে। অধিকন্তু জ্ঞানী এবং ভক্ত উভয়ের কেহই বুঝেন না যে, জ্ঞান ও ভক্তির শুভ সম্মিলনেই ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মর্ম্ম-রহস্য সাধারণে অবগত নহে বলিয়াই আজ হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পপাদপে শত শত পরগাছা গজাইয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত করিয়াছে।

অতএব জ্ঞান কখনই ভক্তির বিরোধী নহে। তবে ব্যবহারিক জ্ঞান অবশ্যই ভক্তির বিরোধী হইতে পারে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তির স্থান কোথায়? চিৎ-ব্যতীত কি আনন্দের বিকাশ হইতে পারে? মনে যে সংস্কার থাকে, ইন্দ্রিয়-পথে বিষয়বোধে তাহার বিকাশ হয়; বিকাশ হইলেই

জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই, ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তিলাভ হইলেই আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ।

—উত্তর গীতা।

জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়বস্তু লাভ হইলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সাধক যখন জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, তখন জ্ঞানকে দূর করিয়া দেন;—জ্ঞান আপনিই দূর হইয়া যায়। জ্ঞান ও ভক্তি সহোদর ভাই ও ভগ্নি। জ্ঞানকে না জানাইয়া ভক্তি কোন স্থানে যাইলে কালে জ্ঞান ছোট ভগ্নিটীকে ভৎ'সনা করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাই একবার যে হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছে, কালে সে হৃদয়েও দানবের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তখন ভক্তির পরিবর্ত্তে নাস্তিক্যের কঠোর কর্ক'শ আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান যে স্থানে ভক্তিকে বসাইয়া দেন, সেস্থানে ভক্তির কোন প্রকার সঙ্কোচ থাকে না। তবে জ্ঞান বড় ভাই,—তাহার নিকট বালিকা ভক্তি সর্ব্বদাই সরমে জড় সড় হইয়া যায়; বিশেষতঃ জ্ঞান পুরুষ মানুষ, সকল স্থানে তাহার যাওয়া সম্ভবে না; ভক্তি বালিকা—কাজেই অন্তঃপুরের সর্ব্ব স্থানেই তাহার গতি। যেখানে কূটতর্কের হিজিমিজি—অধিক দন্ত-কিচিমিচি, সেখানে ভক্তি যায় না। সে চায়, শুদ্ধবুদ্ধ সরল স্থান—বিচার বিতর্ক বুঝে না। তবে জ্ঞানের সঙ্গে যাইতে তাহার কোন আপত্তি নাই; তাহারা ভাই ভগিনীতে যেখানে থাকিবে, সে স্থান এক দৈব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সেখানে পারিজাতের গন্ধ ছুটিবে,—স্বর্গের মন্দাকিনী আপন উজানবাহিনী ক্ষীরধারা লইয়া সে স্থান বিধৌত করিয়া

দিবে। এই সময় জ্ঞান অন্তরালে বসিয়া স্নেহচক্ষে ভগিনীকে নিরীক্ষণ করিবে, আর বালিকা অসঙ্কোচে একাকিনী কত ক্রীড়া—কত আনন্দ—কত লীলা করিবে। তখন সেই শুভ্রা শীতলা মধুরা পীযূষবরণা আলোক-আনন্দময়ী বালিকারূপিণী ভক্তি—ভক্তের হৃদয়াসনে মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে,—হৃদিতন্ত্রে শান্তির শত প্রেমধারা বহিতে থাকে। সকলেই সেই আনন্দময়ীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে দেখিয়া ভক্ত কৃতার্থ হন।

অতএব জ্ঞান ভক্তিপথের অন্তরায় নহে। বরং দুই ভ্রাতা-ভগিনীতে বড়ই প্রীতি, কেহ কাহাকেও একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যদি কাহাকেও জ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া থাক অনুসন্ধান করিও দেখিবে পশ্চাতে ভক্তি লজ্জা-বিনম্র-বদনে দাদার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্রূপ ভক্তের হৃদয় খুঁজিলেও দেখিতে পাইবে ভক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া জ্ঞানই বসিয়া আছে। ভক্তি কোন কারণে সঙ্কুচিতা হইলেই জ্ঞান সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা সরলা গোপ বালিকাগণ ভক্তিতে উন্মত্তা হইয়া যে দিন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর স্বরে বিবশা হইয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে তাঁহার নিকট ছুটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানহীনা গোপবালা-গণকে কতরূপে বুঝাইয়া ভক্তির উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসকে রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই দিন হ্রস্বদীর্ঘ বোধ-বিবর্জ্জিতা গোয়ালার মেয়ে কিরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিরুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগ-বতে দ্রষ্টব্য। তাই বলিতেছিলাম, একের আধিক্য দেখিয়া অন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? একের বিদ্যমানে অন্যের বিদ্যমানতা অস্বীকারের উপায় নাই। কারণ উভয়েই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ সুতরাং জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে, বরং জ্ঞানই ভক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। তবে কথা এই যে, ভক্তি আসিয়া একবার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া

বসিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি আম খাইয়াছে, তাহার আর রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান একাকী যেখানে সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু ছোট ভগিনীকে যাইতে দিবে কেন,—বরং সে একাকিনী যেখানে সেখানে যাইলে কালে জ্ঞান তাহাকে ধমকাইয়া লইয়া আসিবে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি কোথাও যাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে,—ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা। তবে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তখন ভক্তিই নাচিয়া হাসিয়া কত রঙ্গে বিরঙ্গে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়।

জ্ঞান অর্থে ঈশ্বর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস। কতকগুলা বই পড়া বা কথা জানাকে জ্ঞান বলে না। সংশয়শূন্য হইয়া ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে, সোজা কথায় ঈশ্বর সত্তা উপলব্ধি করাকেই জ্ঞান বলে। সংশয় থাকিলে কি প্রকারে ভক্তির ভাব সে হৃদয়ে দাঁড়াইতে পারিবে? সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত যে ভক্তি আসিতে পারে না, তাহা অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত হইল। যখন কর্ম্ম-যোগের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, জ্ঞান-যোগদ্বারা আত্ম-পরমাত্ম জ্ঞান হইবে, তখনই ভক্তি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া আপন আসন পাতিয়া বসিবে।

এই ভক্তি দ্বারাই একমাত্র ভগবান্ লভ্য হন। জীবের কতটুকু শক্তি যে তদ্দ্বারা অনন্ত শক্তিময়কে আয়ত্ত করিবে,—জীবের কতটুকু জ্ঞান যে জোনাকী পোকা হইয়া সূর্য্যকে প্রকাশিত করিবে? সুতরাং একমাত্র ভক্তি ব্যতীত জীবের উপায় কি? ভগবান্ নিজমুখে ভক্তি ও ভক্তের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া বলিয়াছেন ;—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

—শ্রীমদ্ভগবদগীতা।

হে অর্জ্জুন! অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার ভজনা করিতে থাকেন, তবে তাঁহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে, সে সম্যক্ জ্ঞানবান্ হইয়াছে। যে এরূপে আমার ভজনা করে, সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহাই জানিও—আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না। ভক্ত অবিনাশী; সে ভক্ত কিরূপ?—ভগবান্ বলিয়াছেন;—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২।১৩-২০

যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য. কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাবান, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। লোক সকল যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, লোক সকল কর্ত্তৃক যিনি উদ্বিগ্ন হয়েন না, এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ শূন্য, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিঃস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও মনঃপীড়া-শূন্য এবং সর্ব্ব উদ্যম পরিত্যাগী, যিনি সকাম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ. আকাঙ্ক্ষা ও পাপ-পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান হন; তিনিই আমার প্রিয়। যিনি সর্ব্ব আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন ও যিনি মৌনী, যিনি যৎকিঞ্চিৎলাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতি-নিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থিরভক্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন; তিনিই আমার প্রিয়। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত প্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন; তিনিই আমার অতীব প্রিয়।

পাঠক! ভক্ত হইতে হইলে, কি কি গুণ থাকা চাই বুঝিয়াছ? কেবল চৈতন-চুটকির বাহার, কণ্ঠীবন্ধন বা গোপীমৃত্তিকা লেপন করিলেই ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্তের উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকা চাই

আর কেবল চক্ষু মুদিয়া ভেট্‌কি মাছের মত মাঝে মাঝে 'হা' করতঃ "গোপীবল্লভ" "প্রাণবল্লভ" বলিয়া রব ছাড়িলেও ভক্তির সাধনা হয় না।

শ্রীমুখে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২।৬-৭

যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য পরা-ভক্তি দ্বারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মরণশীল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

অতএব ভক্তিই ভগবদারাধনার প্রাণ। ভক্তিবিহীন ব্যক্তির তপ, জপ, উপাসনা বন্ধ্যানারীতে সন্তান উৎপাদনের চেষ্টার ন্যায় বিফল। প্রকৃত সাধক ভক্তি ব্যতীত কোন দ্রব্যই আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তিতে ভক্তের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ভক্তির সাধনায় ক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তখন ভক্ত শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা প্রভৃতি প্রেমের উচ্চস্তরের মাধুরীলীলায় বিভোর হইয়া যান। সাধক সর্ব্বত্রই ভগবানেরই অস্তিত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে,—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ।

বিশ্ব জগৎ, সর্ব্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। কিন্তু ভেদজ্ঞান থাকিতে কখনই ভক্তির অধিকারী হইতে পারা যায় না। পুরাণের হর-গৌরী মূর্ত্তি জ্ঞান ও ভক্তির জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মহাদেব জ্ঞানমূর্ত্তি,—কিন্তু গৌরী প্রেমময়ী। তাই তাঁহার ত্যাগের কর্কশতা গৌরী প্রেমের মাধুর্য্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। আলোক যদি ফানুস (চিমনি) দ্বারা আবরিত না হয়, তবে কিঞ্চিৎ কর্কশ ও অনুজ্জ্বল বোধ হয়; কিন্তু ফানুস্ দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দিলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলোক বাহির হয়। তদ্রূপ জ্ঞান, প্রেমের ফানুসে আবরিত হইলে, ঐ জ্ঞানালোক স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সাধককে তৃপ্ত করিবে।

ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইলে ভক্ত তখন ভক্তির বলে—প্রেমের বলে জগদ্রূপী জগন্নাথকে আপনার সঙ্গে লয় করিয়া থাকেন।

ভক্তিতত্ত্ব

—:*:—

জীবাত্মা পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র। অতএব জীব মাত্রেই ভগবানের আপনার জন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি জীবের স্বভাব ধর্ম্ম। মায়াবরণে আত্মার স্বরূপ ও তদীয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম আবরিত হওয়ায়, জীব বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান বদ্ধজীবের স্বভাবে এমন একটী অভাব রাখিয়া দিয়াছেন, যাহার অনুরোধে কালক্রমে তাহার স্বকীয় বিস্মৃত সম্পদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রকৃত পক্ষে

ভগবানের ভক্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, বিকৃত বদ্ধজীব-স্বভাবের সেই সার্ব্বভৌম অভাবটা কি, এতদ্বিষয়ে প্রণিধান করিলেই ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইবে।

যদ্দারা শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়-প্রপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, তাহাই **ইন্দ্রিয়**। এই ইন্দ্রিয় বাহ্যান্তর ভেদে দুই প্রকার; অন্তঃকরণ ও বাহ্য করণ। বাহ্যেন্দ্রিয় আবার জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, ইহাঁদিগের প্রসাদে ইন্দ্রিয়গণ সামর্থ্য লাভ করিয়া স্ব স্ব বিষয়াভিমুখে কার্য্যার্থ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। এই সমুদয় ইন্দ্রিয় ও তত্তদধিষ্ঠাতা দেবতাদিগের বিষয়ান্তরে মিলিত হইবার জন্য একটী স্বাভাবিক শক্তি আছে; ইহার অনুরোধেই তাহারা সংসার-দশাতে নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। এই পরানুরক্তি শক্তি কাহারও অর্জ্জিত নহে; সৃষ্টির উপক্রমে বিধাতা এই শক্তি প্রদানেই বিশ্ব সংসার রচনা করিয়াছেন। কেবল ইন্দ্রিয়াদির কথা বলি কেন? পরমাণু হইতে পরম মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত সকলেই উক্ত বৃত্তির অনুরোধে অবশ ভাবে অন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। বিরাট পর্ব্বত বায়বীয় অণুসমুদয়ে মিলিত হইবার জন্য রেণু রেণু হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকা কণায় পরিণত হইতেছে; আবার বালুকাময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া কালক্রমে পর্ব্বতাকারে পর্য্যবসিত হইতেছে। মৃত্তিকা বৃক্ষরূপে এবং বৃক্ষ মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হইয়া পরস্পরের সম্মিলনের পরিচয় দিতেছে। চরাচর জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে এইরূপে রূপান্তরিত হইয়া পদার্থান্তরে পরিণত হইতেছে, উহা উক্ত পরানুরক্তির ফল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। জগৎপিতা জগদীশ্বর সৃষ্টিকালে সৃষ্ট পদার্থ সমূহে এমন একটী অভাব রাখিয়াছেন, যাহা সার্ব্বভৌম ও সাতিশয়

সুস্পষ্ট। এই অভাবের পূরণার্থ স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং যখন আলিঙ্গিত পদার্থে আশা পূর্ণ হইল না স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে, তখনই আবার তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া অন্য পদার্থের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছে। প্রাকৃত সকল বস্তুই সেই অদ্বিতীয় অভাবের দ্বারা সৃষ্ট; সুতরাং জগতের অভাবময় কোন পদার্থ-দ্বারা কাহারও কোন অভাব দূরীভূত হইবার নহে। অন্যের নিকট স্বীয় অভাব পূরণার্থ গমন করিলে যে পরিমাণে অভাবের পূরণ ঘটে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে অপরের অভাব পূরণ করত আপনাকে অন্তঃসারশূন্য হইতে হয়। প্রেম বা স্নেহজনিত সুখের পূরণার্থ পত্নী বা পুত্রে সঙ্গত হইলে যে পরিমাণে আনন্দ নিজের সংগৃহীত হয়, তদপেক্ষা সহস্রগুণ যত্নদ্বারা পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণে আপনাকে অসার ও ভগ্নোদ্যম হইতে হয়। অতএব ভাবময় প্রাকৃত পদার্থদ্বারা কাহারও স্বাভাবিক অভাব দূর হইবার নহে। তবে, যিনি অভাব দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই ইহার প্রতিকারের ঔষধ আছে। অভাব পূরণার্থ ইন্দ্রিয়বর্গের এই স্বাভাবিকী বৃত্তিই আসক্তি বা ভক্তিনামে অভিহিত হইয়া থাকে। অভাববিশিষ্ট প্রাকৃত পদার্থের প্রতি ইন্দ্রিয়াদির গতি হইলে তাহাকে আসক্তি এবং সর্ব্বাভাব-বর্জ্জিত অখণ্ডানন্দস্বরূপ ভগবানের প্রতি উহাদিগের গতি হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায়।

জীবের ইন্দ্রিয়বর্গ মায়াময় নশ্বর জগতে ধাবিত হইয়া কুত্রাপি চিরস্থায়ী তৃপ্তি লাভ করিতে পারেনা; উহারা সন্তোষ লাভের জন্য আপাত-সুখকর কোন পদার্থে আসক্ত হয় বটে, কিন্তু যখনই তাহাতে স্বকীয়তৃপ্তি লাভের অভাব অনুভূত হয়, অমনি তাহা হইতে বিরত হইয়া অন্য পদার্থের মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। জীব পূর্ণ সুখের কাঙ্গাল, সে সুখ সে ভোগ করিয়াছে; পূর্ণানন্দময়ের আংশিক জগতে সে কোন পদার্থেই সে-সুখ পায়না, তাই

অপরিতৃপ্তহৃদয়ে সুখের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের মরীচিকা দর্শনের ন্যায় সংসার মরুভূমিতে ছুটিয়া বেড়ায়। পরিবর্ত্তনশীল জগতে এইরূপ বিড়াম্বনা ভোগ করিতে করিতে যখন সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রাদির কৃপায় বুঝিতে পারে যে, অভাববিশিষ্ট মায়াময় জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে ইন্দ্রিয়বর্গের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইবার উপায় নাই, তখন তদ্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অনন্ত-মাধুর্য্যের উৎসস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানে অনুরক্ত হইয়া স্থিরতা লাভ করে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানে ইন্দ্রিয়বর্গের লোভনীয় কোন বিষয়েরই অভাব নাই। জগতের যেখানে যে কোন চিত্তাকর্ষক ভাব বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই সেই সর্ব্ব-কারণ ভগবানের অনন্ত রূপরসাদির আভাস মাত্র। তাই দৈববশতঃ ইন্দ্রিয়বর্গের তৎপ্রতি একবার গতি হইলে, সেই অনন্ত সুখের একবার আস্বাদ করিতে সমর্থ হইলে, আর প্রত্যাবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। তখন পতিতপাবনী ভাগীরথীর জলপ্রবাহের ন্যায় যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গ শতমুখে ভগবানের মাধুর্য্যসাগরে লীন হয়। সচ্চিদানন্দ রসময় ভগবানে ইন্দ্রিয়বর্গের এইরূপ ঐকান্তিক প্রবণতাকেই ভক্তি বলা যায়।

প্রত্যেক জীবের জীবনস্রোত প্রতিনিয়ত অনন্ত সচ্চিদানন্দসাগরে প্রবাহিত হইতেছে। কেহ এক দণ্ডের তরে আপনাকে পরিতৃপ্ত মনে করিয়া স্থির হইতে পারিতেছেনা। জীবন-প্রবাহ সেই প্রেমসাগরে মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। তবে কেহ কেহ ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কারে, অথবা দুই একটা বাহ্যিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ধর্ম্মের অহঙ্কারে স্রোতাবর্ত্তে পতিত হইয়া দুই চারিদিন আপনাকে তৃপ্ত মনে করিয়া অভিমান করে। কিন্তু কয়দিন সেভাবে কাটাইবে, অচিরে আপন ভ্রম বুঝিতে পারে; স্বভাবই তাহার অভাব জানাইয়া দানবের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে। সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করে। জীব

কয়দিন পাপ করিয়া কাটাইবে? অতৃপ্তি তাহাকে ক্রমশঃ ভীষণতর পাপে লিপ্ত করাইবে; নতুবা স্বভাব তাহার ভ্রম বুঝাইয়া অনুতাপের নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। সে দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় পূর্ণানন্দসাগরে ছুটিবে। ধনি-সম্প্রদায়ের বাহ্যিক অভাব অল্প; তাই তাহারা উচ্চ জীব হইয়াও পশুর ন্যায় অন্ধ। তাই মলমূত্র-হাড়মাসের-খাঁচায় নৃত্যগীতে কিছু বেশীদিন ভুলিয়া থাকে,—জীবন-স্রোতাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু রোগে শোকে বা অন্যকারণে একবার মোহের চশমা খুলিলেই, সব ছাড়িয়া অধিকতর বেগে সেই নিত্যানন্দসাগরে ধাবিত হয়। আহা, প্রেমময় ভগবানের কি কারুণিক ব্যবস্থা!! সন্তান স্নেহময়ী মাতার উপর শত অত্যাচার-উৎপীড়ন করিলেও, মাতা যেমন সন্তানকে সর্ব্বদা মঙ্গল-পথে চলিবার জন্য আশীর্ব্বাদ করেন, তদ্রূপ মঙ্গলময় ভগবান্ মোহমুগ্ধ জীবকে—তাহারা তাঁহার অহেতুক প্রেম ভুলিয়া অসার বস্তুতে মত্ত হইয়া থাকিলেও—সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে টানিয়া লইতেছেন। অনেক সময় বদ্ধজীব তাঁহার এই মঙ্গলময়ী ব্যবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রভৃতি শব্দে বিশেষিত করে। ভগবানের যে শক্তি জীবকে সর্ব্বদা অনন্ত উন্নতির পথে, পূর্ণমঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই কৃষ্ণ। আর যদ্দারা আমরা তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হই, তাহাই ভক্তি।

ব্যবহারিক জীবের পুত্রাদিতে যেমন আপনা হইতেই প্রীতি জন্মে, তদ্রূপ জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে সাধুসঙ্গ-সংঘটন মাত্রেই কোন কোন ভাগ্যবান্ জনের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তখন ভক্ত দরিদ্রজনের অপহৃত-মহামণি-চিন্তনের ন্যায় কেবল ভগবানের পরিচিন্তনেই নিয়ত কালাতিপাত করেন। সর্ব্বগুণসম্পন্ন উপযুক্ত একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে অনাথা বৃদ্ধা জননীর যেমন নিদারুণ সন্তাপ উপস্থিত হয়, ভক্ত

উদ্রেক মাত্রেই ভগবদ্ভক্তেরও ঠিক তদ্রূপ দুর্ব্বিসহ বিরহব্যথা উপস্থিত হইয়া থাকে। সোজাকথায় স্নেহময়ী মাতা পুত্রচিন্তায়, পতিব্রতা সতী পতিচিন্তায় ও কৃপণ ধনচিন্তায় যেমন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপ একমাত্র ভগবচ্চিন্তায় ব্যাকুল হওয়ার নাম ভক্তি। যথা :—

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্মনঃ-
কল্পনমেব তদেব চ নৈষ্কাম্যমিতি।

—গোপাল তাপনী।

ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) ভোগের লালসা পরিহারপূর্ব্বক ভগবানে চিত্ত-সমর্পণ করিয়া নিরন্তর তদ্ভাবে ভাবাক্রান্ত থাকাই ভক্তি। এই ভক্তিক্রিয়াই নৈষ্কাম্যভাব বলিয়া অভিহিত হয়; সুতরাং ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা। কিন্তু যখন প্রকৃতির গুণত্রয়কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন সগুণা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে। যথা :—

ভক্তিযোগো বহুবিধৈ র্মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেন পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।৭

পুরুষের গুণময় স্বভাব ভেদে তন্নিষ্ঠ ভক্তিরও ভেদ হয়, অর্থাৎ সত্বাদিগুণের তারতম্যে যাহার যেমন স্বভাব, তাহার ভক্তিরও তদনুরূপ হয়। এই গুণময়ী ভক্তি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী। এই ত্রিবিধ গুণময়ী ভক্তির প্রত্যেকটীও আবার তিন তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শাস্ত্রে নববিধা ভক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।৮

তামসস্বভাব ব্যক্তিগণ হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া অন্যের অহিত সাধনার্থ ভগবানের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে। এই সমুদায় ভিন্নদর্শী ব্যক্তিদিগের ভক্তিই তামসী বলিয়া অভিহিতা হয়।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ সঃ রাজসঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।৯

রজোগুণ প্রধান-স্বভাব ব্যক্তিগণ যশঃ অথবা ঐশ্বর্য্য লাভের অভিপ্রায়ে প্রতিমাদিতে ভগবানের অর্চ্চনা করে। ইহারাও ভক্তি ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে। ইহাদের ভক্তিই রাজসী বলিয়া অভিহিতা হয়।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ সঃ সাত্ত্বিকঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।১০

সত্ত্বগুণপ্রধান-স্বভাব ব্যক্তিগণ স্বীয় কর্ম্মক্ষয় মানসে, ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অথবা স্বাশ্রম-ধর্ম্মবৎ ভগবদর্চ্চনাও কর্ত্তব্য, এইরূপ মনে করিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। ইঁহারাও ভক্তি ব্যতিরিক্ত মোক্ষ কামনা করিয়া থাকেন। এই সমুদায় ভক্তের কর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তিই সাত্ত্বিকী নামে অভিহিতা হয়। আপন আপন উদ্দেশ্য পূরণার্থ যে সকামা ভক্তি, তাহাই সগুণা। আর অবিদ্যা-

বৃত্তিশূন্য চিত্তে অপহৃত মহামণির পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার ন্যায় পরমাত্ম-সমাগমের যে ঐকান্তিক কামনা, তাহাই নির্গুণা ভক্তি।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।২৯।১১-১৪

যেরূপ পতিতপাবনী গঙ্গার জল-প্রবাহ সমুদায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক নিরন্তর শতমুখে ধাবিত হইয়া মহাসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইতেছে, তদ্রূপ যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধান সমুদায়ের অতিক্রম ও যাবতীয় ফলাভিসন্ধির বিসর্জ্জন করিয়া স্বতঃই সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভগবানে সর্ব্বদা সঙ্গত হইতেছে, তাহাকেই নির্গুণা ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে কোন প্রকার কৈতব বাঞ্ছা নাই, ইহা সাতিশয় নির্ম্মল এবং যাবতীয় ভক্তির শ্রেষ্ঠ। জন্মান্তরীণ ভক্তিসংস্কার-বিশিষ্ট কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্‌গুণ শ্রবণমাত্র আপনা হইতেই এই ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ শুদ্ধভক্তের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব (সাযুজ্য) এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছুই

চাহেন না। এই প্রকার ভক্তিকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। ত্রৈগুণ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য; কিন্তু তাহা ঐ ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মনই বাহেন্দ্রিয় সমুদয়ের অধিপতি; মন যখন যেদিকে ধাবিত হয়, তদনুগত ইন্দ্রিয়বর্গও তখন স্ব স্ব বিষয়গ্রহণের নিমিত্ত সেইদিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তঃকরণ সর্ব্বোপাধি পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের দিকে ধাবিত হইলে, অপরাপর ইন্দ্রিয়বর্গও যে নিষ্ক্রিয় ভাব অবলম্বন করিবে, এরূপ নহে। উহারাও মনের অধীনতায় ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া স্ব স্ব ভাবোপযোগী সেবা গ্রহণ করে। অতএব সর্ব্বপ্রকার উপাধি বিসর্জ্জন করিয়া যাবতীয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করিলেই তাহা নির্গুণা ভক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এ যাবৎ ভক্তির যে সমুদায় তারতম্য বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায়কে প্রাধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক—গুণময়ী বা গৌণা অথবা অপরা, অপর—নির্গুণা বা মুখ্যা অথবা পরা। প্রথম গুণময়ী সাত্ত্বিকী ভক্তি সত্ত্বগুণ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভক্তকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসুখ অনুভব করায় এবং দ্বিতীয় নির্গুণা ভক্তি পরিপাক দশায় প্রেম-ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া ভক্তকে সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ গুণলীলা-মাধুর্য্যরস আস্বাদ করাইয়া চরিতার্থ করে। অতএব স্বীকার্য্য যে, ব্রহ্মসুখানুভব দশার পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় দশায় ভক্তে মায়ার অধিকার থাকে।

গুণময়ী ভক্তি সমুদায়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা ক্রমশঃ উত্তর উত্তরটী শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও শুদ্ধভক্তগণ ইহার প্রতি আদর প্রকাশ করেন না। কেননা ইহাতে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে। সাত্ত্বিকী ভক্তি কোন

কোন সাধকের জ্ঞানোৎপাদন করিয়া থাকে। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, সুতরাং এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, সাত্ত্বিকী ভক্তির জ্ঞানোৎপাদন অসম্ভব নহে। জ্ঞান জন্মিলে স্বতঃই কর্ম্ম-বৈরাগ্যের উদয় হয়; সুতরাং তদবস্থায় ভক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি লাভ করেন। অনন্তর পরিপাক দশায় জ্ঞান বিষয়ে অনাদর হইলে, উহা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়। তখন ভক্ত নিগু'ণ শান্তরতি লাভ করিয়া শুদ্ধভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। জ্ঞান-প্রাধান্য বশতঃ এতাদৃশ ভক্ত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। সাত্ত্বিকী ভক্তির অধিকারী যে সকল ভক্ত অশ্বমেধাদি কর্ম্মসমূহ ফলের সহিত ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্যময় সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হন; কিন্তু যাঁহারা কর্ম্ম ফল অর্পণ না করিয়া কেবল অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমুদায় সমর্পণ পূর্ব্বক ভগবানে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা পরিণামে শান্তরক্তি লাভ করিয়া থাকেন। রাজসী ও তামসী ভক্তিতে কাম্য ফল প্রাপ্ত হইলে আর ভক্তি বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং অভিলষিত ফলই উহার চরম ফল। কদাচিৎ কোন কোন ভক্তের কাম্যফল লাভ হইলেও ভক্তি বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় পরিণামে নিগু'ণ শান্তরতি লাভ করেন।

নিগু'ণা ভক্তিও প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; এক—প্রধানীভূতা বা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা, অপর,—কেবলা বা রাগাত্মিকা। কর্ম্মাদি-মিশ্রা সাত্ত্বিকী ভক্তিই পরিপাক দশায় সত্ত্বগুণ পরিহার করিয়া প্রধানীভূতাখ্যা নিগু'ণা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং ইহার অপক্বদশা গুণময়ী এবং পরিপাক দশা নিগু'ণা। কিন্তু কেবলা ভক্তি এরূপ নহে; ইহা প্রথম হইতেই নিগু'ণা, ইহার অপক্বদশা রাগানুগা এবং পরিপাকদশা রাগাত্মিকা। শান্ত-দাস্যাদি রসভেদে প্রধানীভূতা ভক্তি

পাঁচ শ্রেণীতে এবং কেবলা ভক্তি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মহিমজ্ঞানে প্রীতি সঙ্কুচিতা হয় বলিয়া প্রথমা ভক্তি অপেক্ষা দ্বিতীয়া ভক্তি শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর বিশুদ্ধ। প্রেম-সেবার পূর্ণতম আনন্দাস্বাদ-হেতু দ্বিতীয়া দাস্যাদি চতুর্ব্বিধা ভক্তির মধ্যে আবার শৃঙ্গাররসাত্মক ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ব্রজবাসী শ্রীরাধিকাদি-গোপিগণে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ভক্তির পুষ্টি-যোগ্যতা একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পুষ্টতা লাভ করে; ভক্তির গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে উহার পুষ্টতারও তারতম্য হইয়া থাকে। তবে সমুদায় নির্গুণা ভক্তিরই পরিপুষ্টি হইয়া রতি ও প্রেম স্বরূপে পর্য্যবসিত হইবার যোগ্যতা আছে। সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হইলেই ভক্তি রতি-লক্ষণা হয়, পরে সেই রতি পক্কাবস্থায় প্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেই উহা প্রেম-লক্ষণা হইয়া থাকে। এই প্রেম লক্ষণা ভক্তিকেই প্রেমভক্তি কহে।

অতএব গুণময়ী ভক্তি হইতে নির্গুণা ভক্তির পরিপক্ক দশা পর্য্যন্ত অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে ভক্তিকে **সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি** এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

সাধন-ভক্তি

——(*)——

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আবারকা মায়াশক্তি কর্ত্তৃক জীবের নিত্য শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ ও তদীয়

বিশুদ্ধ ধর্ম্ম আবৃত হওয়ায় জীব ভূতগ্রস্ত মানবের ন্যায় বিভ্রান্ত হইয়াছে। সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় বিস্মৃত নিত্য সম্পদের উদ্দেশ হইলে সে ভগবানাভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রেরণায় স্বকীয় হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রকটিত করিতে চেষ্টা করে। ইহাকেই সাধন-ভক্তি বলে। যথা :—

কৃতি-সাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

—ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু।

ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও দর্শনাদি দ্বারা সাধনীয়া সামান্য ভক্তিকেই সাধন-ভক্তি বলে। এতদ্বারা ভাব ও প্রেম সাধ্য হইয়াছে। "ভাব ও প্রেম সাধ্য" এই কথা বলাতে কেহ যেন ইহাদিগকে কৃত্রিম মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হও। বাস্তবিক ভাব ও প্রেম নিত্য-সিদ্ধ বস্তু, ইহার কোন সাধন নাই, সুতরাং জীবের হৃদয়স্থ প্রেমভক্তির উদ্দীপন করণকেই সাধন নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধন-ভক্তি দুই প্রকার। যথা :—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

রাগের অপ্রাপ্তি হেতু অর্থাৎ অনুরাগ উৎপন্ন হয় নাই, কেবল শাসন ভয়েই যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহাকেই বৈধীভক্তি বলে।

* রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ চৈতন্য চরিতামৃত।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য রাগহীন ব্যক্তির উগ্র লালসা নাই, কেবল নরক-ভয়েই ভগবদারাধনা করিয়া থাকে। সুতরাং আরম্ভদশায় সে কদাপি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্বাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় ভগবদ্ভজনও কর্ত্তব্য, না করিলে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনবশতঃ প্রত্যবায় ঘটিবে, এই মনে করিয়া বিধি-ভক্তি স্বাশ্রম ধর্ম্মের সহিত শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব বৈধীভক্তি সাত্ত্বিকী ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। এই ভক্তিতে ভগবানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বিধিমার্গের ভক্ত ভগবানের সহিত কখনও ব্রজবাসী ভক্তের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমাচরণ করিতে পারেন না।

বৈধী-ভক্তি অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পরায়ণ ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে দীক্ষাগুরুর নিকট নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি সাধনে উপদিষ্ট হন। এই সাত্ত্বিকী ভক্তির অনুষ্ঠানে তাঁহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হইতে থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্ত অবশ্যই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নির্ব্বাকার-চিত্ততা লাভ করেন। জ্ঞান সাত্ত্বিকী ভক্তিরই ফল। জ্ঞানোদয় হইলে কর্ম্ম আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং-তদবস্থায় ভক্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অধিকারী হইয়া ব্রহ্মভূত ও প্রসন্নাত্মা হন। সিদ্ধি-দশায় এই বিধি-মার্গের ভক্ত নির্গুণ শান্ত-রতি লাভ করিয়া শান্ত ও আত্মারাম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। এই শান্ত আত্মারাম ভক্তের নির্গুণ ভক্তি প্রধানীভূত বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা নির্ব্বাণ-বাঞ্ছাশূন্য; সুতরাং চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ, কৈলাসাদি ভগবল্লোকে গমন করেন।

এই শান্ত আত্মারাম ভক্তের কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-শূন্যা ভক্তি-শ্রদ্ধাও নির্গুণা

বটে, কিন্তু কেবলা নহে। সাধকাবস্থায় এই ভক্তের ভক্তিতে মহিম-জ্ঞান প্রবল থাকায়, সিদ্ধদশাতেও তাহা অপগত হয় না; সুতরাং তাঁহার এই ভক্তিকে কেবলা বলা যায় না। এক্ষণে রাগানুগা ভক্তি কিরূপ দেখা যাউক।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরম আবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। যথা :—

রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

বাঞ্ছিত প্রিয়জনের প্রতি চিত্তের যে প্রেমময় তৃষ্ণা, তাহাই রাগের স্বরূপ লক্ষণ, আর রাগানুরোধে সেই অভীষ্ট প্রিয়জনের নিয়ত অনুধ্যানই উহার তটস্থ লক্ষণ। রাগস্বরূপা ভক্তিকেই রাগাত্মিকা বলে। রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসী ভক্তগণে পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের সেই ভক্তির অনুসরণ করিলেই তাহা রাগানুগা বলিয়া আখ্যাত হয়। অতএব ব্রজবাসী ভক্তদিগের প্রেমাচরণের অনুকরণে ভগবানের আরাধনাকেই রাগানুগা ভক্তি কহে।

রাগানুগা রাগাত্মিকা ভক্তিরই অনুকরণ মাত্র; এক সাধন, অপর সাধ্য। রাগানুগা ভক্তিই পরিপাক দশায় রাগাত্মিকা ভক্তি বলিয়া

অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাগানুগা ভক্তিকে রাগাত্মিকা-কল্পলতিকার প্রথমোদ্ভিন্ন সুকোমল স্কন্ধস্থানীয় বলা যাইতে পারে। প্রথমা ভক্তির বিষয় ব্রজবাসী ভক্তস্বরূপ গুরু এবং আশ্রয় তদনুগত শিষ্য, আর দ্বিতীয়া ভক্তির বিষয় ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় ব্রজবাসীভক্ত। প্রথমা ভক্তির বিষয়াশ্রয় প্রপঞ্চ-জগতের অন্তর্গত, প্রাকৃত দেহধারী হইয়াও অপ্রাকৃতভাবে অন্তর্দ্দেহে ভূষিত; আর দ্বিতীয়া ভক্তির বিষয়াশ্রয় প্রপঞ্চ জগতের অতীত, আনন্দ চিন্ময় প্রেমরসে অধিষ্ঠিত। যখন রাগানুগা ভক্তি পরিপুষ্টা হইয়া রাগাত্মিকা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তখন রাগানুগা ভক্তি বিষয়াশ্রয় ও সিদ্ধি লাভ করিয়া রাগাত্মিকা ভক্তির বিষয়াশ্রয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

রাগানুগা ভক্তি প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত; এক সম্বন্ধানুগা, অপর কামানুগা। যাঁহারা শ্রীনন্দ-যশোদাদি গুরুবর্গ অথবা শ্রীদাম-সুবলাদি বয়স্যবর্গের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যলীলারস-সুস্বাদের অভিলাষী, তাঁহাদিগের সেই স্ব স্ব সম্বন্ধানুরূপ ভক্তিকে সম্বন্ধানুগা কহে। অপর যাঁহারা গোপী বা মহিষীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গার-রসাস্বাদের অভিপ্রায়ে তদনুরূপ ভাবের অনুকরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই কামাত্মক ভক্তিকেই কামানুগা কহে। পুনরায় কামানুগা ভক্তি দুই অংশে বিভক্ত; এক-সম্ভোগেচ্ছাময়ী, অপর তত্তাবেচ্ছাময়ী। যাঁহারা মহিষীদিগের ভাবানুগত তাঁহাদিগের ভক্তিকে সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহিষীদিগের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে স্বসুখবাঞ্ছা, মহিম-জ্ঞান এবং লোক ধর্ম্মাপেক্ষা প্রভৃতি ভক্তি-রোধক ভাব বিদ্যমান আছে। অপর, যাঁহারা লোকবেদাদি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঐহিক পারত্রিক সকল সুখসাধনে জলাঞ্জলি দিয়া গোপীদিগের নিষ্কাম ভাব ও পরম প্রেমময় স্বভাবের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই ভক্তিকেই তত্তাবেচ্ছাময়ী কহে।

বৈধীভক্তির ন্যায় রাগানুগাভক্তিও অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত। সাধু-শাস্ত্র-মুখে ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এবং ভগদ্ভক্তের শ্রেষ্ঠ ভাবাদি-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির অন্তঃকরণে তাহা পাইবার জন্ত লোভসঞ্চার হয়। তখন তাঁহার বুদ্ধি আর শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করে না, লোভনীয় ব্রজভাবেরই অভিলাষ করে। রাগাত্মিকৈক-নিষ্ঠ ব্রজবাসী ভক্তদিগের ভাবপ্রাপ্তির জন্ত লোভ জন্মিলেই মানব রাগানুগা ভক্তি সাধনের অধিকারী হন। এইরূপ ব্রজভাব-লুব্ধ ভক্ত স্বকীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথাযোগ্য উপায়ের অন্বেষণ করেন—সাধু-শাস্ত্র সমীপে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তিনি শাস্ত্রের কৃপায় অচিরে জানিতে পারেন যে, দীক্ষাগুরূপদিষ্ট গুণময়ী ভক্তিদ্বারা ব্রজভাব প্রাপ্তির উপায় নাই, ব্রজবাসী ভক্ত অনুগ্রহ করিলে, শুদ্ধ প্রণয়রজ্জুতে তদীয় হৃদয় আকর্ষণ করিলে, ব্রজভাব ও ব্রজের ঈশ্বর সুলভ হন। সুতরাং ভক্ত তদবস্থায় কেবল লোভপরতন্ত্র হইয়া ব্রজবাসী ভক্তের কৃপার প্রতি চাহিয়া থাকেন। তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীয় ধর্ম্ম এবং শ্রুত,শ্রোতব্য সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদীয় শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করেন। এইরূপ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণই কেবল ভক্তির প্রথম সোপান।

বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে সকল সাধনাঙ্গ কথিত আছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও তাহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। এই ভজন ক্রিয়াদ্বারা ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া ভাবের অধিকারী হইতে থাকেন। যে পর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির অধিকার। যথা :—

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভবনাবধিঃ।

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির প্রভেদ এই যে, ভয়প্রযুক্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে ভজন তাহার নাম বৈধীভক্তি; আর লোভপ্রযুক্ত বিধিমার্গে যে ভজন, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। বৈধীভক্তি নবোদিত চন্দ্রবিম্বের সুকোমল মৃদুরশ্মি, আর রাগানুগা-ভক্তি ত্রিজগন্মনোহর বালসূর্য্যের উজ্জ্বল প্রভা। প্রথমা ভক্তি যেরূপ ধীরে ধীরে ভক্তকে নির্গুণাবস্থায় আনয়ন করে, উত্তরা ভক্তির ক্রিয়া সেরূপ নহে; উহা শীঘ্র ভক্তকে নির্গুণভাব প্রদান করে। যেরূপ চিন্তামণি স্পর্শে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে গুণময় ভক্তের হৃদয়ও অচিরে মায়াতীত হইয়া ভাব-ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

ভাব-ভক্তি

শ্রদ্ধাসহকারে সাধন-ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি লাভ করিয়া পরিপক দশায় ভাবলাভ হইলে, তাহাই ভাবভক্তি নামে অভিহিত হয়। ব্রজভাবে লোভপ্রযুক্ত রাগানুগা-ভক্তি সাধন করিতে করিতে পরিপাক দশায় ভাবভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ মহাজন বলিয়াছেন;—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

বিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দ ভাবাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম **ভাব।** সূর্য্য উদিত হইতেছেন এমন সময় যেমন কিরণ অল্প অল্প প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলা যায়; কারণ এই ভাব ক্রমে ক্রমে প্রেমদশা লাভ করিবে। যথা :—

প্রেম্ণস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥

প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই ভাব বলা যায়, ইহাতে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের অল্পমাত্র উদয় হইয়া থাকে। মহৎসঙ্গ-বশতঃ যাঁহারা অতিশয় ভাগ্যবান্, তাহাদের সম্বন্ধে এই ভাব দুই প্রকার হয়, এক—সাধনে অভিনিবেশ, দ্বিতীয়—ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ। তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলের হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় ভাব অতি বিরল, অর্থাৎ প্রায়শঃই লাভ হয় না।

আর বৈধী ও রাগানুগা মার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দুই প্রকার; তন্মধ্যে বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব সাধক ব্যক্তিতে রুচি উৎপাদন করিয়া এবং ভগবানে আসক্তি জন্মাইয়া রতিকে আবির্ভূত করে। এ স্থলে রতিকে ভাব বলিয়া জানিতে হইবে, উহা কদাচ প্রেমবোধক নহে। রতি ও ভাবের সামান্যার্থতা প্রযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রে ঐ উভয় একরূপে কথিত হইয়াছে। রাগানুগা সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রথম হইতেই রতি-লক্ষণা; সুতরাং ইহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া প্রেম-ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

সাধন ব্যতিরেকে সহসা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ভগবান্ অথবা ভগবদ্ভক্তের প্রসাদজনিত ভাব বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যাঁহাদিগের

ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নাম গানে সর্ব্বদা রুচি, ভগবদ্‌গুণ-কথনে আসক্তি এবং তদীয় বসতি স্থলে প্রীতি প্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই ভাবের লক্ষণ।

ভক্তগণের ভেদবশতঃ এই ভাব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়; যথা:— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত। ভগবান্ ভাবের বিষয়তারূপে এবং ভক্ত আধারস্বরূপে আলম্বন হয়েন। যাঁহারা নন্দ-যশোদাদি গুরুবর্গের ন্যায়, অথবা শ্রীদাম-সুদামাদি বয়স্যবর্গের ন্যায় কিংবা গোপী-মহিষী-দিগের ন্যায় ভগবানের সহিত ভাবের অনুকরণ করেন, তাঁহারা ভাব-ভক্তির অধিকারী। প্রথমতঃ সাধু-শাস্ত্র-মুখে ব্রজভাবের অসামান্য মাধুর্য্য শুনিয়া পঞ্চভাবের মধ্যে যে কোন একটী ভাব পাইবার জন্য লোভ-সঞ্চার হয়।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসী ভক্তদিগের ভাবপ্রাপ্তির জন্য লোভ জন্মিলেই মানব ভাবভক্তির অধিকারী হন। ভক্ত ভাবাবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ সাধন-ভক্তি দ্বারা বৈধীমার্গানুসারে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ ভাবপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত জানিতে পারেন যে, ভগবান্ প্রকৃতই আমার প্রভু, পিতা, সখা, পুত্র অথবা স্বামী; স্বকীয় ভাবানুসারে ভগবান্‌কে ভাবের বিষয় বলিয়া নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইলে, তাঁহার বুদ্ধি আর শাস্ত্র-যুক্তি অপেক্ষা করে না। তখন তিনি মনে করেন যে, "সে আমার প্রাণ —আমার প্রাণের প্রাণ, তাহাকে পাইবার জন্য কঠোর নিয়ম-সংযম, ব্রত-

উপবাস বা স্তবস্তুতির প্রয়োজন কি? আমি কষ্ট করিলে তিনি কি সুখী হইতে পারেন? ভগবান্ কিম্বা ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির উপায় নাই।" তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীয় ধর্ম্ম এবং শ্রুত-শ্রোতব্য সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদীয় শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করেন। প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠ মহাজন কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ যায়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের ভক্তিযোগের স্ববশীকার সর্ব্বোৎকর্ষ লীলা এবং তাঁহাদিগের সাধুতারও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কেবল ভাবভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন;—

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রোতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।১৪।১৫

হে উদ্ধব! তুমি বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম এবং শ্রোতব্য ও শ্রুতধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া দাস্য-সখ্যাদি যে কোন ভাবে আমাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমার কর্ম্মাধিকার ও জ্ঞানাধিকার থাকিবে না। তাহা হইলে আমার দ্বারাই তুমি নির্ভয় হইবে।

প্রেমিক-শিরোমণি রাগবর্ত্মোদ্দেশে গুরুও ভক্তের এইরূপ ভক্তিদাঢ্য ও ভাব-ঐকান্তিকতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভজনক্রিয়া প্রদান করেন। এই নিগূঢ় ভজনক্রিয়া কর্ম্মজ্ঞানাদিশূন্যা, বিশুদ্ধ এবং ব্রজবাসী ভক্তের

নিষ্কাম ও প্রেমের স্বভাব প্রাপ্তির একান্ত উপযোগিনী। ইহা দুই অংশে বিভক্ত; এক প্রাতিকূল্যের পরিহার, অপর আনুকূল্যের গ্রহণ। অবিদ্যা ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়াদির প্রতিকূলতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগের বশীকরণ প্রথমাঙ্গের অন্তর্গত এবং অনুকূল ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে নিত্যসিদ্ধা হ্লাদিনী শক্তির প্রকটন করিয়া মনোময় সিদ্ধদেহের পুষ্টিবিধান উত্তরাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এই ভজনক্রিয়া দ্বারা ভক্ত অচিরে অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ক্রমশঃ প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে থাকেন।

ভাবাশ্রিত ভক্তগণ জ্ঞান-কর্ম্মাদি ভক্তিরোধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তথাপি ঐ সমুদায় জ্ঞান-কর্ম্মাদি ফল তাঁহাদিগের নিকট আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তি-দেবীর দাসীস্থানীয়া সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহাদিগের সেবা করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ তৎসমুদায়ের প্রতি আদর প্রকাশ করেন না। এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগের রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ চিত্ত তৎপ্রতি আসক্ত হয় না। রাগমার্গের ভাবাশ্রিত ভক্তগণ সর্ব্বদা ভগবানের মাধুর্য্য-সাগরেই নিমগ্ন থাকেন এই মাধুর্য্য-স্বাদের গন্ধ যাবতীয় মুক্তিসুখ অপেক্ষা কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ। এই হেতু তাঁহাদিগের হৃদয় মুহূর্ত্ত কালের জন্যও বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট হয় না। তাঁহারা নিরন্তর ভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে সন্তরণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন;—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১।৩৩

যিনি ঐকান্তিক ভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরম প্রেমবলে অনুক্ষণ তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবভক্তির সিদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। ভাবভক্তির সাধনক্রম হইতে ভক্ত-চিত্তে রতির উদয় হয়, ভাবময় দেহের স্বতঃই স্ফূর্ত্তি হয়। যখন রতি গাঢ় হইয়া প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তখন ভক্ত স্বকীয় ভাবময় নিত্যদেহে নিত্য ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

প্রেম-ভক্তি

প্রেমভক্তি গগনমণ্ডলস্থ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। জন্মান্তরীণ সংস্কার-বিশিষ্ট কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্গুণ শ্রবণমাত্র আপনা হইতেই ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। জ্ঞান, যোগ, নিষ্কামকর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রকার সাধন অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি হয় না। যে ভগবদ্ভক্তি অহেতুকী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কোন প্রকার হেতু হইতে উৎপন্ন হয় না। যথা :—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।৬

তবে যে সাধনভক্তিকে প্রেমভক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কোমলমনা কনিষ্ঠ ভক্তদিগকে ভক্তির তারতম্য বুঝাইবার জন্য মাত্র। যেরূপ অপক্ক আম্র কালক্রমে সুপক্ক আম্রে পরিণত হয়,

যেরূপ সুকুমার শিশুই কালক্রমে পরিণতবয়স্ক যুবা হয়, তদ্রূপ অপক্ক সাধনভক্তিই পরিপাকদশায় প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেরূপ একমাত্র ইক্ষুরস স্বাদভেদে গুড়, শর্করা, মিছরি, ওলা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হয়, তদ্রূপ এক নির্গুণ ভক্তিই শ্রদ্ধা, রুচি, আসক্তি, প্রভৃতি বহু নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার সকল অংশই সর্ব্বাবস্থাতেই আনন্দ-চিন্ময় এবং ভগবানের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ। ভগবদ্ভক্ত জনের হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিদেবীর কৃপা হইতেই ইহার উদয় হয়, নতুবা এই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই।

সম্যঙ্মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেম নিগদ্যতে।

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতা সম্পন্ন এরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে রতি হয়, সেই রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত।

এই প্রেমকেই প্রহ্লাদ, উদ্ধব, ভীষ্ম, নারদাদি ভক্তগণ ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যের প্রতি মমতা পরিহার পূর্ব্বক ভগবানে যে মমতা তাহার নাম প্রেম। যথা :—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।

—নারদ-পঞ্চরাত্র।

এই প্রেমভক্তি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; এক ভাবোত্থ, অপর ভগবানের অতিপ্রসাদোত্থ। অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গ সকলের নিরন্তর সেবন দ্বারা ভাব পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলেই ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া কথিত হয়। আর ভগবান্ হরির স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম কহে। ইহা আবার মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্যমাত্র-জ্ঞানযুক্ত, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বিধিমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের যে অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম, তাহা মহিম-জ্ঞানযুক্ত, আর রাগানুগাশ্রিত ভক্তগণের প্রেম কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্য-জ্ঞানযুক্ত হইয়া থাকে।

ভক্তির সাধন করিতে করিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাহার পর ভজনক্রিয়া, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব, তাহার পর প্রেম উদিত হয়। প্রেম সঞ্চার মাত্রেই স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয়।

রাগানুগা কেবলাভক্তির দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবের মধ্যে, শৃঙ্গাররসাত্মক ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মধুর-রসাত্মক সাধন-ভক্তি হইতে মধুরারতির উদয় হয়। এই রতি হইতেই ভগবানের সহিত ভক্তের বিলাসের সূত্রপাত হয়। কেননা, মধুরারতিই শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সীগণের আদিকারণ।

কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে॥

—উজ্জ্বল-নীলমণি।

সম্ভোগ বাসনা যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বাঞ্ছার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা সমর্থা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই গোপীকা-নিষ্ঠ সমর্থারতি গাঢ় হইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ স স্যাৎ সিতোপলা॥
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।
প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেঽমী প্রেমশব্দেন সূরিভিঃ॥

—উজ্জ্বল-নীলমণি।

যেমন বীজ ক্রমশঃ ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, মিছরি ও উত্তম মিছরিতে (ওলাতে) পরিণত হইয়া অধিকতর নির্ম্মল ও সুস্বাদু হয়; তদ্রূপ সমর্থারতিও প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

স্নেহ হইতে ভাব পর্য্যন্ত এই ছয়টী প্রেমবিলাসকেও পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভাব যতই গাঢ়তর হইয়া প্রেমে পর্য্যবসিত হইতে থাকে, সেই সময় ভক্তের নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, ক্রোশন (উচ্চরব) তনু-মোটন (অঙ্গ মোড়া), হুঙ্কার, জৃম্ভন (হাঁইতোলা), দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা, হিক্কা, এই সমস্ত বিকার দ্বারা চিত্তস্থ ভাব সকলের অনুভাব হইয়া থাকে। ভাব ক্রমশঃ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যাভিচারী ভাব ও স্থায়িভাবাদি সামগ্রী দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পরমরস-রূপতা প্রাপ্ত

হয়। সাধনা দ্বারা সাত্ত্বিকাদি ভাব ক্রমশঃ ধূমায়িতা, জ্বলিতা, দীপ্তা ও উদ্দীপ্তা হইয়া উঠে। অনন্তর ভাব আরও উৎকৃষ্ট দশা প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব নামে আখ্যাত হয়। ইহাই গোপিকানিষ্ঠ সমর্থারতির চরম বিকাশ।

যে রতির যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার যোগ্যতা আছে, সে রতি সেই সীমাকে প্রাপ্ত হইলেই তখন উহা প্রেমভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং গোপিকানিষ্ঠ সমর্থা রতি প্রৌঢ় মহাভাব-দশা প্রাপ্ত হইলেই উহা প্রেম ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যথা :—

ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।
যা মৃগ্যা স্যাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্॥

—উজ্জ্বল নীলমণি।

এই মহাভাবের কোনও বিচিত্র দশায় ভক্ত চিদ্ঘনানন্দ ভগবানের অনন্ত নিত্য লীলাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

ভক্তি বিষয়ে অধিকারী

মহৎসঙ্গাদি-জনিত সংস্কার বিশেষ দ্বারা যাঁহার ভগবদারাধনায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং যিনি কর্ম্মে অতিশয় আসক্ত বা বিরক্ত হন নাই তিনিই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী। যথা :—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যা পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তি যোগঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৮

সৌভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরীয় কথায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে ও কর্ম্ম মাত্রে বৈরাগ্যযুক্ত বা কর্ম্মে আসক্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেই ভক্তিযোগ সিদ্ধি প্রদান করেন। যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, অথচ সংসারেও নিতান্ত আসক্তি নাই; কিন্তু ভগবৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে আর্ত্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। যথা :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭।১৬-১৭

সুকৃতিশালী পুরুষেরাই ভগবান্‌কে ভজিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বকৃত পুণ্যের তারতম্য হেতু তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। যথা,— আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু তিনি সর্ব্বদা ভগবানে আসক্ত এবং অসার সংসারমধ্যে ভগবান্‌কেই সার জানিয়া কেবল তাঁহাকেই অচলা ভক্তি করিয়া থাকেন। এই কারণে জ্ঞানীর ভগবান্ অতিপ্রিয় এবং তিনিও ভগবানের প্রিয়তর। পরন্তু ইহাঁরা সকলেই উদারস্বভাব, বিশেষতঃ

ভগবান্ জ্ঞানীকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সকল হইতে উত্তম গতিস্বরূপ ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন ফলের আশা করেন না। বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎকে আত্মময় দেখিয়া থাকেন এবং এই প্রকার সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি-নিবন্ধন কেবল ভগবান্‌কেই ভজনা করেন, অতএব এতাদৃশ ভক্ত অতিশয় দুর্লভ। কিন্তু বিবিধ বাসনাতে যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারাই কামনা-পূরণার্থ ভগবানের অথবা তাঁহার দৈবশক্তির উপাসনা করে। তথাপি ইহাদের মধ্যে যাহার প্রতি ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, তাহারাও তদ্ভাব ক্ষীণ হওয়াতে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হয়।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

যে মানব ভক্তিসুখের অভিলাষ করে, তাহাকে অন্যান্য বিষয়-সুখের আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, যতদিন ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত কিরূপে সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইবে? সুতরাং গুণময়ী সকামা ভক্তি সাধন করিতে করিতে যতদিন না ইহামুত্রার্থফলভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, ততদিন শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইবে না। নির্গুণভক্তি পরিপক্কাবস্থায় প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং ভাব ও প্রেমসাধ্য সাধনভক্তিই প্রকৃত ভক্তিপদবাচ্য।

এইরূপ ভক্তির উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে অধিকারী তিন প্রকার তন্মধ্যে উত্তম অধিকারী যথা :—

শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা ভগবানই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, এইরূপ বিচার দ্বারা যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়তর এবং শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী। মধ্যমাধিকারী যথা :—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপাস্য দেবের প্রতি দৃঢ়তর নিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত তাঁহাকে মধ্যমাধিকারী বলে। কনিষ্ঠ অধিকারী যথা :—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা যাঁহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাঁহাকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী জানিতে হইবে।

কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীও সাধনের পরিপাকদশায় উত্তমাধিকারী মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। ভক্তমাত্রেরই প্রেমভক্তি লাভই চরম লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। ভুক্তি-মুক্তিলাভ ভক্তের উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ ভগবচ্চরণার-

বিন্দ সেবা দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে, সেই সকল ভক্তজনের মোক্ষলাভ-নিমিত্ত কথনই স্পৃহা হয় না। তথাপি সালোক্য সাষ্টি', সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারিটী মুক্তি ভক্তির বিরোধী নহে, উক্ত অবস্থাতেও কোন কোন ব্যক্তির ভগবৎবিষয়ক ভাব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। অপর, সালোক্যাদি রূপ মুক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থায় প্রধানরূপে ঐশ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেমস্বভাব-সুলভ সেবনই একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে, অতএব সেবা-রসিক ভক্তবৃন্দ প্রথমাবস্থাকেই প্রতিকূল বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু যাঁহারা একবারমাত্র প্রেমভক্তির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, ভগবানের একান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ স্বীকার করেন না। অতএব এক প্রেম-মাধুর্য্য-স্বাদী ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের সচ্চিদানন্দবিগ্রহের চরণারবিন্দে মন আকৃষ্ট হইয়াছে তাঁহারাই একান্ত ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা, যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাশূন্য ও শ্রদ্ধাবান, তাঁহারাই বিশুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী। যথা :—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষা ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১।৩২

যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া কৃপালুতাদি গুণ ও কৃপাশূন্যতা প্রভৃতি দোষের হেয়োপাদেয়তা বিচার পূর্ব্বক ভগবানকে ভজনা করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছিলেন, "তুমি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় তোমার যে সকল পাপ হইবে, তাহা হইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব, এজন্য তুমি

শোক করিও না।" * অতএব ভুক্তি-মুক্তিত্যাগী একমাত্র ভগবানের প্রেমসেবাস্বাদী ভক্তই উত্তমাধিকারী।

বিশুদ্ধ ভক্তির সাধক উত্তমাধিকারী হইলেও সকলেরই ভক্তিবিষয়ে অধিকার আছে। তবে গুণভেদে—কামনাভেদে ফলের পার্থক্য হইয়া থাকে। জীব মাত্রেরই ভক্তি সহজ ধর্ম্ম; সুতরাং যাহার যেরূপ ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, সে সেইরূপ ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে। তবে ভক্তির পরিপক্ক অবস্থায় সকলেই নিগু'ণাভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে ভক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার। এই উভয় ভক্তি যেরূপ পরস্পর বিভিন্ন, তদ্রূপ ইহাদিগের অধিকারী ভক্ত ও সাধ্য প্রেমফলও ভিন্ন ভিন। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে নাতি-আসক্ত বা নাতি-বিরক্ত ব্যক্তি বৈধীভক্তির অধিকারী, আর ব্রজভাব-লুব্ধ শাস্ত্রযুক্তি-নিরপেক্ষ ব্যক্তি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। প্রথমাধিকারী কেবল শাস্ত্র শাসন-ভয়ে কর্ত্তব্যানুরোধে শাস্ত্র-যুক্তিসিদ্ধ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারী শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা পরিহার পূর্ব্বক কেবল স্বাভাবিক আসক্তি ও রুচির বশবর্ত্তী স্বকীয় স্বভাব-সঙ্গত প্রমাণাতিরিক্ত ভগবদ্ভজনে আসক্ত হন। যদি কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক আসক্তি লাভ করিয়াও শাস্ত্রানুশাসন কর্ত্তৃক নিয়মিত হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভক্তি মিশ্রা হইয়া থাকে। (রাগানুগাধিকারী ভক্ত শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করেন না) বটে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবে আপনা হইতেই বৈধভক্তিকথিত স্বযোগ্য অঙ্গ সমুদায় উদিত হইয়া থাকে। বৈধভক্ত্যাধিকারী ভক্ত প্রতি পদে শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বিন্দুমাত্র তদুক্ত বিধিনিষেধের সীমা অতিক্রম

* সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮।৬৬

করেন না। কিন্তু রাগানুগীয় ভক্ত এরূপ নহেন; তিনি শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ প্রেমোন্মত্ত শ্রীগুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন—সাক্ষাদ্ভজনে দীক্ষিত হন। রাগানুগীয় ভক্তের ভক্তি ভক্তকৃপাতেই উদিত হয়,—তাঁহার সংসর্গেই পরিপুষ্ট হয়। বৈধীভক্তির সাধ্যফল চতুর্ব্বিধা মুক্তি। ইহার মধ্যে কেহ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও কেহ বা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর প্রেমমাধুর্য্য-স্বাদ-সেবী ভক্তগণ উক্ত দ্বিবিধা মুক্তির কোনটীই গ্রহণ করেন না; তাই, তাঁহারা শুদ্ধ প্রেমসেবাই প্রাপ্ত হন। সাযুজ্যমুক্তি সকল প্রকার ভক্তিরই বিরোধী।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বৈধী ভক্তি হইতে রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়; একথা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈধী ভক্তি ও রাগানুগাভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক; এক সাধন-ভক্তির বহির্ব্বৃত্তি, অপর—উহার অন্তর্ব্বৃত্তি। যদিও উভয় ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণের একতা আছে, তথাপি উহাদের মধ্যে উপাদানগত ভেদ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। আনুমানিক উপাসনা বৈধী ভক্তির প্রধান অঙ্গ, কিন্তু রাগানুগামার্গে আনুমানিক উপাসনা নাই, সাক্ষাদ্ভজনই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রথমা ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদি-মিশ্রা, দ্বিতীয়া ভক্তি প্রথম হইতেই কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-শূন্যা। প্রবল মহিমজ্ঞান বৈধীভক্তিতে বর্ত্তমান, কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে প্রায়ই মহিমজ্ঞান থাকে না। বিধিমার্গের গুণময় ভক্তের অনুগ্রহ হইতে বৈধী ভক্তির উদয় হয়, পক্ষান্তরে রাগমার্গের নির্গুণ ভক্তের অনুকম্পা হইতে রাগানুগা ভক্তির সঞ্চার হয়। সুতরাং বৈধীভক্তি হইতে রাগানুগা ভক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? যাঁহারা বৈধীভক্তিকে রাগানুগাভক্তির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা হয় রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হন, না হয়—বৈধী-ভক্তি-জাতা প্রধানীভূতা ভক্তিকেই রাগানুগা বলিয়া অনুমান করেন।

বৈধীভক্তিও যে নিরবধি শাস্ত্রযুক্তি কর্তৃক অনুশাসিত হয়, এরূপ নহে। বিধিমার্গের ভক্তগণ ভাবোদয় পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করেন, তৎপর রতি জন্মিলেই তাঁহারাও শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা পরিত্যাগ করেন। বৈধীভক্তি পরিপাক দশায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদিশূন্যা হইয়া শুদ্ধা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয় সত্য, কিন্তু উহাকে রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায় না। বিধিমার্গের যে সমুদায় ভক্ত সিদ্ধিদশায় প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী হইয়া আত্মারাম শান্ত-ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন, তাঁহাদিগের ভাবে প্রবল মহিমজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বৈধীভক্তি কদাপি রাগানুগাভক্তির কারণ হইতে পারে না। যথা :—

> সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
> বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
>
> —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধা, নিগু'ণা ও স্বতন্ত্রা; উহা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তি। ঐ শক্তির বহির্ব্বৃত্তি প্রধানীভূতা এবং অন্তর্ব্বৃত্তি কেবলা। প্রধানীভূতা ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ের সত্ত্বাদিগুণ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলে ঈষৎ মলিনের ন্যায় আভাসমান হয়; তদবস্থায় ইহা বৈধী বা গুণময়ী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা মায়া সংস্পর্শ জন্য ঈষৎ মলিন ও মৃদু। অপর, কেবলা-ভক্তি স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হয়, প্রবর্ত্ত ভক্তের মায়াময় হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়াও সম্পূর্ণ মায়াস্পর্শশূন্য ও অবিকৃত থাকে। তাই এই ভক্তি প্রথম হইতেই কর্ম্মজ্ঞানাদিশূন্যা এবং তীব্রা। ভক্ত-হৃদয় যাবৎ গুণময় থাকে, তাবৎ ইহা রাগানুগা বলিয়া কথিত হয়। এরূপ স্থলে কেবল আধারের গুণময়তা হেতু আধেয় ভক্তিও প্রাভাতিক সূর্য্যের ন্যায় অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে প্রকাশিত হয় মাত্র। নচেৎ

ইহা আধারের দোষে কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না; বরং আধারকে অচিরাৎ আত্ম-সদৃশ নির্গুণ করিয়া তুলে। এই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে গুণময় ভক্ত-হৃদয়ও অচিরে মায়াতীত হয়।

মায়ার দুইটী বৃত্তি; এক—অবিদ্যা, অপর—বিদ্যা। অবিদ্যা মায়ার বহির্ব্বৃত্তি এবং বিদ্যা উহার অন্তর্ব্বৃত্তি। ভক্ত নির্গুণ ভক্তিবলে হৃদয়ের এই উভয় আবরণই ভেদ করিয়া থাকেন। ভক্তি-সাধনে অবিদ্যা তিরোহিত হইলে বিদ্যার উদয় হয়। এই বিদ্যাই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু আরম্ভদশা হইতেই শুদ্ধভক্তের জ্ঞানে অনাদর এবং ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদ-সুখে অনুরাগ থাকায় উহা দর্শন দিয়াই অন্তর্হিত হয়। শুদ্ধভক্তের গুণময় হৃদয় এইরূপে মায়ার উভয় বৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রূপ গুণলীলা-মাধুর্য্য-পারাবারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে বৈধী ভক্তিকে মর্য্যাদামার্গ, আর রাগানুগা ভক্তিকে পুষ্টিমার্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগ্যবান্ শ্রেষ্ঠাধিকারিগণই পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর মর্য্যাদামার্গে আপামর সাধারণের অধিকার আছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তি,—যাঁহার মন সর্ব্বদা না হউক সময়ে সময়ে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহারই ভক্তি-সাধনে অধিকার আছে। ভক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিকে অপেক্ষা করে না, ভক্তি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রের অধিকার আছে। ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে জাতিকুল ভেদ নাই। যথা :—

আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে ॥

—শাণ্ডিল্যসূত্র।

ভগবদ্ভক্তিতে নিন্দ্যযোনি চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার আছে। চণ্ডাল যদি মনপ্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া প্রেম-কারুণ্য-কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকে,

তাঁহার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে পারেন। তাঁহার নিকট জাতি-কুল-মানের আদর নাই; তিনি একমাত্র ভক্তিতে বাধ্য। ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আদর পায় না, কিন্তু তিনি ভক্তিমান চণ্ডালকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করেন। ভক্তিশূন্য মানবে সুধাদান করিলেও ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কিন্তু ভক্তে বিষ দিলেও অমৃত-বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। নিষাদরাজ গুহকের ভক্তিতে দ্রব হইয়া রামচন্দ্র মিতা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন-দান করিয়াছিলেন। শবরী চণ্ডালিনী হইয়াও ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মব্যাধ ও চর্ম্মকারজাতীয় রুহিদাসের ভগবদ্ভক্তির কথা কোন্ হিন্দু অবগত নহে? হরিদাস মুসলমানগৃহে লালিত-পালিত হইয়াও হরিনাম প্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠ-ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ভক্তিতে ভুলিয়া ভগবান্ গোপ-বালক ও হাড়ি ডোম-চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছেন। ভক্তির সদ্ভাবমাত্রেই জীব পবিত্র হইয়া যায়। ভক্তিমান্ ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ। যথা :—

> অষ্টবিধা হ্যেষাভক্তির্যস্মিন ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
> স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
>
> —গরুড় পুরাণ।

অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছেতে প্রকাশ পায়, সে ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ নহে; সে বিপ্রেন্দ্র, সে মুনি, সে শ্রীমান্, সে যতি ও সে পণ্ডিত।

ভক্তিতে ধনী-দরিদ্রও বিচার নাই। বরং ধনীর বাহ্য বস্তুর আসক্তি হেতু অন্য আসক্তি দৃঢ় হয় না; দরিদ্র সর্ব্বাসক্তি ভগবৎমুখী করিয়া উত্তমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ যে কাঙ্গালের বন্ধু তাহা তাঁহার "দীনবন্ধু", "কাঙ্গাল শরণ" নামেই পরিচয় দিতেছে। ধন রত্ন নাই বলিয়া ভগবানের দয়া হইবে না? অর্থাভাবে পরমার্থ লাভে বাধা হয় না। বিশে-

যতঃ তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে দিয়া আমাদের বাহাদুরী প্রকাশের প্রয়োজন কি? অতএব ভক্তের ধনরত্নের দরকার কি?—তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্তসমর্পণ করিয়া প্রেম-কারুণ্য-কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বল—

"রত্নাকরস্তবগৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীরবামনয়নাহৃতমানসায়
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥"

হে যদুপতি! রত্নসকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম, অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়াছি নাকি আভীরতনয়া বামনয়না প্রেমময়ী রমণীগণ তোমার মনোহরণ করিয়া লইয়াছেন,—তাহা হইলে তোমার কেবল মনের অভাব—অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ করিতেছি; হে প্রেম-বশ্য গোপীজন-বল্লভ! তুমি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ কর। ধনীও ঐরূপ দীনভাবাপন্ন না হইলে—ভিখারী-বেশ না ধরিলে ভগবানের কৃপা পাইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া বিদুরের 'ক্ষুদ' অমৃতময়—অতি আদরের দ্রব্যের ন্যায় ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্যবহারিক বিদ্যাবুদ্ধি ভিন্নও ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। সদ্বিদ্যা যে ভক্তি-পথের সহায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মূর্খ যে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে না, এরূপ নহে। বরং অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনা দ্বারা হৃদয় এরূপ কঠোর নীরস করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর ভক্তি উদ্রেকের উপায় থাকে না। পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্রকে ডাকিতে কি

কাহারও বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়? ভক্তির আবির্ভাবে ভক্তের হৃদয়ে আপনা হইতে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া যায়।

ভক্তি বয়সেরও অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধ ব্যতীত অন্যে ভক্তির অনধিকারী, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমমূলক। বরং বাল্য বয়সেই ভক্তিলাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। বালকের কোমল হৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে, অচিরেই বৃক্ষোৎপত্তির সম্ভাবনা। সয়তানের উচ্ছিষ্ট দেহমন লইয়া বৃদ্ধ বয়সে ভগবৎ-সেবা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন ;—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

বাল্য বয়সেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবে, জীবন কয় দিনের জন্য? মনুষ্যজন্মই দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই অধ্রুব। সারাজীবন অধর্ম্মাচরণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইলেও আর ভক্তি সাধনের সময় পাইবে না। বিশেষতঃ ভক্তিহীন হইয়া বিদ্যা বা ধন উপার্জ্জন করিলে, তাহা কেবল ধূর্ত্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব ভক্তি উপার্জ্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিদ্যা প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা নাই। ব্যাধের আচরণ, ধ্রুবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা, সুদাম বিপ্রের ধন, বিদুরের বংশ, উগ্রসেনের পৌরুষ, কুব্জার রূপ সাধারণের চিত্তাকর্ষক দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষার বিষয়। তথাপি ইহারা ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ভক্তি-প্রিয় ভগবান কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না। যথা :—

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলক্রিয়াদিভেদঃ।

—নারদ-ভক্তি-সূত্র।

অতএব ভক্তি বা ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়ার ভেদ বিচার নাই। সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাঁহাকে চায়, সেই তাঁহাকে পায়, তাঁহার নিকট কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। অতএব সংসারি-সন্ন্যাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, মূর্খ-পণ্ডিত, ধনি-দরিদ্র, সুরূপ-কুরূপ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী। তবে মর্য্যাদা-মার্গের ভক্তগণ পরিপাকদশায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া স্বকীয় ভাবানুসারে কেহ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা, কেহবা প্রেমসেবোত্তরা গতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পুষ্টিমার্গের ভক্ত পরিপাকদশায় শুদ্ধ-প্রেম-সেবাই প্রাপ্ত হন।

গীতোক্ত আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এই তিন ভক্ত মর্য্যাদা-মার্গের অধিকারী। আর একমাত্র জ্ঞানীই পুষ্টিমার্গের অধিকারী; সুতরাং সর্ব্বোত্তম ভক্ত। কারণ, জ্ঞানীভক্ত ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত আছেন। ভগবান্ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে, ভক্তেচ্ছাবশে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিধারণ করেন, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইয়াও যে, শ্যামসুন্দরাকার ও মনোময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, এবং আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও যে, ভক্ত-প্রেমবৈবশ্যে অনাত্মারাম ও আনাপ্তকাম হন, অনন্ত হইয়া সান্ত হন, বিরাট্ হইয়া স্বরাট্ হন, ইহা ইনি সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। অজ্ঞানী ভক্তের ইহা ধারণা করিবারও সাধ্য নাই। তাই পাশ্চাত্য দেশীয়গণ তথা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। তাই পুষ্টিমার্গের সাধককে ভক্ততমবলা হইয়াছে; সুতরাং ইঁহারাই উত্তমাধিকারী।

ভক্তিলাভের উপায়

যখন কর্ম্মযোগের দ্বারা গুণক্ষয় হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইবে, জ্ঞানযোগের দ্বারা জানিতে পারিবে ভগবান্ সবের সকল—সকলের সব, তখন আর ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া থাকিবে কি প্রকারে? কিন্তু নীরস জ্ঞান অথবা নীরস কর্ম্ম করিয়া কাহারও কাহারও হৃদয় এত কঠিন হইয়া উঠে যে, ভক্তির কোমলতা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাঁহারা কর্ম্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়া জ্ঞানযোগে আরোহণ করেন, এবং আর এক পদ অগ্রসর হইয়া ভক্তিযোগে আরূঢ় হইতে পারেন, তাঁহারাই ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হন। বিশুদ্ধভক্তি ভক্ত কিংবা ভগবানের কৃপাব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা লাভ হয় না! পুত্র না জন্মিলে যেমন মানবের পুত্র-স্নেহের উদ্রেক হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ কিংবা ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না। সূত্রকার লিখিয়াছেন ;—

মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।

ভক্তিসূত্র।

মহৎকৃপাদ্বারা কিম্বা ভগবানের কৃপালেশ হইতে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ভক্তদিগের কৃপাও ভগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত। পাষণ্ড জগাই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় মুহূর্ত্তে ভক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কখন যে কিরূপে ভগবানের কৃপা হয়, তাহা মানব বুদ্ধির অতীত। তাই শাস্ত্রকারগণ ভক্তিলাভের জন্য সাধনারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সে সাধনা আর কিছুই নহে, ভক্তিরোধক প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিলেই ভক্তির সঞ্চার হইবে। কেননা

ভক্তি জীবের স্বাভাবিক সম্পত্তি, কেবল মায়াময় গুণের দ্বারা আবরিত থাকায় ভক্তির অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। সাধনা দ্বারা প্রতিকূল গুণগুলি অপসারিত করিতে পারিলেই ভক্তির বিকাশ হইবে। চিত্তশুদ্ধি, সাধুসঙ্গ ও নামসংকীর্ত্তন প্রধানতঃ ভক্তিলাভের প্রথম সোপান ; পরে অন্যান্য সাধনদ্বারা ভক্তির পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে।

চিত্তশুদ্ধি।—হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চ ধর্ম্মে উঠিতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সাধনা ও মূলকথা। ইন্দ্রিয়দমন ও রিপুসংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধর্ম্মের সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায়না। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির সাধনাই প্রবৃত্ত-পথের সংযম ও তপস্যা। যাঁহার চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হয় নাই, তিনি সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ হইলেও ঘোর মূর্খ। যাহার রিপুর শাসন ও ইন্দ্রিয় দমন নাই, সে ভক্তিপথ বলিয়া কেন,—কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে সংযমী—যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সে হিন্দুসমাজে ও হিন্দুমতে সাধু বলিয়া গণ্য এবং সকল পথেই অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে। সংযমী হইয়া প্রবৃত্তিকে ভক্তিপথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া আনাই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ, তমঃ ও রজোগুণবিশিষ্ট আহার্য্য ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ ও সাত্ত্বিক চিন্তা অভ্যাস করিবে। অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইলেই ভক্তির বিকাশ হইবে। দয়ার সাগর ভগবান তাঁহার সাধের জীবগণকে সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে—আনন্দের পথে করুণা-বাঁশরীর স্বরে আকর্ষণ করিতেছেন ; কিন্তু লৌহ যেমন কর্দ্দমলিপ্ত হইলে চুম্বকের আকর্ষণে তাহাতে লাগিয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ জীব-হৃদয় পাপাদি-মলে দূষিত বলিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারেনা। সাধনা-

ভ্যাসে যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে—হৃদয়ের ময়লা ধুইয়া গিয়াছে, তাহার হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইলেই ভক্তিলাভ হইল। চিত্তশুদ্ধির সাধনায় পাপমল দূর হইলেই ভক্তি অমনি সাধকের হৃদয় আলো করিয়া প্রকাশিত হয়। কামই মানবের চিত্ত দূষিত করিবার বিশেষ কারণ; সুতরাং ভক্তিলাভের প্রধান কণ্টক। কারণ কাম ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি। সুতরাং একটী থাকিতে অন্যটীর বিকাশ হইতে পারে না। তুলসিদাস বলিয়াছেন;—

যাঁহা কাম তাঁহা রামনহিঁ, যাঁহা রাম তাঁহা নাহিঁ কাম।
দোনো একত্র নাহিঁ মিলে রবি রজনী একঠাম॥

—দোঁহাবলী।

রাত্রিতে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় কামুকের ভক্তি অসম্ভব। অতএব কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাম দমন করিবে। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সম্যক্-প্রকার চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে পাপ দমন হইবে এবং ভক্তিলাভের প্রধান কণ্টক কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, নিন্দা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, পাটওয়ারি বুদ্ধি, মিথ্যাভাষণ, পরস্বাপহরণ, বহু আলাপের প্রবৃত্তি, কুতর্কেচ্ছা ধর্ম্মাড়ম্বর প্রভৃতি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। তখন সাধক-হৃদয়ে স্নিগ্ধ ও শান্তি-আলোক বিকীর্ণ করিয়া ভক্তি বিকাশিত হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান গ্রন্থকার প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য সাধন" অর্থাৎ "ব্রহ্মচর্য্যপালনের নিয়মাবলী ও সাধন-কৌশল" নামধেয় পুস্তকে কামদমনের ও চিত্তশুদ্ধির উপায় বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এইস্থানে পুনরায় তাহা লিখিত হইল না। প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকখানি দেখিয়া লইবে।

সাধুসঙ্গ — কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, সৎসঙ্গ তেমনি ভক্তি লাভের সহায়। যথা:—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে ॥

—নারদপুরাণ।

ভক্তি, ভগবদ্ভক্তসঙ্গেতে জন্মিয়া থাকে। সূর্য্য কিরণমালাদ্বারা যেরূপ বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ সাধুগণ তাঁহাদিগের সদুক্তিরূপ কিরণজালদ্বারা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

—শ্রীমদ্ভগবত।

সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তিসম্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা হইতে থাকে, সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ বলিয়াছেন ; —"যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কাহারও মতি সংসার বাসনা নাশের উপায় যে ভগবানের চরণ পদ্ম তাহা স্পর্শ করিতে পারিবেনা।" কাজেই ভক্তি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বদা সৎসঙ্গকরা একান্ত কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের কার্য্যকাল ব্যতীত যখনই অবকাশ হইবে, তখনই সাধুসঙ্গবাসে শ্রীভগবানের গুণগান করিবে, কেননা ভগবৎচিন্তা হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন স্বভাবতঃই রজঃ ও তমোগুণের আবেশে বিমুগ্ধ হয়, অমনি বিষয়-চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সকল কার্য্য ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়গণ সহ মন ভগচ্চরণে সংলগ্ন থাকে, তবে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বৰ্দ্ধিত হয়। যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, তত দিন

সাধুসঙ্গে ভগবদগুণ-গানশ্রবণ করিলে ক্রমশঃ আসক্তি বাড়িবে ও ভক্তি দৃঢ় হইবে। তাই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুখে বলিয়াছেন ;—

ব্যাবৃত্তোপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা।
ততঃ প্রেম তথাশক্তির্ব্ব্যসনঞ্চ যদা ভবেৎ॥

সাধুসঙ্গের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। সহস্র সহস্র বৎসর যোগ তপস্যা করিয়া যাহা লাভ না হয় একবার সাধুসঙ্গ করিলেই তাহা লাভ হয়। সাধুদিগের দর্শন মাত্রই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যথা :—

গীতায়াঃ শ্লোকপাঠেন গোবিন্দস্মৃতিকীর্ত্তনাৎ।
সাধুদর্শনমাত্রেন তীর্থকোটিফলং লভেৎ॥

গীতার শ্লোকপাঠ করিতে হয়, গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে হয়, তবে পাপ বিনষ্ট হয় ; কিন্তু সাধুদিগের দর্শন মাত্রই কোটি কোটি তীর্থের ফল লাভ হয় এবং সর্ব্বপাপ দূর হয়। সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ও পদধূলি-পাদোদক গ্রহণেও জন্মান্তরীণ পুঞ্জীকৃত পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং সাধুসঙ্গই ভগবদ্ভক্তি উৎপত্তির মূল কারণ। সাধুগণের সভায় হৃৎকর্ণ-রসায়ন সতত ভাগবত কথার আলোচনা হয়, সেই প্রাণারাম ভগবৎ কথামৃত যতই শ্রবণকে পবিত্র করিতে থাকে, ততই ভক্তিমার্গে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি, প্রেম প্রভৃতির উদয় হয়। অতএব সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তির জনক, পোষক, বিবর্দ্ধক ও রক্ষক। সৎসঙ্গের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিলাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। সাধুর দর্শন স্পর্শনে তাঁহার সাত্ত্বিক পরমাণু সাধারণের তামস পরমাণুকে অভিভূত করিয়া ফেলে—সুতরাং অচিরে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। কুমরিকা পোকা যেমন অন্য পোকাকে আপনার মত করিয়া

লয়, তেমনি সাধুগণও অন্য ব্যক্তিকে অচিরে সাধুর বরণ ধরাইয়া লন। কত পাষণ্ড নাস্তিক যে সাধুসংসর্গে অমর জীবন লাভ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গের গুণে মহাপাপীর কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার একটী উদাহরণ দিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে কয়েকটী অবিশ্বাসী পাষণ্ড তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি রূপবতী বেশ্যাকে নিযুক্ত করে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সময় ধ্যানযোগে ভগবানের অতুল সৌন্দর্য্য ডুবিয়া আছেন, এরূপ সময় বেশ্যাটী যাইয়া তাঁহার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল। স্ত্রীঅঙ্গ স্পর্শ হওয়াতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও তিনি একবার চক্ষু মেলিতেছেন—আবার বুজিতেছেন। কখনও ভাবিতেছেন,—সেই সুন্দরতম প্রিয়তমের নিকটেই আছি, কখন ভাবিতেছেন,—এ কোথায় আসিলাম। এরূপ ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিকটে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। মনে করিলেন, মাতা—মা শচীদেবী বুঝি আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া এখানে আসিয়াছেন। তখন তিনি ঐ বেশ্যার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 'মা'-'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং তাহার স্তন ধারণ করিয়া স্তন্য পান করিতে লাগিলেন।

বেশ্যা তাঁহার ঐ ভাব দেখিয়া—তাঁহার সংস্পর্শে মোহিত হইয়া বলিল ;—"আমি তোমার মা নহি, আমি দুশ্চারিণী—পাপিয়সী, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমাকে উদ্ধার কর ; নতুবা আমার গতি নাই।"

তখন মহাপ্রভু বলিলেন ;—'মা! এ রাজ্যে কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তুমি যে উপায়ে যাহা সঙ্কল্প করিয়াছ এবং তোমার

বলিতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় গরীব দুঃখীকে দান করতঃ মস্তক মুণ্ডন করিয়া আমার নিকট আইস, তাহার পর তোমার উপায় বিধান যাহা করিতে হয়, তাহা আমি করিব।"

বেশ্যা এই কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া আপন আলয়ে যাইয়া গরীব দুঃখীকে যথা-সর্ব্বস্ব বিতরণ করতঃ মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিলে দয়াল মহাপ্রভু তাহাকে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সাধু-সংস্পর্শে দেহবিক্রয়-কারিণী বেশ্যার ঘৃণিত জীবন মধুময় হইয়া গেল। তাহার পর হইতে বেশ্যা পরমাভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। সাধু সঙ্গে কি উপকার হয় পাঠক বুঝিয়াছ? সাধুব্যক্তির জীবনী আলোচনা, সৎগ্রন্থ পাঠ, পবিত্র চিত্র দর্শন, ভগবৎ কথালোচনা, এবং তীর্থভ্রমণাদিও সাধুসঙ্গের অন্তর্গত।

নাম সংকীর্ত্তন।—নামকীর্ত্তন ভক্তিপথের বিশেষ সহায়। নাম সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়; যে বিষয়-বাসনা মহা দাবাগ্নির ন্যায় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বিষয় বাসনা নির্ব্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, ভগবৎ-নাম কীর্ত্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়; ব্রহ্মবিদ্যা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা-বধুর ন্যায়,—কুলবধু যেমন অন্তপুরের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করে, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহেন, নামসংকীর্ত্তন সেই ব্রহ্ম বিদ্যার জীবনস্বরূপ; ইহাদ্বারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহার প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন এবং ইহাতেই মানুষ প্রেমরসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। ক্রমাগত নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তিলাভ করতঃ অবশ্যই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া হরিনাম-সুধার উদ্ভব হইয়াছে। এই সুধাপানে মরজগতের জীব অমরত্বলাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে।

এই জন্য সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণই হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা সর্ব্বপ্রকার সাধনভক্তির সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন ;—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

—শ্রীনরোত্তম।

নাম ও নামী যে অভিন্নবস্তু, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। সুতরাং ভগবানের সমুদায় শক্তিই তদীয় নাম মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ; কিন্তু নাম সর্ব্বত্র শক্তি প্রকাশ করেন না, পাত্রের অনুরূপ ভাবেই শক্তি প্রকাশ করেন। যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য স্ফটিক, কাচ, জল প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে তাহাদিগের নির্ম্মলতানুসারে তারতম্যে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবৎ-নামও ভক্ত হৃদয়ে উহার স্বচ্ছতানুসারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই হরিনাম পরম ভাগবৎ জনের শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্ত-ক্ষেত্রে উদিত হইয়া তদীয় দেহেন্দ্রিয় প্রেমামৃতে প্লাবিত করেন, অথচ শ্রদ্ধাবান্ কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তাদৃশ প্রেম-লক্ষণ প্রকাশ করেন না, তাহার হৃদয় ঈষন্মাত্র দ্রবীভূত করিয়া থাকেন। আবার ঘোর-অজ্ঞানান্ধ অপরাধী জীবের হৃদয়ে উহার কোন শক্তিই প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। যেরূপ সূর্য্য মলিন মৃত্তিকাদিতে আদৌ প্রতিফলিত হয় না, তদ্রূপ হরিনামও অনন্ত বাসনা-পঙ্কিল অপরাধী জীব হৃদয়ে আশু কোন শক্তি প্রকাশ করেন না। যথা :—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্ গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

— শ্রীমদ্ভাগবত, ২।৩

হরিনাম ভক্তি-লতিকার বীজ স্বরূপ। উহা নিরপরাধ ব্যক্তির সরস হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে অচিরাৎ অঙ্কুরোদ্গম হয়—রত্যাদির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাহার হৃদয় বহুল অপরাধে প্রস্তরসদৃশ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার চিত্তক্ষেত্রে নামবীজ উপ্ত হইলেও অঙ্কুর হয় না, ভক্তি চিহ্ন প্রকাশিত হয় না। সুতরাং অপরাধী ব্যক্তি নামকীর্ত্তন করিলেও ভক্তিসুখের মুখ দেখিতে পায় না *।

অতএব সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পরিবর্জ্জন করিয়া প্রতিদিন হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে। হরিনাম-সংকীর্ত্তন-প্রভাবে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়—

* ভক্তি শাস্ত্র মতে অপরাধ দুই প্রকার; এক—সেবাপরাধ, অপর—নামাপরাধ। ইহাদের মধ্যে সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ও নামাপরাধ দশ প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যানাদিবাহনে কিম্বা পদে পাদুকা প্রদান করিয়া ভগবদ্গৃহে গমন, ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কৃত উৎসব অর্থাৎ দোল-যাত্রাদি উৎসবের অকরণ, দেবতার সম্মুখে প্রণাম না করা, উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে অথবা অশৌচে ভগবদ্বন্দনাদি, এক হস্তদ্বারা প্রণাম, দেবতা সম্মুখে পদচারণ, দেবতার অগ্রে পাদ প্রসারণ, ভগবানের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন, ভোজন, মিথ্যা কথন, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন রোদন, কলহ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ, কম্বলের আবরণে গাত্র ঢাকিয়া সেবাদি কার্য্যকরণ, দেবতার অগ্রে পরনিন্দা-পরস্তুতি, অশ্লীল ভাষণ, অধোবায়ু পরিত্যাগ, সামর্থ্য থাকিতেও কুণ্ঠতা প্রকাশ পূর্ব্বক অল্পব্যয়ে ভগবৎ উৎসবাদি নির্ব্বাহকরণ, অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, নব শস্যাদি ভগবানকে সমর্পণ না করা, আনিত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টভাগ দ্বারা দেবতার ভোগ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে প্রণাম করণ, শ্রীগুরুদেবের বিনানুমতিতে তূষ্ণীম্ভাবে তন্নিকটে উপবেশন, দেবতা নিন্দন এবং আপনার প্রশংসা করণ—এই বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ। আর সৎসকলের নিন্দা, নামাদির স্বাতন্ত্র্যরূপে মনন, শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ, বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামের মাহাত্ম্যে "ইহা

সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। প্রেম-ভক্তি, ভগবৎসেবা, সাধন-ভক্তি সংসার-বাসনা ক্ষয় ইত্যাদি অনন্ত ফল একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনদ্বারা লাভ করা যায়। তাই সকল শাস্ত্রেই নামের মহিমা,—সকলের কণ্ঠেই নামের গৌরব-গীতি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমাগত নাম লইতে লইতে আপনা হইতেই প্রেমভক্তির সঞ্চার হইবে। অতএব ভাবানুযায়ী বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রত্যহ নাম-সংকীর্ত্তন করা ভক্তিলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়। নাম করিতে করিতে আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিবে, প্রাণে শান্তি পাইবে, বিষয়-বাসনা তিরোহিত হইয়া শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার হইবে।

আজকাল বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে; সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নাম-কীর্ত্তনের জন্য কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় না; সঙ্গীত-সুখ বা বাহ্য আনন্দের জন্য কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা অস্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে "দশা" প্রাপ্ত হয়—কত রঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে, নির্ব্বোধ লোক তাহাদিগকে অবতারবিশেষ মনে করিয়া সেবাভক্তি আরম্ভ করিয়া দেয়। দশাগ্রস্ত-ব্যক্তি আপনাকে বুঝিতে না পারিয়া নিজকে গৌর বা নিতাই মনে করিয়া

অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিমাত্র" ইত্যাদি মনন, প্রকারান্তরে নামের অর্থকল্পন, নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, অন্য ক্রিয়ার নামের তুল্যত্ব চিন্তন, শ্রদ্ধাবিহীন জনকে নামোপদেশ এবং নামমাহাত্ম্য শ্রবণে অপ্রীতি—এই দশ প্রকার নামাপরাধ। এই উভয় প্রকার অপরাধীর হৃদয়ে প্রেমবিকার প্রকাশিত হয় না। এমন কি অপরাধী ব্যক্তি বহু জন্ম ব্যাপিয়া হরিনাম করিলেও প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না। যথা :—

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকে। অহঙ্কারের সঞ্চার মাত্রেই ভক্তির দফা সারা হইয়া যায়। শাস্ত্রে উক্ত আছে ;—

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবং।
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ॥

অভিমানকে সুরাপানসম, গৌরবকে রৌরব-নরকসম, প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠাসম জ্ঞান করিয়া হরির ভজন করিবে। কিন্তু বিন্দুমাত্র অহংভাবের প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিলে ভক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় ভক্তগণ প্রেমাবেশে ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। ভাব-ভক্তি-বিহীন জীব অনর্থক সে অভিনয় কর কেন? বরং ভাব মত্ততা প্রকাশ পাইলে চাপিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাতে যোগদান করিলে অচিরে উদ্রিক্ত ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। চাপিয়া থাকিতে পারিলে ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হইয়া ভক্তকে আত্মহারা করিয়া প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিবে। সে অবস্থা দর্শনে বন্ধুবান্ধবও ধন্য হইয়া যাইবে। নতুবা লোকের কাছে বাহাদুরী লইবার জন্য এরূপ ধর্ম্মের আড়ম্বর বড়ই ঘৃণার্হ! নাস্তিকতা অপেক্ষা ধর্ম্মের ভাণ অনিষ্টকারক। অতএব লোক দেখান ভণ্ডামী—লোক ভোলান ভোগলামী ত্যাগ করিয়া সরল বিশ্বাসে সমাহিতচিত্তে দীনতাবলম্বন পূর্ব্বক ভগবৎ-নামগুণ-কীর্ত্তন করিবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—শিক্ষাষ্টক

তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম-কীর্ত্তন করিবে। পতিত-পাবন দীন-দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গদেবই এদেশে বিশেষভাবে হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ভগবানের নাম লীলাকীর্ত্তন—রূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ে অনুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। সুতরাং তিনি তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত করেন, কখন রোদন করেন, কখন ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করেন, কখন গান করেন, এবং কখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন।

চিত্তশুদ্ধির সাধন, সাধু-সঙ্গ ও নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আপনা হইতেই ভক্তির উদয় হইবে। প্রথমতঃ শ্রদ্ধা উদয় হইয়া থাকে; তখন সদ্‌গুরুর কৃপা আকর্ষণ করিয়া দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণ করতঃ উচ্চস্তরের সাধনায় নিযুক্ত হইবে।

ভক্তির চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনা।

—(*)—

ভক্তি সাধনার ধন; ভক্তি করিব বলিলেই ভক্তি করা যায় না। অভ্যাসে যেমন জগতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, তেমনি ভক্তিও লাভ করা যায়,—কিন্তু ব্যাপার একটু কঠিন। সাধন-ভক্তিতে পূজা, জপ, হোম, ব্রত, নিয়মাদি করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পিত হইতে হয়; পূজা, অর্চ্চনা' যাগ-যজ্ঞ ও স্তবকবচাদি দ্বারা ভগবান্‌কে সাধনা করিতে হয়। অরূপকে সরূপ করিয়া, মূর্ত্তি গঠিয়া, চিত্র আঁকিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়। তাঁহার লীলা শ্রবণ, লীলাস্থান অর্থাৎ তীর্থাদি দর্শন, স্মরণ, মনন, ভাষণ প্রভৃতি সাধন ভক্তির অঙ্গ। অঙ্গ কাহাকে বলে,—

আশ্রিতাবান্তরানেকভেদং কেবলমেব বা।
একং কর্ম্মাত্র বিদ্বদ্ভিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাহার অবান্তরে ভেদ লক্ষিত হয়, অথবা যাহাতে স্বগত ভেদ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না, এতাদৃশ বক্ষ্যমান্ এক একটী কর্ম্মকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। ভক্তিশাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; তন্মধ্যে চতুঃষষ্টিপ্রকার মুখ্য। এই চতুষষ্টিপ্রকার ভক্তির অঙ্গ তিনটী স্তরে বিভক্ত। যথা:—

প্রথম সোপান।—গুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ, মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ ও গুরুদেবের নিকট হইতে তত্ত্ববিষয়ক শিক্ষালাভ, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুসেবা, ভক্তদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন, সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, ভগবানের প্রসন্নতা হেতু ভোগবিলাস ত্যাগ, তীর্থবাস, যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না করিলে ভক্তিলাভ হয় না—সেই পর্য্যন্তের অনুষ্ঠানরূপ যাবদর্থানুবর্ত্তিতা, একাদশী প্রভৃতি হরিবাসরের যথাশক্তি সম্মান এবং আমলকী, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের গৌরব রক্ষা;—এই দশটী অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ভস্বরূপ অর্থাৎ এই দশটী অঙ্গ যাজন করিতে পারিলে ভক্তির সঞ্চার হইবে।

দ্বিতীয় সোপান।—দূর হইতে ভগবদ্বিমুখ জনের সংসর্গত্যাগ, অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যাদিরূপে অঙ্গীকার না করা, মঠাদি-নির্ম্মাণ বিষয়ে নিরুদ্যমতা, বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুঃষষ্টিপ্রকার কলার অভ্যাস বা ব্যাখ্যা এবং বাদ-পরিবর্জ্জন, যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিংবা লব্ধবস্তু বিনষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে শোচনা না করিয়া অদীন ভাব প্রকাশ, শোক মোহাদির অবশীভূততা, অন্য দেবতার অবজ্ঞাশূন্যতা, প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, সেবাপরাধ ও

নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে না দেওয়া, এবং ভগবান ও ভক্তের নিন্দা বা বিদ্বেষ করণ ও শ্রবণ পরিত্যাগ ;—এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধনভক্তির উদ্রেক হয় না। এজন্য এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। যদিও উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ, ভক্তিতে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ; তথাপি গুরুপদাশ্রয় প্রভৃতি তিনটী অঙ্গ প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় সোপান।—বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, শরীরে হরিনামাক্ষর লিখন নির্ম্মাল্য ধারণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্যকরণ, দণ্ডবৎ প্রণাম করণ, ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান, অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভগবানের প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন, পরিক্রমা, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সংকীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, (নিবেদন), স্তবপাঠ, নৈবেদ্য-স্বাদগ্রহণ, চরণামৃত সেবন, ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, আরাত্রিক ও উৎসবাদি দর্শন, ভগবৎনাম শ্রবণ, ভগবানের কৃপার প্রতি নিরীক্ষণ, স্মরণ, ধ্যান, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, ভগবানে স্বীয় প্রিয়বস্তু সমর্পণ ভগবানের জন্য সমুদয় চেষ্টা, সকল অবস্থাতে শরণা-পত্তি, তুলসীসেবন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসেবন, মথুরাসেবন, বৈষ্ণবসেবন, যেমন বিভব তদনুরূপ গোষ্ঠীবর্গের সহিত মহোৎসব, কার্ত্তিক মাসের সমাদর, শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রা, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যাদি, ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, যাঁহার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ এপ্রকার সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ও মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি ;—এই চুয়াল্লিশ প্রকার অঙ্গ সাধনভক্তির চরম যাজন। ইহার সাধনায় ভক্ত সিদ্ধদশায় উপনীত হন।

এই প্রকারে ক্রমশঃ পৃথক ও সমষ্টিরূপে শরীর, ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ দ্বারা চতুঃষষ্টিপ্রকার উপাসনা কথিত হইয়াছে ; ইহার সাধনায় হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। সাধনা অর্থে অভ্যাস বা অনুশীলন। অনুশীলন বা

অভ্যাস না করিলে, কিছুই লাভ করা যায় না। আহার-বিহার-গমন প্রভৃতি সামান্য কার্য্য গুলিও যখন অভ্যাস-সাপেক্ষ, তখন মানবের অতি উচ্চ বৃত্তিগুলি যে বিনা অনুশীলনে উন্নতভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে পারে না। ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ, ভাগবত কথার আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে ; অথবা দেবতা-অর্চ্চনা, পূজা, জপ, তপ, দান, ধ্যান, পুরশ্চরণ প্রভৃতি দ্বারাও ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তং পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০।৮-১০

পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা আমাকে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হন, এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া, একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত ভক্তগণকে বুদ্ধি প্রদান করি, তাঁহারা তদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেননা বুদ্ধির বিকাশই ভক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি উপস্থিত হইলে সৎ কি, অসৎ কি, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, এসকল অবগত হইতে পারা যায় ; তখন আপনিই ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। যখন

মনুষ্যের সকল বৃত্তিই ঈশ্বর-মুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। তাহা হইলে, ঈশ্বরে সেই সমস্ত বৃত্তি অর্পিত হইলে তাঁহার আনন্দ-স্বরূপ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সুখই প্রদান করিয়া থাকে। দর্পণে চাহিয়া হাসিলে, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বও হাসিতে থাকে। বৃত্তি সমুদয় তাঁহাতে এক-মুখী হইলে, তাঁহার স্বরূপ প্রতিভাত হয় তিনি আনন্দময়, তিনি আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য, সুতরাং ভক্তেরও সেই ভাব উদয় হয়; তখন মানুষ সুখী হইয়া থাকে। আর কিছুই থাকে না,—আর কিছুই বোঝে না। সেই আনন্দেই তাহার আনন্দ,—সেই ভাবেই সে বিভোর। সর্ব্বপ্রকার ভাবের সহিত, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির সহিত, সর্ব্বপ্রকার বাসনার সহিত, সর্ব্ব-প্রকার কামনার সহিত, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের অনুরক্তিই প্রেমভক্তি। ভক্তি হইতেই প্রেম জন্মে। প্রেমের উদয় হইলেই জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম-পরম্পরা ভক্তির অঙ্গ, কিন্তু তাহা ভক্তিতত্ত্ববেত্তা ঋষিগণ স্বীকার করেন না। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন যায়তে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৯

যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যাবৎ ভাগবতী কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল করিবে। শ্রদ্ধা জন্মিলেই আর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজন নাই; সুতরাং তাহা কিরূপে ভক্তিসাধনার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু তাহাও যুক্তি সঙ্গত

বলিয়া বোধ হয় না। ভক্তিমার্গের অবিরোধি জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার প্রথম সহায়, সুতরাং তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুগণের মত এই যে, উত্তরকালে জ্ঞান ও বৈরাগ্যে অনুগত থাকিলে দোষান্তরের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চিত্তের কাঠিন্য জন্মে, কারণ মহাজনগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে চিত্ত কাঠিন্যের হেতু বলিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, নানা বাদ নিরাস করিয়া তত্ত্ববিচার করিতে গেলে এবং দুঃসহ অভ্যাস পূর্ব্বক বৈরাগ্য-সাধন করিতে হইলে অবশ্যই চিত্তের কাঠিন্য জন্মে; অতএব ভক্তি ভিন্ন ভক্তিলাভের আর অন্য হেতু হইতে পারে না। জ্ঞানসাধ্য মুক্তি ও বৈরাগ্যজ্ঞান, কেবল ভক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য যোগ, দান ও অন্যান্য মঙ্গল দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, ভগবদ্ভক্তগণ কেবল ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিদ্বারা সেই সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্ছতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৩৩

যদিও আমার ভক্তগণের কোন প্রকার অভিলাষ নাই, তথাপি ভক্তের উপযোগিতার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ যদি তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও মদীয় ধাম বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাও অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। অন্তঃশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি, তপস্যা এবং শান্তি প্রভৃতি গুণসকল ভগবৎ-সেবাভিলাষী ভক্তগণের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং উহাদিগকেও ভক্তির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না।

বৈধীমার্গের ভক্তগণ প্রোক্ত চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির আশ্রয়ে পরিপক্ক অবস্থায় শান্তিরতি লাভ করিয়া চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত হন। আর

রাগানুগামার্গের ভক্তগণ সাধনভক্তির একমাত্র মুখ্যাঙ্গ বা বহু অঙ্গের আশ্রয়ে পরিপাকদশায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যথা :—

এক অঙ্গ সাধে কিবা সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইলে বহে প্রেমের তরঙ্গ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যে ভক্তি একমাত্র মুখ্যাঙ্গ অথবা বহু অঙ্গ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ভক্তিই ভক্তগণের নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। যথা :—

স ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতাঽনেকাঙ্গিকাথবা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥

—স্কন্দ পুরাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীমদ্ভাগবতকীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণসেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যবিষয়ে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন ও আত্মনিবেদনে দৈত্যরাজ বলি কেবল এক এক মুখ্যাঙ্গ এবং মহারাজ অম্বরীষ অনেক অঙ্গ আশ্রয়ে ভক্তির সাধন করিয়া ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যোক্ত সাধনপঞ্চক

কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বর্ত্তমান যুগের প্রথম-সন্ধ্যায় জগতে আবির্ভূত হইয়া নিগূঢ় প্রেমসম্পদ পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে

জগদ্বাসী জীবগণকে সম্প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের নিতান্ত শক্তিহীন মানব তাঁহারই অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বোত্তম প্রেমভক্তি লাভের আশা করিতেছে। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যের অনুকম্পা ব্যতীত কালগ্রস্ত মানব অন্য কোন উপায়ে পরমপ্রেমের অধিকারী হইতে পারিবে না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল পারিষদ বহুবিধ ভক্তি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া প্রেমভক্তি লাভের পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অপণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহাদিগের বিরচিত গ্রন্থ সমুদায়ই তাঁহাদিগের অপার্থিব জ্ঞান ও অলৌকিক প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অন্যতম। তিনি অনর্পিত প্রেমভক্তির অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া যে অসমোর্দ্ধ ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী বংশধরদিগকে উপভোগ করাইবার জন্য তাহার সুগম পন্থা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব সেই গ্রন্থের প্রামাণিক মহাবাক্য "বাঙ্গালার কবিতা" বলিয়া কেহ যেন উপেক্ষা করিবেন না। কেহ কেহ বৈষ্ণবশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া উহাকে "বৈষ্ণবী হেঁয়ালি" মনে করিয়া নিজের নাসিকাটী কুঞ্চিত করিয়া বসেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যেক কথা দর্শন বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর সংস্থাপিত; উহা ডোরকৌপীনধারী নেড়ানেড়ীর অজ্ঞান-বিজৃম্ভিতশূন্যোচ্ছ্বাস নহে। আগে হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, দর্শন, উপনিষৎ পাঠ কর, তৎপরে ঐ কৌপীন-কন্থাধারী বৈরাগীর হেঁয়ালি পাঠ করিতে প্রয়াস করিবে, তখন যদি কিছু বুঝিতে পার। এই ভাবের ভাবুক ভিন্ন অন্যের সে তত্ত্ব বোধগম্য হইবে না।

পরমদয়ালু মহাপ্রভু প্রেমভক্তি প্রাপ্তির সুগম পন্থা প্রচার করিয়াছেন; তিনি প্রভুপাদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

"সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজে বাস এই পঞ্চবিধ উপায়ে প্রেম-ভক্তি লাভ হয়।" শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের স্বগত উক্তি হইতেই ইহা প্রকাশিত আছে। যথা :—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত নাম,
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান।
এই পঞ্চ মধ্যে যদি এক স্বল্প হয় ;
সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দুরূহ ও আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেও সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ভাব জন্মিতে পারে।

সৎসঙ্গ।—আমরা পূর্ব্বেই সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি। সাধুসংসর্গের গুণে অস্পৃশ্যা-কুলটাও পরম ভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। যথা :—

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥

—ভক্তমালগ্রন্থ।

নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে একটী দাসীর পুত্র ছিলেন ; তিনি প্রভুর আদেশে সাধুদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সাধু-সঙ্গের গুণে ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। যথা :—

উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।

এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস
স্তর্দ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত।

ব্রাহ্মণসাধুদিগের অনুমতি লইয়া আমি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতাম, তদ্দ্বারা আমার পাপ দূর হইল; এইরূপ করিতে করিতে আমার বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের যে পরমেশ্বরভজনরূপ ধর্ম্ম, তাহাতে আমার মনে রুচি জন্মিল।

সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা। সাধুচরিত্র আলোচনা ও সৎগ্রন্থ পাঠও সৎসঙ্গের অন্তর্গত। সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবন ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করে।

কৃষ্ণ সেবা।—কৃষ্ণসেবা অর্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, গুরুসেবা ও ভক্তসেবা বুঝিতে হইবে; ইহা বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হইবে। আর অন্তরেন্দ্রিয় মনদ্বারা মনোময়ী মূর্ত্তির সেবা করিবে। জগতের সকল জীবকে ভগবান্ মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিতে পারিলে প্রকৃত কৃষ্ণসেবা হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা ভক্তি লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা আর কি হইতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ চিন্তায় মন, বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে বাক্য, হরির মন্দির মার্জ্জনাদিতে কর, তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণে কর্ণ, শ্রীমূর্ত্তির মন্দির দর্শনে নয়নদ্বয়, ভক্ত-গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, শ্রীমূর্ত্তির পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর গন্ধে নাসিকা, তাঁহাকে নিবেদিত অন্নাদিতে রসনা, শ্রীহরির ক্ষেত্রে পরিক্রমণের জন্য পদদ্বয় ও তাঁহাকে প্রণামের জন্য মস্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্য বিষয়গুলি ভোগলিপ্সু না হইয়া ভগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্তগণকে যে ভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকে

সেই শ্রেষ্ঠতমা ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষয় রত্নাভরণ, অস্ত্রাদি, রত্নভাণ্ডার কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না। ক্রমে পরমাভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র হরিপাদপদ্মে মগ্ন হইয়া রহিল। ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা নতু মুক্তিঃ কদাচন ॥

—আদিপুরাণ।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আমার নাম গ্রহণ করেন এবং আমার সেবাতেই যাঁহার প্রীতি অনুভব হয়, আমি তাহাকে ভক্তি ভিন্ন মুক্তি কখনই প্রদান করিব না।

ভাগবত।—নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং অর্থাৎ এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অমৃত ফল। অমৃতরসান্বিত রসস্বরূপ এই ফল প্রেমভক্তি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ পান কর। ভাগবতে কত ভক্ত এবং তাঁহাদিগের চরিত্র আখ্যাত রহিয়াছে; কোন্ ভক্তকে ভগবান কিরূপে কৃপা করিলেন, কোন্ ভক্ত কিরূপে ভক্তিলাভ করিলেন, বিশেষতঃ তাহাতে ভগবানের অনন্ত গুণ, অহেতুক কৃপা এবং অসমোর্দ্ধ-লীলামাধুর্য্য গাঁথা রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রব না হইয়া পারেনা। ভগবানের স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্ত্তন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে সকল গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়, তাহাই ভাগবত শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তৎসমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে; তাই চৈতন্যদেব ভাগবতকে ভক্তির একটি প্রধান সাধন বলিয়াছেন। ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকে।

একমাত্র ভাগবত শ্রবণে মহারাজা পরীক্ষিৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মলাভের জন্য যোগী ঋষি জ্ঞানিগণ আত্মহারা, ভাগবত গ্রন্থ সেই ব্রহ্মকে চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তনুর আভা বলিয়া একমাত্র ভক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিলাভের জন্য ভাগবত পাঠ একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের পুরাণ, উপপুরাণ সমস্তই ভাগবত শাস্ত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক পুরাণই ভগবান্ ও ভক্তের কাহিনীতে পূর্ণ। তবে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নাম।—কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ নাম-সাধনার অন্তর্গত; সুতরাং ভক্তি পথের সহায়। নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরবে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শুনাকে শ্রবণ এবং নাম বা মন্ত্রাদির লঘু উচ্চারণকে জপ বলে।* হরির যে নামানুকীর্ত্তন ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষদিগের তত্তৎ ফলের সাধন এবং মুমুক্ষুদিগের পক্ষেও ইহাই মোক্ষসাধন, অপর ইহাই জ্ঞানীদিগেরও জ্ঞানের ফল হয়; অতএব সাধক এবং সিদ্ধ, কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষা অন্য পরম মঙ্গল আর নাই। শ্রীমুখে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তস্য চার্জ্জুন॥

—আদি পুরাণ।

হে অর্জ্জুন! আমার নাম গান করতঃ যে ব্যক্তি আমার নিকটে বিচরণ করেন, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তাঁহার নিকট ক্রীত হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকি। নাম ও নামীতে ভেদ না থাকা প্রযুক্ত নামই

* জপের নিয়ম ও কৌশলাদি বিশেষ করিয়া মৎপ্রণীত "তান্ত্রিকগুরু" পুস্তকে লিখা হইয়াছে।

চিন্তামণিস্বরূপ। অর্থাৎ সমস্ত পুরুষার্থপ্রদায়ক ঐ নাম চৈতন্যরসস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন এবং মায়াসম্বন্ধবিরহিত ও মায়া হইতে অতীত। এই হেতু ভগবৎ-নাম প্রকৃতই ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে সাধারণ জনগণকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়; তাহার কারণ এই যে ভগবন্নামাদি গ্রহণে রসনাদি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হইলে নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব "হরিনাম ব্যতীত কলিগ্রস্ত জীবের অন্য গতি নাই" ইহা ত্রিসত্য করিয়া বারম্বার বলিয়াছেন। যথা :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

বাস্তবিক দুর্ব্বলাধিকারী কলির মানবগণের নাম ব্যতীত গতি নাই। অযোধ্যাপতি দশরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-বিধান-জন্য বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেন। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব আশ্রমে অনুপস্থিতিহেতু তদীয় পুত্র বামদেব পাপ মোচনজন্য রাজাকে সংকল্পপূর্ব্বক তিনবার রামনাম করিতে বলেন। পরে বশিষ্ঠদেব সেই কথা শ্রবণ করতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "এক রাম নামে কোটি ব্রহ্ম হত্যার পাপ বিনাশ হয়, তুই রাজাকে তিনবার রামনাম করাইলি কেন? হতভাগ্য! ব্রাহ্মণ হইয়াও নামের মর্য্যাদা জানিস না, তুই চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ কর।" নামের অসাধারণ মহিমা। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলেন, "এক হরি নামে যত পাপ বিনাশ করে, জীবের তত পাপ করিবার সাধ্যই নাই।" নাম লইতে লইতে প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে।

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ব্ব জন্মে নাম শ্রবণ করিয়াই দেবর্ষি নারদের ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। যথা :—

> ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরে
> বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
> সংকীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি
> র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা॥
>
> —শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।২৮

এইরূপে শরৎ ও বর্ষাকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির অমল যশঃ প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে শুনিতে শুনিতে আমাতে রজঃতমো-নাশিনী ভক্তির উদয় হইল।

নাম করিতে আরম্ভ করিলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হয়, বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। নাম করিতে করিতে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পরম-পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ব্রজবাস।—ব্রজবাস অর্থে মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত যে কোন স্থানে বসতি করা বুঝিতে হইবে। এই মথুরামণ্ডলে একদিন প্রেমভক্তির প্রবল জোয়ারে যমুনা উজান বহিয়াছিল, পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত 'হরিনাম' গাহিয়াছিল,—বিনা বসন্তে বৃক্ষলতা ফল-পুষ্প প্রসব করিয়াছিল। মথুরা মণ্ডলের কথা শুনিলেই প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। আজিও মথুরামণ্ডলের প্রতি ধূলিকণায়—প্রতি পরমাণুতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকণা জড়িত হইয়া আছে ; সুতরাং তথায় বা তথাকার 'রজঃ' সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে যে ভক্তের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার হইবে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা। শুধু মথুরামণ্ডলে বলিয়া নহে, সর্ব্বতীর্থই পাপ নাশক ও ভক্তি-উদ্দীপক। ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ কিম্বা মুনিগণের

অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক তীর্থস্থানেই ভগবান্ কিম্বা ভগবচ্ছদৃশ কোন মহাত্মার লীলাভূমি। সুতরাং তথায় তাঁহাদের অসাধারণ শক্তি, জ্ঞান বা ভক্তি পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে; কোন ব্যক্তি তথায় যাইবামাত্র সেই পুঞ্জীকৃত শক্তি তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া ফেলে। তাহার ফলে সেই ব্যক্তির তত্তৎ বৃত্তি জাগ্রত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রত্যহ কত লোক তীর্থস্থানে একই মনোবৃত্তি লইয়া গমন করিতেছে, তাঁহাদের সমষ্টি মনোবৃত্তি তথায় পুঞ্জীকৃত ইচ্ছাশক্তি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তীর্থবাসী মানবগণের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিয়া, তদুপযোগী করিয়া লয়। সুতরাং আপন আপন ভাবানুযায়ী তীর্থে বাস বা ভ্রমণ করিলে, হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়। বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নানা দেশ ভ্রমণ করিলে, ভগবানের বিশ্ব-সৃষ্টি-কৌশলের বিচিত্র ব্যাপার—কত নদ-হ্রদ-সাগর, কত পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, কত শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভূমি নানাজাতি কুসুমের সুন্দর সুষমা সন্দর্শন করিয়া কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আরও এক সুবিধা; তীর্থ-ভ্রমণকালে অনেক সাধুমহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারা যায়।

তবে যাঁহারা প্রেমভক্তি অথবা গোপীভাবনিষ্ঠ প্রেমরস লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে মথুরামণ্ডলেই অবস্থিতি করিতে হইবে। কারণ প্রেমভক্তির উত্তাল-তরঙ্গ এক মথুরামণ্ডল ভিন্ন অন্য কোথাও উঠে নাই, পুরাণশাস্ত্রে ব্রজভূমি মথুরামণ্ডলের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। যথা :—

শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্॥

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

শ্রুত, স্মৃত, কীর্ত্তিত, বাঞ্ছিত, দৃষ্ট, প্রাপ্ত স্পৃষ্ট, আশ্রিত ও সেবিত হইলে, মথুরা মনুষ্যমাত্রেরই সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করেন। তাই আধুনিক কোন ভক্ত গাহিয়াছেন,—

কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি, কাঁদিয়া বেড়াব স্কন্ধে লয়ে ঝুলি ;
কণ্ঠ বলে কবে পিব করে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥

পরম আনন্দময়ী প্রেম-লক্ষণা সিদ্ধি ত্রৈলোক্যে দুর্ল্লভা; কিন্তু "পরমানন্দময়ী সিদ্ধিঃ মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ" অর্থাৎ মথুরা স্পর্শ মাত্রতঃ তাহা লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রজে বাস ভক্তিলাভের প্রধান সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই পাঁচটী ভক্তির অঙ্গ সাধন করিলেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। এমন কি এই পাঁচটীতে অল্পমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলেও মনুষ্যের পরম শ্রেয়ো লাভ হয়। যথা :—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

দুরূহ অথচ অদ্ভুতবীর্য্যশালী এই সাধনপঞ্চক অর্থাৎ সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজবাস এই পাঁচপ্রকার অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক অল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও ভক্তদিগের অন্তঃকরণে অচিরাৎ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভাবের উদয় হইলে প্রেমলাভের জন্য ভাবের সাধনা করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চভাবের সাধনা

——:(*):——

ভাবনাবিষয়ে অনন্ত বুদ্ধি হইয়া ভক্তগণ হৃদয়মধ্যে দৃঢ়সংস্কার দ্বারা যাঁহাকে ভাবনা করেন, তাঁহার নাম ভাব। সুতরাং ভাব বলিলে ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে; তাই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, "ভাবরূপী জনার্দ্দন।" সুতরাং ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সেই ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই ভাব পাঁচ প্রকার; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তাদি পাঁচটী ভাব প্রধানীভূতা ভক্তির এবং দাস্যাদি চারিটী ভাব কেবলা ভক্তির অন্তর্গত। ভক্তগণের ভেদবশতঃ ভাব এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই পাঁচটী ভাব পর পর শ্রেষ্ঠ। কেননা যেরূপ আকাশাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ পর পর ভূতে পর্য্যবসিত হয়; তদ্রূপ দাস্যে শান্ত; সখ্যে—শান্ত ও দাস্য; বাৎসল্যে—শান্ত, দাস্য ও সখ্য; মধুরে—শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটী ভাবই বর্ত্তমান আছে। যথা:—

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই পঞ্চবিধ ভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাব আছে। দাস্যে শান্তির স্থায়ী ভাব, সখ্যে দাস্যের স্থায়ী ভাব, বাৎসল্যে সখ্যের স্থায়ী ভাব এবং মধুরে ভাবচতুষ্টয়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটী কথা আছে। আকাশাদি ভূত পর পর ভূতে অনুসৃত হইয়া পঞ্চীকরণরূপে

এই জগৎপ্রপঞ্চের এবং তাহা হইতেই স্থূল শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে,—আকাশাদি ভূত যেমন পঞ্চীকরণ সমবায়ে স্থূলের উৎপত্তি করিয়াছে,—তেমনি শান্তাদি ভাবও ক্রমে ক্রমে অনুস্যূত হইয়া জীবহৃদয়ে মধুররসরূপে বিদ্যমান আছে। এই মধুরভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ এইভাবে ভগবান্ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শান্তভাব। বক্ষ্যমান বিভাবাদিদ্বারা শমতাসম্পন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে স্থায়ী শান্তিরতি আস্বাদনীয় হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্তভক্তিরস বা শান্তভাব বলিয়া বর্ণনা করেন। যথা:—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈ শান্তিভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ সুখ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই সুখ অতি অল্পতর, আর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্ফূর্ত্তিরূপ যে ঈশময় সুখ তাহাই প্রচুরতর। এই ঈশময় সুখেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকারতাই গুরুতর হেতু, দাস্যাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব লীলাদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হয় না, অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎ-সাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, লীলাদিতে তাঁহাদের দাসাদির ন্যায় রুচি উৎপন্ন হয় না। যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই এবং সকল ভূতের সমভাব, তাহাকেই শান্তভাব বলে। সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ শান্তভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শান্তভাবে শান্তিরতি স্থায়ী ভাব। এই শান্তিরতি সমা ও সান্দ্রাভেদে

দুই প্রকার হয়। অসংপ্রজ্ঞাত নাম সমাধিতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নাম **সমা** এবং সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাধ্বংশহেতু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইলে সর্ব্বতোভাবে ভক্তহৃদয়ে যে আনন্দ আবির্ভূত হয়, তাহাই **সান্দ্রা**। শান্তভাবে প্রলয় ব্যতীত অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব জ্বলিত-ভাবে অনুভাব হইয়া থাকে, কিন্তু দীপ্ত হয় না।

বৈধিভক্তিমার্গের ভক্তগণের মুক্তিবাঞ্ছা না থাকিলে পরিপাকদশায় শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন শুকদেব ভগবৎ-করুণায় জ্ঞান-সংস্কারসমূহকে শ্লথ করিয়া ভক্তি রসানন্দে প্রবীণ হইয়াছিলেন; তেমন কখনও যদি কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপাতিশয় হয়, তাহা হইলে সে যদি প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠ থাকে, তবে পরে তাহার শান্তভাব লাভ হয়। নির্গুণ ভক্তির প্রধানীভূতা মার্গের ভক্তগণও প্রথমে শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধির নাম শম, অতএব এই শান্ত ভাব ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠা দুর্ঘট। শান্তভাব কেবলা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে।

দাস্যভাব।—আকুলহৃদয়ে ভগবানের সেবা করিলে দাস্যভাবের সাধনা হয়। দাস্যভাবকে প্রীতিভক্তিরস বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা ঃ—

আত্মচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

আত্মোচিত বিভাবদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, একারণ ইহা প্রীতিভক্তিরস বলিয়া সম্মত। অনুগ্রহ পাত্রের সম্বন্ধে দাসত্ব এবং পালনীয়ত্ব প্রযুক্ত এই দাস্যভাব দুই প্রকারে বিভক্ত;—এক

সম্ভ্রমদাস্য, অপর গৌরবদাস্য। দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ভগবানে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইলে ইহাকে সম্ভ্রমদাস্য বলা যায়। আর আমি ভগবানের পালনীয়, এইরূপ অভিমানী ব্যক্তিদিগের ভগবদ্বিষয়ে উত্তরোত্তর গুরুত্ব-জ্ঞানময় প্রীতি পুষ্ট হইলে, তাহাকে গৌরবদাস্য বলা-যায়। সোজা কথায় হনুমানাদির ন্যায় প্রভুভাবে ভগবদ্ভজনের নাম সম্ভ্রমদাস্য আর প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় পিতাভাবে কিম্বা রামপ্রসাদাদির ন্যায় মাতাভাবে ভগবদ্ভজনের নাম গৌরবদাস্য।

দাস্যাভিমানী ভক্তগণ মনে করেন, আমি তাঁহার দাস—আমি তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য। আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন—কর্ম্ম করিবার জন্য। এই জগৎটা তাঁহার বড় সাধের কর্ম্মশালা। সবই তাঁহার—সবই তিনি। আমি তাঁহার ভৃত্য, তাঁহারই কাজ করিতেছি। কর্ত্তব্য বলিয়া করি না—না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই আকুল লালসায় করিতেছি। এই দাস্য-ভাব নিষ্কামসেবা। প্রাণের টানে জগদ্রূপী জগন্নাথের সেবা করিলে অচিরে প্রেম লাভ করা যায়।

প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের সাধকগণ গৌরবদাস্য ভাব এবং কেবলা ভক্তি মার্গের সাধকগণ সম্ভ্রমদাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সখ্যভাব।—সখার উপরে—বন্ধুর উপরে যে ভালবাসা হয়, সেইরূপ ভালবাসার সহিত যে ভগবদ্ভজন, তাহাকে সখ্যভাব বলে। সখ্যভাবকে প্রেমভক্তিরস বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা :—

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্য্যতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

স্থায়ীভাবে আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা সৎসকলের চিত্তে সখ্যরসকে পুষ্টি প্রাপ্ত করাইলে, ঐ সখ্য প্রেমভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ভগবান্‌কে

সখা বা বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার প্রীতি বা আনন্দ বিধানার্থ নিজ হৃদয়ের আনন্দপূর্ণ লালসাকে সখ্যভাব বলে। প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের ভক্তগণ অর্জ্জুনাদির ন্যায় এবং কেবলা ভক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রজ-রাখালগণের ন্যায় সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সখ্যভাবের সাধনায় কামনা দূরীভূত হয়,—আসক্তির আগুন নিবিয়া যায়। সখ্যভাবে সমস্ত জগৎ এক সখারূপে প্রতীয়মান হয়। কেননা সকলেই খেলিতে আসিয়াছি; রাজারও খেলা, প্রজারও খেলা, ধনীরও খেলা, দরিদ্রেরও খেলা; সাধুরও খেলা, অসাধুরও খেলা; সুস্থেরও খেলা, রোগীরও খেলা;—খেলা সর্ব্বত্র। এই খেলার সাথী বিশ্বেশ্বর। বিশ্ব তাঁহার মূর্ত্তি,—বিশ্বের সহিত সখ্যতা, বিশ্বের সহিত ভালবাসা—ইহাই সখ্যভাব। সখ্যভাবের ভক্তগণ শান্তভাবের ভক্তের ন্যায় ভগবানকে মহিমান্বিত কিম্বা দাস্যভাবের ভক্তের ন্যায় সম্ভ্রমযুক্ত মনে করিতে পারেন না; তাঁহারা ভাবেন, ভগবান্ আমারই মত, তাই তাঁহারা ভগবানের কাঁধে চাপিতে—উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে সঙ্কুচিত হন নাই। ব্রজ-রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসদৃশ মনে করিতেন। তাঁহার সঙ্গে খেলা করিয়া—গরু চরাইয়া—কাঁধে চড়িয়া—কাঁধে করিয়া তাঁহারা আত্মহারা হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের কোন কারণে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ পাইলে, ইহারা তাহা "ঠাকুরালী" মনে করিয়া মুখ বাঁকা করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখ ম্লান দেখিলে কাঁদিয়া ফেলিতেন,—অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখিতেন। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্কঃ, ১২ অঃ

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাঁহাকে ব্রহ্মসুখানুভূতিতে এবং ভক্তেরা যাঁহাকে সর্ব্বারাধ্যরূপে আর মায়াশ্রিত ব্যক্তি যাঁহাকে নরশিশু-জ্ঞানে প্রতীতি করেন, মায়ামুগ্ধ গোপবালকেরা যে সাধারণ নরশিশুবোধে তাঁহার সহিত ঐরূপ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের রাশি রাশি পুণ্যের ফলে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক কত দীর্ঘ দীর্ঘ জন্ম—কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ সাধিয়া কাঁদিয়া চাহিয়া থাকিয়া তবে সে ভাগ্য লাভ হইতে পারে।

সখ্যভাবে ভগবানকে আত্মসদৃশ ভাবনা করিতে করিতে ভক্তগণও ভগবৎ-সদৃশ গুণসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বাৎসল্য ভাব।—পিতামাতা প্রাণ উঘাড়িয়া যেমন পুত্রকন্যাকে ভালবাসেন, সেইরূপ ভগবানকে পুত্রকন্যার ন্যায় ভালবাসাই বাৎসল্য ভাব। ইহাই শাস্ত্রে বৎসলভক্তিরস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা :—

বিভাবৈস্তৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

বিভবাদিদ্বারা বাৎসল্য পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হয়, পণ্ডিতগণ ইহাকেই বৎসলভক্তিরস বলিয়া থাকেন। বাৎসল্যভাব নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা। পিতামাতা সন্তানের কাছে চাহিবেন কি?—সর্ব্বস্ব দিয়াও পিতামাতার সাধ পূর্ণ হয় না। পিতামাতার নিকটে সন্তানেরই সর্ব্বদাই আব্দার,—সর্ব্বস্ব দিয়া, সর্ব্বশক্তির সংযোগ করিয়া সন্তান লালনপালন করেন, তথাপি পিতামাতার সাধ পূরে না। সন্তানের জন্য পিতামাতা সহস্রবার আত্মত্যাগ করিতে পারেন। আপনি উপবাসী থাকিয়া সন্তানের উদর পূর্ণ করেন, আপনি ছিন্নবস্ত্র পরিয়া সন্তানকে নববস্ত্রে সুসজ্জিত করেন, আপনি রোগশয্যায় পড়িয়া সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন,—আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা

নাই, কেবলই পুত্রের মঙ্গল কামনা। পুত্রের গুণ শ্রবণে, পুত্রের প্রশংসা শ্রবণে পিতামাতার হৃদয় পুলকিত হয়,—প্রাণ দিয়াও সন্তানের সুখ-সাধনা সম্পন্ন করিতে পিতামাতা আনন্দ বোধ করেন। ঈশ্বরকে এমনই ভাবে ভালবাসিতে পারিলে, তাহাকেই বাৎসল্যভাব বলে।

নন্দ-যশোদা ও মেনকার বাৎসল্যভাব কেবলাভক্তির অন্তর্গত, এবং দেবকী-বসুদেবের বাৎসল্যভাব প্রধানীভূতা ভক্তির অন্তর্গত। বাৎসল্য-ভাবের ভক্তগণ বলেন, বিশ্বেশ্বর আমার পুত্র—আমার স্নেহের সন্তান, আমি প্রাণের টানে—বাৎসল্যভাবের আকর্ষণে সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিয়া সুখী হইব। তাঁহারা পুত্রজ্ঞানে জীব ও জগতের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বাৎসল্যভাবে ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান।

মধুর ভাব।—পত্নী যেমন পতিকে ভালবাসে, কান্তের উপর কান্তার যেমন অনুরাগ, ভগবানের উপর তেমনই ভালবাসার নাম মধুর ভাব। সর্ব্বপ্রকার ভাবের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ; ইহা জগতের সর্ব্বোচ্চ ভাবের উপর স্থাপিত।

আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতাং সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা মধুরারতি সৎসকলের হৃদয়ে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়। প্রকৃত-শৃঙ্গাররসে সমতা দৃষ্টিদ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধীয় মধুরাখ্য ভক্তিরস হইতে বিরক্ত ব্যক্তি সকলে উক্ত ভাব অযোগ্যত্ব, দুরূহত্ব, এবং রহস্যত্ব প্রযুক্ত বিবৃতাঙ্গ; আমরা ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিতেছি।

রাধিকাদি গোপীগণ এবং রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ এই মধুর ভাবের আদর্শ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে এই মধুরাখ্য ভাবভক্তি দুই প্রকার। পণ্ডিতগণ পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসাদি ভেদে বিপ্রলম্ভকে বহুবিধরূপে এবং কান্তা ও কান্ত উভয়ে মিলিত হইয়া যে ভোগ করেন, তাহাকে সম্ভোগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই সম্ভোগ আবার রতির গাঢ়তা মৃদুতা অনুসারে সাধারণী, সামঞ্জসা ও সমর্থা এই ত্রিবিধ রূপে কথিত হয়। যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায়ই ভগবদ্দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং যাহা সম্ভোগেচ্ছারই নিদান, তাহাকে সাধারণী রতি বলে। গাঢ়তার অভাব হেতু এই রতির স্পষ্টরূপে সম্ভোগেচ্ছাই প্রতীয়মান হইতেছে। এই সম্ভোগেচ্ছার হ্রাস হইলে রতিও হ্রাস হইয়া থাকে, অতএব সম্ভোগেচ্ছাই এস্থানে রত্যুৎপত্তির কারণ, সুতরাং ইহার নাম সাধারণী। যাহাতে পত্নীত্বাভিমান বৃদ্ধি হয়, যাহা গুণাদি শ্রবণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কখন কখন সম্ভোগেচ্ছার তৃষ্ণা জন্মায়, সেই রতির নাম সমঞ্জসা। আর সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভোগেচ্ছা যে রতিতে তাদাত্ম্য অর্থাৎ নায়ক নায়িকাতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সমর্থা। এই সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতিভেদে কুব্জা, মহিষী ও ব্রজসুন্দরী সকলে মণির ন্যায়, চিন্তামণির ন্যায় এবং কৌস্তভমণির ন্যায় তিন প্রকার হয়, অর্থাৎ মণি যেমন অত্যন্ত সুলভ নয়, তাহার ন্যায় কুব্জাদি ব্যতিরেকে সাধারণী রতি সুলভা হয় না, তথা চিন্তামণি যদ্রূপ চতুর্দ্দিকে সুদুর্লভ, তদ্রূপ কৃষ্ণমহিষী ব্যতিরেকে সমঞ্জসারতি অন্যত্র সুলভ হয় না। অপর—কৌস্তভমণি যেমন জগদ্দুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্যত্র লভ্য হয় না, তদ্রূপ ব্রজললনা ব্যতিরেকে সমর্থারতি কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত অর্থাৎ ভগবৎ-বশীকারিত্বরূপে বিস্ময় প্রকাশক যে বিলাস লহরী, তদ্দ্বারা যাহার চমৎকারিণী শ্রী

(শোভা) সেই রতি কথনও সম্ভোগেচ্ছা হইতে বিশেষ হয় না, একারণ সমর্থারতিতে কেবল ভগবৎসুখার্থই উদ্যম।

স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা॥

উজ্জ্বলনীলমণি

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ হেতু অথবা কৃষ্ণসম্বন্ধ শব্দাদির যৎকিঞ্চিৎ অন্বয় হেতু উৎপন্না যে সমর্থারতি, তাহার গন্ধ মাত্রে সমুদায় বিস্মরণ হয়, অর্থাৎ সমর্থারতি উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লজ্জাদি সমুদায় বিস্মরণ হইয়া যায় এবং ঐ রতি সান্দ্রা হয় অর্থাৎ উহাকে ভাবান্তরে ভেদ করিতে পারে না। এই সমর্থারতি যদ্যপি বিরুদ্ধভাব দ্বারা অভেদ্যা হয় অর্থাৎ প্রতিকূলভাব যদি বিচলিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে প্রেম বলা যায়। যথাঃ—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি।

ধ্বংসের কারণ সত্ত্বে যাহার ধ্বংস হয় না, এমত্ত যুবক-যুবতীদ্বয়ের পরস্পর ভাববন্ধনকে প্রেম কহে।

এই প্রেম সঞ্চার মাত্রেই মানুষের সমুদায় প্রকৃতিকে ওলট-পালট করিয়া তোলে। এই প্রেম মানুষের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে—নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়। প্রকৃত সতীনারীর প্রেম যথার্থ আত্মত্যাগ। (স্ত্রী স্বামী-প্রেমে মগ্ন হইয়া জলন্ত চিতায় শয়ন করে,—প্রেমে আপনহারা হয়)—কেবল বাহিতের

ভাবনাতেই তাহার হৃদয় ভরিয়া যায়। আপন ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া পত্নী পতিকে পূজা করিয়া থাকে। তাহার জীবন, যৌবন, রূপ, রস, আহার, বিহার সমস্তই তখন স্বামীর জন্য। তাহার আব্দার, তাহার অভিমান, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সমস্তই স্বামীর জন্য। এমন হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, ত্বচে ত্বচে, অণু অণুতে সম্বন্ধ আর কোথায়? স্ত্রী স্বামীর ছায়ার ন্যায়—কায়া যে কাজে রত, ছায়াও তাহাই করিয়া থাকে। (স্বামী যাহাতে সুখী, স্ত্রী সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই করিয়া থাকে। একদণ্ডের বিরহ অনন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকে,—একটু মুখের অবহেলা প্রাণে প্রলয়ের আগুন সৃষ্টি করিয়া দেয়, ডাকিয়া একটু সাড়া না পাইলে নয়না-সারে দৃষ্টি রোধ করিয়া বসে, অন্যের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে দেখিলে অভিমানের অনলে দগ্ধ হইয়া যায়।) মুহূর্ত্তের বিরহে জগৎ শূন্য—অগ্নি-ময় বোধ হয়। প্রাণ কেবল উধাও হইয়া—'সে আমার কোথায়' বলিয়া প্রাণের ভিতরে প্রাণ লুটিয়া কাঁদিতে থাকে। (এই স্ত্রীর ভালবাসা —স্ত্রীর প্রেম লইয়া জীব ভগবানকে ভাল বাসিলে—এইরূপ প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিলে, জীব তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। তাই অন্যান্য ভাব হইতে মধুরভাব শ্রেষ্ঠ।)

(এই মধুরভাবে প্রেমিক আর প্রেমিকার একাত্ম সম্পাদিত হয়,) সুতরাং আপনা হইতেই সমাধির অবস্থা আসিয়া পড়ে। ক্রমে গাঢ়তর সমাধির অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়; তখন ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির রজঃ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণ অতি প্রবল ভাবে আবির্ভূত হইয়া উঠে এবং যতই সত্ত্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজঃ ও তমো ক্ষীণ হইয়া পড়ে; ক্রমে ঐ অবস্থার আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে রজ-স্তমো একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধিই হয় না। তখন সত্ত্বগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি

ও বিবেকজ্ঞান হয়, জীব আর বুদ্ধি যে পৃথক্, স্বতন্ত্র তাহারই উপলব্ধি হয়—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-ঈশ্বরের সংযোগ শ্লথ হইয়া পড়ে, এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে, বুদ্ধি-পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়, যে সত্ত্বগুণ জীবের তাদৃশ বিবেকবুদ্ধি জন্মাইয়া দিয়াছিল, সেই সত্ত্বগুণও এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না। এই প্রকারে প্রেমিকে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্য বিষয়-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে, তখন একমাত্র সেই প্রেমিক—সেই ধ্যেয় বিষয়েরই মাত্র জ্ঞান থাকিবে,—ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরূপোপলব্ধি হইবে,—সুতরাং উপাস্য, উপাসনা এবং উপাসক,—প্রেম, প্রেমিক, ও প্রেমিকা থাকিবে না। তখন জীব স্বরূপে প্রকাশমান হন,—তখন তিনি কেবল সেই অবস্থামাত্রেই অবস্থিত থাকিবেন। তাই মুক্তি "কৈবল্য" বলিয়া কথিত হয়।

কিন্তু এই ভাব মানবের প্রেমে সম্যক্ সাধিত হয় না। কেননা যাহাকে চিন্তা করা যাইবে, চিন্তাতরঙ্গের পরিচালনাদ্বারা তৎস্বরূপই লাভ হইবে। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব—কাজেই তাঁহাকে মধুরভাবে চিন্তা করিলে, শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হওয়া যায়। সখার নিকটে সখার ভাব, পিতার নিকটে পুত্রের আব্দার, বন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা—এসকলই নিকট বটে কিন্তু প্রাণের এত অসঙ্কোচ—এমন হৃদয়বিনিময় আর কোথাও নাই। তাই ভক্ত ভগবানকে মধুরভাবে সাধন করিয়া থাকেন।

এই পঞ্চবিধ ভাবানুরাগী সাধকগণের মধ্যে প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যসুখোত্তরা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং ভক্ত্যঙ্গ-সাধনাবলম্বন করিলেই তাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। আর মাত্র কেবলাভক্তিমার্গের দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া প্রেমসেবোত্তরা

গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবের মধ্যে যে ভাবের যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার যোগ্যতা আছে, সেই ভাব সেই সীমাকে প্রাপ্ত হইলেই উহা 'প্রেম' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তখন বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলেও আর উহার ধ্বংস হয় না। তখন ভক্ত পরম পুরুষ ভগবানের অনন্ত নিত্যলীলা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

রাগানুগা মার্গের ভক্তগণ সাধন ভক্তির আশ্রয়ে সাধনা করিতে করিতে কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি,—জন্মান্তরের ভক্তি সংস্কার বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বিনা সাধনেও—সাধু-শাস্ত্রমুখে ভগবানের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য এবং প্রেমিক ভক্তদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবাদিমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, তাহা পাইবার জন্য লোভ সঞ্চার হয়। এইরূপ ব্রজভাব-লুব্ধ ভক্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, গুণময়ী সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তি লাভ করা যাইতে পারে না, তাঁহার বুদ্ধি আর শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা করে না; (তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীয় ধর্ম্ম এবং শ্রুত-শ্রোতব্য সমুদয় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাভনীয় ব্রজভাবের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রেমিক-গুরুর কৃপাভিক্ষা এবং ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করেন।) সৌভাগ্য বশতঃ সিদ্ধ-প্রেমিক-গুরুর দর্শন পাইলে ভক্ত তখন সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তদীয় শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। এই অবস্থা-কেই কেবলাভক্তির প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হয়। গুরু ভক্তের ভাব-দার্ঢ্য ও ঐকান্তিকতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাদ্ভজন ক্রিয়া প্রদান করেন। সেই জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্য নিগূঢ় সাধনা প্রেমময় স্বভাবপ্রাপ্তির একান্ত উপযোগিনী। তখন ভক্ত শ্রীগুরুকেই ভগবান্ মনে করিয়া আপন আপন ভাবানুসারে তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভাবানুসারে প্রভু, পিতামাতা, ভাই বন্ধু, পুত্র অথবা স্বামী জ্ঞানে শ্রীগুরুরই সেবায় একান্ত অনুরক্ত হন। শ্রীগুরুতে এইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ ভাবসাধনায়

একটী প্রধান লক্ষণ। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রকট লীলায় ব্রজবাসীদিগের মনঃপ্রাণ অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাতে অনুরক্ত করিয়াছিলেন, প্রেমিক শিরোমণি রাগবর্ত্মোদ্দেশ গুরুও ঠিক তদনুরূপ ভাবে ভাব-লিপ্সু শিষ্যের চিত্তবৃত্তি অধিকার করিয়া লন। তাই তাঁহারা বেদ-লোক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর চরণে আসক্ত হইয়া থাকেন, নিরন্তর অন্তর্ম্মনা হইয়া তদীয় শ্রীচরণচিন্তাতেই কালাতিপাত করেন। যথাঃ--

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

—ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু।

শ্রীগুরু একাধারে ভক্ত ও ভগবান্; তাঁহার অন্তরে ভগবান্, বাহিরে ভক্তভাব। তাই ভাবাশ্রিত ভক্তগণ গুরুদেবকেই ভগবদ্বুদ্ধিতে চিন্তা করেন। এইরূপে গুরু-চিন্তা হইতে ভক্তের মনোময় সিদ্ধদেহের ক্রমশঃ পরিপুষ্টি হইতে থাকে। যেরূপ তৈল-পায়ী কীট ভ্রমরবিশেষের নিরন্তর পরিচিন্তনে পূর্ব্বরূপ পরিহার করিয়া তৎস্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভাবাশ্রিত ভক্তও নিয়ত শ্রীগুরুর স্বরূপ চিন্তা করিয়া প্রেমসেবোপযোগী মনোময় দেহ লাভ করেন।

ভাবাশ্রিত ভক্তিতে প্রায়ই মহিমজ্ঞান থাকে না, ইহাতে প্রীতি মমতার আধিক্য থাকে। যেরূপ ব্রজবাসিগণ আমাদের জ্ঞানে অসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন, সেইরূপ ভাবাশ্রিত ভক্তগণও প্রিয়বন্ধু জ্ঞানে অকুণ্ঠিতচিত্তে শ্রীগুরুর পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন। প্রেমানুরোধে তাঁহারা গুরু দেবতার সহিত পান-ভোজন বা শয়ন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ভাবাশ্রিত ভক্তগণের ভগবৎ-সেবা দুই ভাবে সম্পাদিত হয়; এক বাহ্য অপর মানস। তাঁহারা যথাবস্থিত বহিঃশরীরে সাধকরূপ ব্রজ লোক—

শ্রীরূপসনাতনাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়গণসাহায্যে শ্রীগুরুর সাক্ষাৎসেবা করিয়া থাকেন এবং অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট (মনোময়) দেহে অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ-দ্বারা সিদ্ধরূপ ব্রজলোক—শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন। এইরূপ সাধন-ক্রম হইতে ভক্ত-চিত্তে রতির উদয় হয়। যখন রতি গাঢ় হইয়া প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়, তখন ভক্ত স্বকীয় ভাবময় নিত্য দেহে নিত্য ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাবাশ্রিত ভক্তগণ জ্ঞান কর্ম্মাদি ভক্তিবাধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তথাপি ঐ সমুদায় জ্ঞান-কর্ম্মাদির ফল তাঁহাদিগের নিকট আপনা হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তিদেবীর দাসী-স্থানীয়া সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহাদিগের সেবা করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু ব্রজভাবলুব্ধ ভক্ত তৎসমুদায়ের প্রতি আদর প্রকাশ করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের মাধুর্য্য-সাগরে নিমগ্ন থাকেন। এই মাধুর্য্যাস্বাদ-সুখের গন্ধও যাবতীয় মুক্তি সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ। এই হেতু তাঁহাদিগের হৃদয় মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট হয় না। তাঁহারা নিরন্তর ভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে সন্তরণ করিয়া থাকেন।

যিনি ঐকান্তিকভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরম-প্রেমবলে অনুক্ষণ তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবাশ্রিত কেবলাভক্তির সিদ্ধভক্ত বলিয়া পরিগণিত।

গোপীভাব ও প্রেমের সাধনা

প্রেমসেবার পূর্ণতম আনন্দাস্বাদহেতু কেবলাভক্তিমার্গের দাস্যাদি চতুর্বিধ ভাবের মধ্যে আবার মধুরভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন না, মধুর ভাবে ঐ

ভাবচতুষ্টয়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই কোন প্রেমিকা রমণী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ;—

প্রেমময়! পতিরূপে দেহ দরশন ;
পূরিবে সকল আশা মিটিবে মনন।
মাতারূপে সদা তব আহার যোগাব,
পিতা ভাবে গুরু হ'য়ে উপদেশ দিব।
কন্যারূপে আব্দার কত যে করিব,
মার বুকে শিশু যথা সে ভাবে থাকিব।
সখীরূপে অকপটে সব কথা কব,
দাসী হ'য়ে চিরদিন চরণ সেবিব।
পত্নীরূপে প্রেমময় বাঁধি আলিঙ্গনে,
অনন্তজীবন রব মিলি তোমা সনে।
একাধারে সব রস মধুর ভাবেতে,
তাই চাই এই ভাবে তোমারে পূজিতে।

পাঠক! মধুরভাব শ্রেষ্ঠ কেন, বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। (মধুরভাবে সব রসের সমাবেশবশতঃ প্রেমসেবার পূর্ণতম আনন্দাস্বাদ পাওয়া যায়।) হনুমানাদি যেরূপ দাস্যভাবের, শ্রীদামাদি যেরূপ সখ্যভাবের নন্দ যশোদাদি যেরূপ বাৎসল্যভাবের আদর্শ; (তদ্রূপ ব্রজগোপী ও মহিষীগণ মধুরভাবের আদর্শ।) এই কামানুগা মধুরভাব দুই অংশে বিভক্ত; এক সম্ভোগেচ্ছাময়ী, অপর তদ্ভাবেচ্ছাময়ী। যাঁহারা রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদিগের ভাবানুগত, তাঁহাদিগের ভক্তিকে সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহিষীদিগের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে স্বসুখ-বাঞ্ছা, মহিম-জ্ঞান এবং লোক-ধর্ম্মাপেক্ষা প্রভৃতি ভাব বিদ্যমান আছে। অপর, (যাঁহারা লোক-বেদাদি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঐহিক-

পারত্রিক সকল সুখ-সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া নিষ্কাম ভাব ও পরমপ্রেমময় স্বভাবের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই ভক্তিকে তত্ত্বাবেচ্ছাময়ী কহে; ইহা ব্রজবাসী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। অতএব মহিষীদিগের ভাব হইতে সাধারণী কিম্বা সমঞ্জসা রতি উৎপন্ন হয় এবং গোপীদিগের ভাব হইতে সমর্থা রতি উদয় হয়, কেন না,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম বলে। আর ঈশ্বরেন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যাহা করা যায়, তাহাকে প্রেম বলে। সমস্ত কার্য্য নিজ সম্ভোগস্বরূপে প্রয়োগ না করিয়া কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যে প্রয়োগ করিলে, তাহা হইতে সমর্থারতির উদয় হইয়া থাকে; পরে তাহাই গাঢ় হইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহিষীদিগের কথঞ্চিৎ স্বসুখ-বাঞ্ছা থাকায় তাহা আর সমর্থারতিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু উচ্চ নীচতা আছে. লোক-ধর্ম্মাপেক্ষা আছে এবং তাহা স্বাভাবিকী বিধায় তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু গোপীদিগের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা স্বামী-পুত্র. ঘর-বাড়ী. জাতি-কুল, বেদবিধি. ধর্ম্ম-কর্ম্ম, লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া কুলটার ন্যায় ভগবানে আসক্ত হইয়া থাকেন। কুলটা রমণী যথাযথভাবে গৃহকর্ম্মাদি করে, কিন্তু তাহার মনটা সর্ব্বদা উপপতির চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। প্রেম-ভক্তি-প্রচারক চৈতন্যদেব বলিয়াছেন;—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ন বসঙ্গরসায়নং॥"

পরাসক্তা রমণী গৃহকার্য্যে থাকিলেও চিত্তমধ্যে যেমন নব-সহবাস-রসের আস্বাদন করে,—সেইরূপ বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া নব-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের আস্বাদন মনে মনে অনুভব করিও। তাই ভক্তিমার্গে ঐরূপ অবিধিপূর্ব্বক—শাস্ত্রাচার, সমাজনিয়ম প্রভৃতি বিচ্ছিন্নকারী পরকীয়াভাব গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং স্বকীয়া মহিষীদিগের সম্ভোগেচ্ছাময়ী মধুরভাব হইতে, পরকীয়া গোপীদিগের তদ্ভাবেচ্ছাময়ী মধুর-ভাবের গোপিকানিষ্ঠ ভাব, সোজা কথায় (গোপীভাব শ্রেষ্ঠ।) রাধিকাদি গোপীগণ গোপীভাবের আদর্শ। গোদাবরীতটে রায় রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বলিয়াছিলেন ;—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
অনন্ত শাস্ত্রেতে যাঁর মহিমা বাখানি॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(ইহার মধ্যে অর্থাৎ মধুরভাবের মধ্যে রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি ; তাই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা স্বামী, পুত্র, কুল, মান, কিছুই চাহে না—চাহেন কেবল শ্রীকৃষ্ণকে।) কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখ বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥

গোপিকা দর্শনের কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি কোন সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এই এক দেখি সামাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গোপিগণের কৃষ্ণদরশনের সুখের বাঞ্ছা নাই, কিন্তু কোটিগুণ সুখের উদয় হয়। বড়ই ভয়ানক কথা! ইহার ভাব অনুভব করা পাণ্ডিত্য বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই অনেকে গোপীভাবের নাম শুনিয়া হাস্য-বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। গোপীগণকে দেখিয়া কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহা হইতে গোপীদিগের কোটিগুণ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। কেন?—গোপীদিগের সুখ যে কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসিত। কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া গোপিগণের সুখ; অর্থাৎ তাঁহাদিগের স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদির সুখ নাই, কৃষ্ণের সুখেই সুখ। কৃষ্ণময় সর্ব্বভূতের সুখে সুখী হইতে হইবে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইলে হইবে না, আমার কার্য্যে বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও সুখ। অহো কি মধুর ভাব! এই জন্যই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

গোপীগণের নিজের বলিয়া কিছুই নাই; রূপ বল, যৌবন বল, শোভা সৌন্দর্য্য, লালসা-বাসনা যাহা কিছু বল,—সমস্তই সেই শ্যামসুন্দরের জন্য। তাঁহারা কাজ করেন, সন্তান পালন করেন, গৃহের কর্ম্ম করেন, কিন্তু নিরন্তর প্রাণ সেই ভগবানের প্রেমরসে মজিয়া থাকে। তাঁহারই কথা।

তাঁহারই কার্য্যের আলোচনা, তাহারই নাম গানে পরিতুষ্ট—এইরূপভাবে যে ভক্ত সাধনা করেন, তিনিই পরম মুক্ত।) (আপনাকে স্ত্রীরূপে—আর পরম পুরুষ ভগবান্‌কে পুরুষভাবে ভাবনা করিবে,—তাঁহাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া, তাঁহারই প্রেমে লীন থাকিবে। ইহাতেই নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়।

এই গোপীভাবনিষ্ঠ মধুররসাত্মক ভক্তি হইতে মধুরা রতির উদয় হয়। এই রতি হইলে ভগবানের সহিত ভক্তের বিলাসের সূত্রপাত হয়। যথা:—

মিথো হরের্ম্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্‌।
মধুরাঽপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ॥

—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

(মধুরা রতিই শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সীদিগের সম্ভোগের আদি কারণ।) এই মধুরা রতি যখন গোপীদিগের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বসুখ বাসনা শূন্য হয়, এবং সম্ভোগ-বাসনা যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বাঞ্ছার সহিত একতাভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা সমর্থা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে। এই সমর্থারতি প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া স্নেহ মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অনন্তর ভাব আরও উৎকৃষ্টদশা প্রাপ্ত হইলে মহাভাব নামে কথিত হয়। ইহাই গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থারতির চরম বিকাশ। সুতরাং গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থারতি প্রৌঢ় মহাভাবদশা প্রাপ্ত হইলেই উহা প্রেম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

(কাম-গন্ধ-শূন্য যে অনুরক্তি, তাহার নাম প্রেম। এই ভাব যেখানে আছে, সেই স্থানেই প্রেম বলা যাইতে পারে। যাহা আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি-ইচ্ছা, তাহাই কাম। অতএব আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি-ইচ্ছা-পরিশূন্য হইয়া

যাহাতে অনুরক্তি হয়, তাহাতেই প্রেম হয়।) আমি তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার যে কাজ তাহাই আমার ভাল। তিনি রূপ ভালবাসেন —আমরা রূপের উৎকর্ষ না করিব কেন? তিনি ফুলমালা ভালবাসেন,—তাই বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আমার এত বনফুল তোলা,—তাই এ মালা গাঁথা।

মালা হ'ল জ্বালা না আসিল কালা
হৃদয়ে বিঁধিল শেল,
যাও সখি যাও মালা ফেলে দাও
বুঝেছি করম ফের।

মালায় ত আমার কোন প্রয়োজন নাই, যাঁহার জন্য মালা গাঁথা, সে কই? সে যদি না আসিবে, তাঁহার গলায় যদি এ মালা না দুলিবে, মালার সুবাসে সে যদি পুলকিত না হইবে, তবে এ মালা গাঁথা কেন? সে আনন্দিত হইলে, তবে ত আমার আনন্দ। নতুবা জগতে আমার আর কি আনন্দ আছে? সে সুখী হইলে, তবে আমার সুখ। ইহাই প্রেম। দেশের উপকার করিয়া, দশের উপকার করিয়া, সমাজের উপকার করিয়া, ধনীর উপকার করিয়া, দরিদ্রের উপকার করিয়া, সুন্দরের উপকার করিয়া, কুৎসিতের উপকার করিয়া,—তাহাদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের প্রতিঘাতই আমার আনন্দ। ইহাই ব্যষ্টিভাবের আনন্দ,—আর সমষ্টিভাবের আনন্দ—ঈশ্বরানন্দ। ভগবানকে সেবা করিয়া; ভগবানকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইয়া, ভগবানকে বুকে লইয়া, যে আনন্দের পূর্ণতম ভাব, তাহাই প্রেম।

ভগবানে এইরূপ প্রেম জন্মিলে,—তখন ফুল ফুটিলে, মলয় বহিলে, সুবাস ছুটিলে, কোকিল ডাকিলে, ভ্রমর গুঞ্জরিলে, সেই সুখ মনে পড়ে। আবার মেঘের গর্জ্জনে, বিদ্যুতের চমকে, অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে,

হতাশের দীর্ঘশ্বাসে, দরিদ্রের আকুল ক্রন্দনে, তাঁহাকে মনে পড়ে বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়,—ইহারাও তাঁহার বিভূতি। ইহাদের সেবাতেও তাঁহারই সেবা। (প্রেম জন্মিলে, তখন মানুষের সমুদায় বৃত্তি তাঁহারই আশ্রিত হইয়া পড়ে। ভক্ত তখন তদ্গতচিত্তে বলেন আমি জ্ঞান চাহি না, শক্তি চাহি না, মুক্তি চাহি না, সালোক্যাদি কিছুই চাহি না,—চাহি কেবল তোমাকে। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,—তুমি আমার বিশ্বের প্রাণ,—তুমি এস, আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে উদিত হও। একবার আমাকে 'আমার' বলিয়া সম্বোধন কর।

মনের ঠিক এইরূপ অবস্থার নাম প্রেম।) (কিন্তু আপনাকে ক্ষুদ্র, হীন ও সান্ত ঈশ্বরকে বিরাট্, বিপুল ও অনন্ত এরূপ ভাবিলে তিনি দূরে থাকেন,—কাজেই তাঁহার সহিত প্রেম হয় না।) তাঁহার উপর ভক্তের একাত্মভাব—মান-অভিমান, সোহাগ-আদরের ছায়া প্রভৃতি ওতঃপ্রোত ভাব না থাকিলে প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না। যশোদার শাসন, নন্দের বাধাবহন, গোপবালকের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও স্কন্ধে বহন এবং গোপবালাদের পদধারণপূর্ব্বক মানভঞ্জন প্রভৃতি সমস্তই ব্রজভাবলুব্ধ ভক্তের পরম আদর্শ। মহিমজ্ঞানে প্রেম সঙ্কুচিত হয়। (ভাবানুযায়ী ভগবানকে আত্মসম কিম্বা আপনা হইতে ছোট ভাবিতে না পারিলে প্রেম হইবে না। তাই গোপীভাবের আদর্শ হইয়া প্রেমের সাধনা করিতে হইবে। প্রেমের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। প্রেমের বশে ভগবান্ আকৃষ্ট হয়েন;—সে আকর্ষণে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। শান্ত, দাস্ত, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের সাধনায় ভগবান্ তাহার প্রতিশোধ দিতে পারেন, কিন্তু গোপীপ্রেমের প্রতিশোধ দিতে পারেন না।) তোমায় ভালবাসি,—তোমা বই আর জানিনা, ইহাতে কি কোন প্রার্থনা আছে? প্রার্থনা নাই তবে পূরণ করিবেন কি? প্রতিশোধ দিবেন কি? চাই তোমাকে,—দিতে

হইলে সেই নিজকে দিতে হয়। তাই ভগবান্ গোপীপ্রেমের নিকট ঋণী।

কিন্তু ভগবানের সহিত প্রেম করা বড় কঠিন সমস্যা; সব ভুলিতে হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল-মন্দ, জাতি-কুল, সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভুলিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পিত হইতে হইবে। কিন্তু ভাল মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া, ত্যাগ করিলে চলিবে না। ভাল মন্দ জ্ঞান থাকিলে প্রেম হইল না,—কিম্বা যথার্থ প্রেম হইলে সে জ্ঞান থাকিতেই পারে না। শাস্ত্রে যাহা বলে, লোকে যাহা বলে, সমাজ যাহা বলে,—তাহা শুনিলে প্রেমলাভ হয় না। ভগবান্ যাহাতে সুখী হন, তাহাই করিতে হইবে। বিধি-নিষেধ মানিলে কি প্রেম করা চলে? প্রেমভক্তি তদনুরক্তির বিকাশ, আপন ভুলিয়া,—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতি, কুল মান ভুলিয়া বাঞ্ছিতের অনুসরণ করাই প্রেমভক্তি। এই ভাব গোপীদিগের ছিল,—সেই জন্য ভগবদারাধনায় গোপীভাবই শ্রেষ্ঠ।

প্রেমস্বভাবলুব্ধ সাধক গোপীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানকে প্রেমাস্পদ করিয়া হৃদয়-নিকুঞ্জে প্রেমের ফুলশয্যায় শয়ান করাইয়া প্রেমের গানে প্রবৃদ্ধ হউন। আর বাহিরে শ্রীগুরুকে ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া দেহ মন সমর্পণ করিয়া পরিচর্য্যা করুন। নতুবা পাথরের বা পিতলের মূর্ত্তি গড়াইয়া তুলসী-চন্দনে প্রেমাস্পদের পূজা করুন, ক্রমশঃ প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্তভাব, অনন্তমূর্ত্তি, অনন্তবীর্য্য ভাবনা বা ধারণায় আনিতে পারিবেন। জগৎ যাঁহাকে দিবানিশি পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া পূজা করিতেছে,—প্রকৃতিরূপা রাধা যাঁহার প্রেমকামনায় সর্ব্বত্যাগিনী—উদাসিনী, যোগিনী, সেই নিত্যসহচর নিত্যসখা নিত্য প্রেমাস্পদের সন্ধান মিলিবে। তখন "যাহা যাহা নেত্রে পড়ে তাহা হরি স্ফুরে" সর্ব্বস্থানেই সর্ব্ববস্তুতে প্রেমা-

* এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই ভগবানের 'গৌরাঙ্গ অবতার' বলিয়া ভক্তসমাজে কীর্ত্তিত হন।

স্পদের প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। তখন আত্মদর্শী যোগীর ন্যায় প্রেমিকও প্রতি ফলে, প্রতি ফুলে, প্রতি পত্রের মর্ম্মর শব্দে, প্রতি পাহাড়ে, প্রতি ঝরণায়, প্রতি নদ-নদীতে, প্রতি নরনারীতে, প্রতি অণুপরমাণুতে সেই সচ্চিদানন্দের বিকাশ দেখেন, সেই শ্যামসুন্দর চিদ্‌ঘনরূপ আর ভুলিতে পারেন না,—জগৎ লইয়া, রাধাকে লইয়া রাধাবল্লভের উপাসনা করেন। তিনি প্রেমময়,—প্রেমের আকর্ষণে তিনি ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব, ভাবাবলম্বনে যতপ্রকার সাধনোপায় আছে, তন্মধ্যে প্রেমসাধ্য গোপীভাবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাই মানবের সাধারণ সম্পত্তি,—ইহাই মানবজীবনের সার বস্তু। এই আকর্ষণ ভগবানে বিন্যস্ত হইলেই মানুষ জ্বালা হইতে অব্যাহতি পায়। তখন আমি কে, তিনি কে,—সে জ্ঞান জন্মে। জগৎ কি, পুত্রকলত্র কি, সোণার বাঁধন কি, সে ভ্রম দূর হয়। হৃদয় দৃঢ়াভক্তি ও অহেতুক প্রেম সম্পন্ন হয়। তখন দিব্য জ্ঞান জন্মে,—বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, পুত্র, ধনৈশ্বর্য্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে, ঘটপট আমি আমার কিছু নহে,—সবাই তিনি; সেই আদি-অন্তহীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর সত্য। সত্যস্বরূপের সত্যজ্ঞানে অসত্য দূরে যায়, —অচঞ্চল আলোকাধার-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সেই নিত্য ও লীলাময় প্রেমাস্পদ পরম পুরুষের অসমোর্দ্ধ প্রেমমাধুর্য্যে প্রেমিক অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া যান —প্রেমিক-প্রেমিকা বা ভগবান্‌-ভক্ত রাধাশ্যামের মহারাসের মহানন্দে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যান।

রাধাকৃষ্ণ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব

(গোপীভাবে যে ঈশ্বরানুসরণ, তাহার নাম রাগমার্গ।) সন্ধ্যা-আহ্নিক, রোজা-নেমাজ, প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতি বিহিতাবিহিত কর্ম্ম, জাতিকুল-লোকধর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, আচার-নিয়ম, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি সমস্ত বৈধিমার্গের অনুষ্ঠান কীর্ত্তিনাশার জলে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল প্রাণের অনুরাগে আনন্দের রসে মত্ত হইয়া, আকুল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়, তাহাকেই রাগমার্গ বলে। (এই রাগ-মার্গের সাধনা প্রবর্ত্তনার্থ ব্রজলীলা। ব্রজ গোপীগণ এই রাগমার্গের সাধিকা। (এই রাগমার্গের সাধনা প্রচার করিতেই দ্বাপরের অবতার।) যখন যে ধর্ম্মের সংস্থাপন প্রয়োজন, তখনই তাহার পূর্ণ আদর্শের প্রয়োজন, —আদর্শ ভিন্ন মানব শিক্ষালাভ করিতে পারেনা, তাই ভগবান্ যোগমায়া-বলম্বনে শরীরী হইয়া—ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণরূপে ব্রজধামে লীলা করিয়াছিলেন। সেই ব্রজলীলার প্রধান সাহায্যকারিণী—রাধা।

আমরা ভক্তিতত্ত্বে দেখাইয়াছি যে,(ভগবানের যে শক্তি জীবকে সর্ব্বদা অনন্ত উন্নতির পথে—পূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই কৃষ্ণ। আর যদ্দারা আমরা তাঁহার দিকে—অনন্ত আনন্দের দিকে আকৃষ্ট হই, তাহাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে আবৃত থাকে, তখন তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু আবরণ উন্মুক্ত হইলেই মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেম সচ্চিদানন্দ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ মাত্র। ভগবানের তিনটী শক্তি। যথা :—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে ॥

—বিষ্ণুপুরাণ।

"হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ" এই তিন শক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে হ্লাদিনী প্রেমস্বরূপা; ইনিই রাধা নামে কীর্ত্তিতা। যথা :—

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা ॥

—সাধনতত্ত্বসার।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হরা; কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী রাধাই এই নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। (রাধ্ ধাতু হইতে রাধা-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (রাধ্ ধাতুর অর্থ সাধনা, পূজা বা তুষ্টকরা, যিনি সাধনা করেন, পূজা করেন বা তোষণ করেন,—তিনিই রাধা। আর এই শক্তিকে যিনি আকর্ষণ করেন,—তাঁহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা; যিনি সাধনাকারিণী শক্তির সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলে। অতএব রাধা ও কৃষ্ণ একই আত্মা। তাঁহারা অগ্নি ও দাহিকা-শক্তির ন্যায় ভেদাভেদরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া সমগ্র প্রাপঞ্চিক জীব সমূহের অন্তর্বাহ্যে বিরাজ করিতেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন ;—

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বা ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনা ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮২।৪৫

"যেরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত, সমুদয় ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কার্য্য হইয়া, তাহাদিগের অন্তর্ব্বহিঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্রূপ আমিই একমাত্র সর্ব্বপ্রাণীর কারণ ও কার্য্য বলিয়া, সকলেরই অন্তর্ব্বাহ্যে বিরাজ করিতেছি; সুতরাং আমার সহিত তোমাদিগের বিচ্ছেদ কদাপি সম্ভবপর নহে।"

রাধা আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে ও তৎসাধনা শিক্ষা দিতে ব্রজধামে উভয়দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজলীলা বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রজলীলার আধ্যাত্মিকভাব হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে প্রাকৃতলীলা সহজেই বোধগম্য হইবে।

জীবের সহিত ভগবানের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কেবল প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজন্য যোগের সেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হিন্দুঋষি ব্রজলীলায় রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে পরিব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর বকাসুররূপী হিংসা-কুটিলতা নাশ করিতে না পারিলে ব্রজভাব প্রাপ্তি হয় না। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন আনন্দধাম বৃন্দাবনে। যতদিন না জীবের সাংসারবীজ সমুদায় নষ্ট হয়, ততদিন তাহার মুক্তি নাই। সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের ঘনিষ্টতাই জগৎ সংসার। জগতেই প্রকৃতি-পুরুষ ঘোর আসক্ত; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত-বৎসর বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শতবৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তি লাভ। শত বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষপদ। যোগের এই সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্ব এক একটী করিয়া, হিন্দু অবয়বকল্পনায় মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। যোগে জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সহিত যতভাবে রমণ করেন, তাহার অনুভব ও মিলনের যতপ্রকার স্তর আছে,

তৎসমুদায় কৃষ্ণলীলায় প্রকটিত। প্রজাপালনরূপ গোচারণে (গো অর্থে প্রজা) কৃষ্ণ সংসারধামরূপ গোষ্ঠে ক্রীড়া করেন। আনন্দধাম নন্দালয়ে পিতাপুত্রের সম্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছিলেন। পিতামাতার বাৎসল্য ভক্তি অপেক্ষাও প্রগাঢ়তর। হিন্দুর ঈশ্বরানুরাগ, বাৎসল্য অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক। (যশোদা ও নন্দের বাৎসল্য একদা হিন্দুর দেবানুরাগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। হিন্দুরা দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার ও ভক্তিপুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া অর্চ্চনা করেন। যশোদা ও নন্দের ন্যায় স্নেহের শতরজ্জুতে কৃষ্ণকে বাঁধিতে চাহেন। কিন্তু সে স্নেহ অপেক্ষাও বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, তাহা রাধার কৃষ্ণানুরাগ। হিন্দুর দেবানুরাগ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া বাৎসল্যভাব অপেক্ষাও প্রগাঢ়তর হইয়াছে; প্রগাঢ়তর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত হইয়াছে।) পতি-পত্নীর সম্বন্ধে একটু যেন দূরভাব আছে। পত্নী, পতিকে খুব নিকটে দেখেন বটে, অথচ একটু উচ্চ উচ্চভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া অপর পুরুষের অনুরাগিণী হন, তাঁহার প্রেমে সে প্রভুতার দূরভাব নাই। রাধার প্রেম সেইরূপ প্রেম। (সংসারই আয়ান এবং ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিগণ জটিলা-কুটিলা। তাই তাহাদের লুকাইয়া গোপনীয় প্রেমে রাধা, কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন; তাহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্য লালায়িত হইতেন।) মিলন হইলে আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। ক্ষণেক-মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক। (রাধিকা-এইরূপ অনুরাগে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন।) এ যোগ, পতি-পত্নীর যোগ অপেক্ষাও গাঢ়তর। এ প্রেম স্ত্রী পুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ট অনুরাগ। এ অনুরাগ হিন্দুযোগীর ঈশ্বরানুরাগ। (সেই অনুরাগের ক্রমস্ফূর্ত্তি যোগতত্ত্বে অনুভবনীয়। সেই ক্রমস্ফূর্ত্তির বাহ্যবিকাশই ব্রজলীলা।)

দ্বাপরযুগের শেষ সন্ধ্যায়—যখন জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানের কর্কশ সাধনায় স্খলিত-কণ্ঠে ভগবানের কৃপাবারির আশায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়াছিল, বাসনা-বিদগ্ধ হইয়া আনন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, ভগবান্ সেই সময় মনুষ্যের ঊর্দ্ধগতি দানজন্য—পরমানন্দ দানজন্য—পিপাসিতকণ্ঠে মধুর প্রেম-রসের পূর্ণধারা ঢালিয়া দিবার জন্য হ্লাদিনীশক্তির সহিত রাধাকৃষ্ণরূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের প্রধান ভাব প্রেম,—সেই প্রেম-দান করিতে, প্রেমশিক্ষা প্রদান করিতে, প্রেমে জগৎকে জাগাইতে ভগবান্ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত বৃন্দাবনে মাধুর্য্যের রাসলীলা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্যই অপূর্ণ মানবকে প্রেমের আস্বাদন করাইয়া,—ভগবানের ক্ষরিত প্রেমসুধা পান করাইয়া নিবৃত্তির পথে লইয়া যাওয়া। আদর্শ ব্যতীত মানব একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; অপূর্ণ জীব কি কখন পূর্ণানন্দ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? গুণাবৃত গুণময় জীব কি কখন নির্গুণ প্রেমের আদর্শ হইতে পারে? অপূর্ণজগতে পূর্ণ আর কে আছে? তাই ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যথা:—

(অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।)

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্কঃ

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিকাশার্থ মানুষদেহ আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ—মানবগণ তাহা করিতে পারে। সেই ক্রীড়াই ব্রজলীলা। সেই প্রেমলীলার রাধাই প্রাণ। যেহেতু রাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত এবং তিনি কৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনী শক্তি—রসক্রীড়ার সহায়। তিনি স্নেহাদি অষ্টবৃত্তিকে সখীরূপে সঙ্গে করিয়া ব্রজধামে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং গোপীভাব সাধনায় রাধাই প্রধান আদর্শ।

বৃন্দাবন প্রাকৃতজগতে অপ্রাকৃত ভূমি। সেখানে সখ্যাদি প্রেমসাধ্য ভাবগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। ব্রজলীলায় কিরূপ ভাবে এই ভাবগুলির স্ফুরণ হইয়াছিল, হিন্দুমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সুতরাং সকল ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। আমরা রসিক শিরোমণি চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে রাধার প্রেমবিলাস সংক্ষেপে চিত্রিত করিতেছি। বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় ভাব বশতঃ সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি প্রেমবিলাসই বিবর্ত্তবাদ। এই বিবর্ত্তবিলাসে প্রেমিকার অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা এই আট প্রকার অবস্থা হয়। রাধা-প্রেমে এই সকল প্রকার অবস্থারই পূর্ণরূপ বিকাশ হইয়াছিল।

শ্রীমতী রাধা যখন কুলবধূরূপে আয়ানগৃহে বাস করিতেছিলেন,—ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন-ভজনের বিন্দুমাত্র ধার ধারেন না, এমন কি শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত দেখেন নাই,—এমন সময়ে সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধার হৃদয় উথলিয়া উঠিল, তিনি মৃণালভুজে সখীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিলেন,—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

কখনও কৃষ্ণের নাম শুনেন নাই, কখনও কৃষ্ণের রূপ দেখেন নাই, কেবল সখীর মুখে কৃষ্ণের নাম শুনিয়া এইরূপ ভাবোদ্রেক হইয়াছিল।

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

নাম শুনিয়া অঙ্গস্পর্শসুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাই রাগানুগাভক্তির প্রধান লক্ষণ। তৎপরে সখিগণের সঙ্গে যমুনার জল

আনিতে—বনে ফুল তুলিতে যাইয়া, নানা ছলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই হইতে অঙ্গের পরশলালসা দিন দিন পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণও রাধিকাকে দেখিয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্ত পাগল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কটাক্ষহাস্তাদি হাবভাবদ্বারা পরস্পর উভয়ে অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দূতী প্রেরিত হইতে লাগিল; শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা ছলে পরস্পর অঙ্গ-পরশ-সুখভোগ করিলেন। ক্রমশঃ উভয়ে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, আর মিলন না হইলে চলে না। সুতরাং সঙ্কেত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; শ্রীকৃষ্ণ বাঁশরী দ্বারা সঙ্কেত করিলেই রাধা যাইয়া হাজির হইতেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বসন চুরি করিয়া প্রেমানুরাগের পরীক্ষা করিলেন; সেই দিন গভীর রাত্রে—যখন পৃথিবী চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত, মানবগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময় প্রিয়সখীগণের সঙ্গে রাধা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাস-ক্রীড়ায় লিপ্ত হইলেন। সেদিন একার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তির জন্ত শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকে জাতি, কুল, ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া কত বুঝাইলেন; কিন্তু রাধা আপন সংকল্প হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইলেন না। সুতরাং উভয়ের মিলন হইল। সেই দিন হইতে রাধিকা প্রত্যহ রাত্রে কুঞ্জে নায়িকাবেশে আসিয়া শয্যাদি ও বন-ফুল মালা প্রস্তুত করতঃ শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। কিরূপ ভাবে থাকিতেন;—

দু'কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণে
বঁধু পথ-পানে চাই;
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
(বঁধু এল না ব'লে।)
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির

সখীরে কহিছে, ধনী;
বাহির হইয়া দেখলো সজনী
বঁধুর শবদ শুনি।
পুন কহে রাই না আসল বঁধু
মরমে রহিল ব্যথা,
তাম্বুলের রাগ মুছি কর দূর
নয়ন কাজল রেখা।

সারাটি রজনী কৃষ্ণের জন্য রাধা জাগিয়া ছিলেন,—ছিলেন কিন্তু নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া সমস্ত বৃত্তি প্রণয়ভাজনে সমাশ্রিত, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। প্রেমের বানে জ্ঞানের বালুকা এইরূপে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া থাকে। সমস্ত বৃত্তিগুলিকে একমুখী করিয়া প্রেমিকা বঁধুর আসিবার পথপানে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—রাত্রি প্রভাত হইল। তবে ত আর আসিবে না, বুঝি তাহার আসা হইল না। কিন্তু মন বুঝে কৈ? প্রতি পত্রবিকম্পনে তাঁহার পদশব্দ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে—তাই সখীকে অনুরোধ করিতেছেন—সখি! বাহির হইয়া দেখ, বোধ হয় বঁধু আসিতেছে। ঐ বোধ হয়, বঁধুর পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে। কিন্তু মুহূর্ত্তে আশা নিরাশায় পরিণত হইল। হতাশের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—না না, সে আসিল না। আসিবার তার অবসর হয় নাই, আসিতে তার মন সরে নাই। কিন্তু তাহার সুখের জন্য—তাহার উপভোগের জন্যইত আমার সাজা গোজা; যদি সেই না আসিল, তবে এ সকল কেন? অতএব এ সকল ধুইয়া মুছিয়া দূর করিয়া দেও।

অচিরে রাধার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। স্বামী, শাশুড়ী, ননন্দা প্রভৃতি রাধাকে নানারূপে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।

রাধার "কলঙ্কিনী" নাম পড়িয়া গেল। পাড়ার পরিহাসরসিকা রমণীগণ নানারূপ শ্লেষবাক্যে মর্ম্মপীড়িত করিতে লাগিল। রাধা শ্যামপ্রেমে বিভোর হইয়া সমস্তই অক্লেশে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্যামের নিন্দা শুনিলে অধীরা হইয়া পরিতেন। কেহ শ্যামের কাল রং, বাঁকা শরীর বা শঠ-কপটতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমের অযোগ্যতা প্রমাণিত করিলে, রাধা তাহাদিগকে তাঁহার চক্ষুদ্বারা শ্যামরূপ দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিন্দা, কলঙ্ক এ সকল কিছুতেই রাধার অনুরাগ হ্রাস হইল না,—বিনাশের কারণ থাকিয়াও প্রেম বিনষ্ট হইল না; বরং দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাধার জগন্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তিনি মেঘ দেখিলে, তমাল গাছ দেখিলে কৃষ্ণকে মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইত, তাই গুরুজনের ভয়ে ভিজা কাঠ চুলায় দিয়া ধূমের ছলে ক্রন্দন করিতেন। পরে লজ্জা, ভয়াদিও দূরীভূত হইল। এই সময় রাধিকার আর কোন চিন্তা, অন্য কিছুতে সুখ, বা অন্য কোন বস্তুর আকর্ষণ রহিল না।

রাধার কি হলো অন্তর ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসয়ে চুলি।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।

রাধা ক্রমশঃ যোগিনী—উদাসিনী হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণকে মনে পড়িলেই তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন।

কালিয় বরণ হিরণ পিধন
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে ॥

রাধা শুধু যোগিনী নহেন, তিনি উন্মাদিনী—পাগলিনী হইলেন।

তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইনু
কি করিবে দোসর পরে ॥

রাধিকা প্রেমে ক্রন্দনময়ী,—তাঁহার পূর্ব্বরাগে সুখ নাই, প্রেমে সুখ নাই, মিলনে সুখ নাই। মিলনেও তিনি আশঙ্কাময়ী—যাতনাময়ী—

দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

মিলনেও রাধার দেহবোধ নাই—প্রিয়-সম্ভোগ রসাস্বাদ নাই—

এ কাল মন্দিরে আছিলা সুন্দরী
কোরহি শ্যামের চন্দ।

তবহু তাঁহার পরশ না ভেল
এ বড়ি মরম ধন্দ ॥

রাধার প্রেমে কেবলই আকুলতা—কেবলই মর্ম্মজ্বালা—

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ধূলাতে লোটায়।

আগ্নেয়গিরি যেমন দ্রবময়ী জ্বালা প্রসব করে—শ্রীরাধিকার হৃদয়ও তেমনি পূর্ব্বরাগে, মিলনে, সম্ভোগে, রসোদ্গারে সর্ব্বকালেই এক অনির্ব্বচনীয় অবিচ্ছিন্ন দর্পবিনাশিনী সর্ব্বগ্রাসিনী জ্বালা উদ্গীরণ করিয়াছে। তাঁহার সুখে যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় সুখ, প্রেমে যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় প্রেম; প্রেমের ধারাই এইরূপ—

সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

রাধিকার দুঃখের পীরিতি; তাই যেন তাঁহার অবিরত—

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি।

জ্বালামুখী সঙ্কুল হিমালয় হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল প্রবাহিত হইয়া জগজ্জনকে যেমন পবিত্র ও শীতল করিয়াছে, তেমনি রাধার প্রেম-জ্বালামুখী হইতে শত শত ভাব-প্রবাহ ছুটিয়া ভক্তগণকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়াছে।

প্রেমে প্রতিদ্বন্দী না থাকিলে চরম বিকাশ হয় না, তাই কৃষ্ণপ্রেমে

চন্দ্রাবলী, রাধার প্রতিবাদিনী। রাধা অভিসারে আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি উদ্বেলিত হৃদয়ে কাটিয়াছে,—ভোরে কৃষ্ণ আসিলেন; তিনি অন্য নায়িকার নিকট হইতে আসিতেছেন মনে করিয়া শ্রীমতী রাগে-দুঃখে, অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। একবার চক্ষু তুলিয়া তাঁহার বড় সাধের বঁধুর প্রতি চাহিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আপন দোষ স্বীকার করিলেন—তাঁহার পা ধরিয়া সাধিলেন—ক্ষমা চাহিলেন; যাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি এক-মুখী করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন, সেই বঁধু আসিয়া কাতরে—আকুল ক্রন্দনে মানভিক্ষা চাহিতেছেন; কিন্তু রাধার দয়া হইল না, তিনি সখিগণকে দিয়া শ্যামকে কুঞ্জের বাহির করিয়া দিলেন। শ্যাম চলিয়া যাইবামাত্র তিনি "বঁধু, বঁধু" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীরা বহুযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করাইলে বলিলেন;—

তপ বরত কত করি দিন যামিনী
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন মঝু পাদ গড়ায়ল
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥

তখন রাধা শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিলেন। সখিগণ পুনরায় শ্যামকে আনিয়া মিলাইলেন। সব দুঃখ ভুলিয়া রাধা আবার প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতে লাগিলেন। শ্যামের বুকে মাথা রাখিয়া—নয়নে নয়ন দিয়া কত ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন; বঁধু আমি যে রাগ করি, সে কেবল তোমার জোরে, আমি অবোধিনী গয়লার মেয়ে, তোমার মর্য্যাদা জানিব কিরূপে? তুমি দয়া ক'রে আমায় ভাল বাসিয়াই না আমার মান বাড়াইয়াছ। নতুবা আমাকে পুঁছে কে? তোমার গর্ব্বে আমার গর্ব্ব, তোমার মানে আমার মান।

তুঁহার গরবে হাম গরবিনী
• তুঁহার রূপেতে রূপসী রাই।

এইরূপে নিত্য নূতন প্রেমে বড় সুখে—বড় আনন্দে রাধার দিন যাইতে ছিল। সহসা অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা লইয়া গেলেন; তিনি আসিব বলিয়া আশা দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আর আসিতে পারিলেন না। বৃন্দাবন শ্মশানে পরিণত হইল, সখাসঙ্গে বনমধ্যে রাধা জীবন্মৃতা হইয়া পড়িয়া রহিলেন। অধিকাংশ সময় শ্যাম-প্রেমে বিভোর থাকিতেন। সেই সমাধির ভাবে এবং স্বপ্নাবস্থায় শ্যাম-সঙ্গ-সুখ অনুভব করিতেন। চেতনার সঞ্চার হইলেই বঁধু বঁধু শব্দ করিয়া মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে দিগন্ত আকুলিত করিয়া তুলিতেন। বুঝি সে আকুল ক্রন্দনে পশু-পক্ষী বৃক্ষলতা পর্যান্ত স্তম্ভিত হইয়া যাইত। ধৈর্য্যলাভ করিলে সে সময় সখীসঙ্গে শ্যামপ্রসঙ্গে যাপন করিতেন। এই সময়ের অবস্থা প্রেমিক ভক্ত শ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত দুইটী গান হইতে আলোচনা করা যাউক।

যমুনাতীরে কৃষ্ণবিয়োগিনী উন্মাদিনী রাধিকা, ললিতার গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "হায় আমি কি করিলাম, সখি! সে আমার অমূল্য নিধি,— সে আমার আঁচলে বাধাই ছিল, আমি অভাগিনী পেয়ে নিধি হারাইলাম। সখি, সে কি আমার কম দুঃখের নিধি! আমি দুঃখের সাগর সেঁচে সে নিধি পেয়েছিলাম। আজ সেই দিন আমার মনে পড়িতেছে, সেই নব অনুরাগের দিন!—

সখি যখন নব অনুরাগে হৃদয়ে লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে।
(যা যা ক'রতে যে হবে গো, সখি আমার বঁধুয়ার লাগি)

প্রেম ক'রে রাখালের সনে, আমায় ফিরিতে হবে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পথ মাঝে ;

(সখি আমায় যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী)

সখি ! যখন কানুর নব অনুরাগ আমার নির্ম্মল হৃদয়ে দাগ দিল, তখন একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম, আমার বঁধুর জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে। সেই পাছের কাজগুলি আগেই ভাবিয়া স্থির করিলাম। সখি, আমি ত সুখের জন্য শ্যামের সঙ্গে প্রেম করি নাই, যদি সুখের লালসায় প্রেম করিতাম, তাহা হইলে রাখালের সঙ্গে প্রেম করিব কেন ? আমি যে দিন কানুর সঙ্গে প্রেম করিয়াছি, সেই দিন হইতে দুঃখকে মাথার ভূষণ করিয়াছি। রাখালের সঙ্গে প্রেম করিয়া আমাকে যে বনে বনে ফিরিতে হইবে, আমি তখনই তাহা জানিতাম। বন-পথ যে কণ্টকময়, বনে যে ভীষণ ভুজঙ্গ আছে, আঁধার রজনীতে পথ চলিতে চলিতে যে ভুজঙ্গের মাথায় পা দিতে পারি, পঙ্কের খাদে পড়িতে পারি, এ সকলই ত আমি জানিতাম। সখি, আমি আরও জানিতাম যে, 'রাই বলে, বাঁশী বাজিলে আমাকে যেতেই হইবে। তাই—

অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়া অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতাম।

(সখি ! আমায় চ'লতে যে হবে গো, বঁধুর লাগি পিছল পথে)

সখি ! বর্ষার আঁধার রজনীতে যখন মুষলধারে বারিবর্ষণ হইবে, যখন দুর্দ্দান্ত ঝঞ্জাবাতাসে যমুনার হৃদয়ে প্রবল তরঙ্গ উঠিবে, নিবিড় অন্ধকার-বিদ্যুতের বিকটহাসি ভিন্ন আর কোন আলোকের রেখাও দেখা যাইবে না, বজ্রের বিকট গর্জ্জনে যখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে সেই দুর্য্যো- গের রাত্রিতে যদি শুনিতে পাই বনের মাঝে আমার নাম ধরিয়া বাঁশী বাজিতেছে, তাহা হইলে আর কি আমি ঘরে থাকিতে পারিব ? সেই

ঘোর রজনীতে আমাকে নিরাপদ গৃহাশ্রয় ত্যাগ করিয়া বঁধু যে পথে ডাকিতেছেন, সেই পথে চলিতে হইবে—এ কথা যে আমি আগেই ভাবিয়াছিলাম। তাই আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া পিছল করিয়া, সেই পিছল পথে চলিতে শিখিতাম; যেন আঁধার রাত্রিতে বর্ষার পিছলে পথ চলিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া না যাই। তাই সখি—

হইলে আঁধার রাতি পথ মাঝে কাঁটাপাতি
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম ॥
(সদাই আমায় ফিরিতে যে হবে গো, কত কণ্টক কানন মাঝে)
এনে বিষ-বৈদ্যগণে বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে
তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলাম কত।
(ভুজঙ্গ দমন লাগি গো)

সখি আমার এই কৃষ্ণপ্রেমের কত না শত্রু, বঁধুর উদ্দেশে চলিবার পথে তাহারা ভুজঙ্গরূপ ধরিয়া থাকে। কি জানি, কোন সুযোগে দংশন করিবে, বিষে জর জর হইয়া অঙ্গ অচল হইলে আরতো আমি প্রাণনাথের আহ্বানে যাইতে পারিনা। তাই বিষবৈদ্যগণকে ডাকিয়া নির্জ্জনস্থানে কত সাধনা করিয়া ভুজঙ্গ দমনের তন্ত্র-মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলাম। কিন্তু—

বঁধুর লাগি কৈলাম যত, এক মুখে কহিব কত,
হতবিধি সব কৈল হত ॥
(হায়! সে সব বৃথা যে হ'ল গো, সখি আমার করম দোষে)

বঁধুর জন্য আমি কি করিয়াছি, কিইবা না করিয়াছি, কিন্তু তবু আমার কর্ম্ম-দোষে সকলই বিফল হইল। হতবিধি আমার এত আয়োজন হত করিল। আবার ক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিলেন,—

না না সখি, এ আমার পাগলের প্রলাপ। বঁধুর জন্য আমি যে এত-দুঃখ সহিয়াছি, সে কি আমার দুঃখ? সে যদি দুঃখ হইবে, তবে জগতে

সুখই বা কি আছে ? সে দুঃখ যে আমার বঁধুর জন্য, আমি সে দুঃখ-রত্নকে হার করিয়া গলায় পরিয়াছি। সখি !—

বঁধুর পরস পরশ লালসে
(যখন) যাইতাম নিকুঞ্জ নিবাসে,
তখন চরণে বেড়িত বিষধর কত, নূপুর হইত জ্ঞান গো !
সে দুঃখ জানি নাই বঁধুর সুখে,
সদা ভাসিতাম সুখে, নিশি দিন,
গেছে সেই একদিন আর এই একদিন, অভাগিনী রাধার।
(এখন) বিনে সে ত্রিভঙ্গ, শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ,
ভূষণ ভুজঙ্গ মান গো ॥

যখন বঁধুর পরশ-লালসায় কুঞ্জ-পথে চলিতাম, তখন কি পথের দিকে চাহিয়া দেখিতাম ? তখন কত কাল-ফণী আমার চরণ বেড়িয়া ধরিত, তাহাদের আমি নূপুর বলিয়া মনে করিতাম।

আমি আসিতাম বাঁশীর টানে, তখন কেবা চাইত পথ পানে।
প্রাণ বঁধুর সহিত তিল আধ ব্যবধানও যে আমার সহিত না।

আবার—

একদিন কুঞ্জে মিলনে দোঁহার, গলে ছিল আমার নীলমণি হার।
বিচ্ছেদ ভয়ে ত্যজিয়ে সে হার, আমি তুলে নিলাম শ্যামচন্দ্রে হায় ॥

সখি ! যে মণিহার আমার আর আমার প্রাণকান্তের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ব্যাঘাত করে, সে হারে আমার কাজ কি ? বিশেষতঃ—

ও—যে অন্তরে প'রেছে শ্যাম-প্রেমের হার, তার কি কাজ আর,—
তার কি কাজ আর, মণিমুক্তা হেমের হার ?
তবে এসব হার ক'রতেম যে ব্যবহার,
তখন এই হার ছিল, বঁধুর সুখের উপহার ॥

সখি! আমি আমার সেই "প্রাপ্তরত্ন" হারাইয়াছি, জীবনে আর সেই রত্নত পেলাম না—

এখন পরিণামের হার হরিনামের হার
ত্বরা পরা তোরা অঙ্গে সই।
আমি পরিয়ে সে হার মরিয়ে তাহার
চরণ যুগলে পুনঃ দাসী হই॥

বিরহাগ্নিতে রাধার প্রেম কষিত সোনার ন্যায় হইয়াছিল। মিলনে যাহা ঢাকা ছিল, বিরহে তাহা প্রকাশিত হইল। আর তাঁহার মান নাই, গর্ব্ব নাই, সুখ নাই—দেহ বিফল, বুঝি প্রাণও বিফল। সকল প্রেমিকারই এই কথা মনে হয়,—

প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা॥

তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য—তাঁহার ভরা-যৌবন যদি প্রিয়সংভুক্ত না হইল, তাহা হইলে তাহা বিফল। মুহূর্ত্তে মৃত্যু কবলিত হইয়াও রাধা, শ্যামসুন্দরের উপরে রাগ করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রভাসে যাইয়া দুঃখে থাকিতেন, তবে কথা ছিল না। কিন্তু তিনি ত তথায় রাজা হইয়া—মহিষী লইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতেছেন। অথচ একটী মুখের কথা বলিয়াও সান্ত্বনা করিতে আইসেন না, একটা লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব করেন না। তিনি রাজা, ইচ্ছা করিলে সব করিতে পারেন, তবু করেন না কেন? ভুলিয়া গিয়াছেন,—যে রাধাকে সর্ব্বদা হিয়ায় রাখিয়া নয়নের প্রহরা দিতেন, তিনি স্বামী,ঘর, কলঙ্ক, নিন্দা, কুল, মান তুচ্ছ করিয়া যে শ্যামের প্রেমে ঝাঁপ দিলেন, সে আজি অক্লেশে রাধাকে ভুলিয়া অন্য নারীর সঙ্গে কত রঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন। এত ঘৃণা—এত তাচ্ছিল্য—এত হেলা কোন্ প্রেমিকা সহ্য করিবে? সাধারণ

রমণী হইলে ফাটিয়া মরিত; কিন্তু রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়াই কৃষ্ণ-বিরহ-বাড়বানলে কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণসুখে তিনি ঈর্ষ্যা না করিয়া বলিতেছেন ;—

যুগ যুগ জীবয়ু বসয়ু লখ ক্রোশ।
হমর অভাগ হুনক কোন দোষ॥

সে যেখানে ইচ্ছা থাকুক, লাখবর্ষ সুখে জীবিত থাকুক, আমার অভাগ্য তাঁহার দোষ কি? অদোষ-পরিত্যক্তা রাধার কি নিঃস্বার্থ প্রেম! রাধার সে সময়ের অবস্থা দেখিয়া বুঝি পাষাণও গলিয়াছিল, তবু তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ করেন নাই; বরং কেহ নিন্দা করিলে সহ্য করিতে পরিতেন না। এই সময় মহাভাবে রাধা আত্মহারা থাকিতেন, অষ্ট সাত্ত্বিকভাব উদ্দীপ্ত অবস্থায় অনুভব হইত। কখনও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া রোম-কূপগুলি শিমূল কাঁটার মত দেখাইত—কখনও শীতের প্রভাবে থর থরি কাঁপিতেন, আবার মুহূর্ত্তে এরূপ তাপবৃদ্ধি হইতে যে, নব কিশলয়দলও সে তাপে শুকাইয়া যাইত। শরীরের গ্রন্থিগুলা এলাইয়া পড়িত—চক্ষুদিয়া পিচ্‌কারীর মত অশ্রুজল ছুটিত। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতেন,—নিঃশ্বাস ও বুকের স্পন্দন রহিত হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন। সখিগণ কর্ণমূলে অনবরত কৃষ্ণনাম শুনাইলে, চৈতন্যপ্রাপ্তিমাত্রে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিতেন। যাঁহাকে না ধরিলে উঠিয়া বসিতে পারিতেন না, সেই রাধিকা ভাবাবেশে সময় সময় সিংহীর ন্যায় কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইতেন। ক্রমশঃ তিনি আপনা ভুলিয়া দিব্যোন্মাদ লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার বিশ্বময় কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণানুভব আসিয়াছিল,—তিনি, আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রিয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া কৃষ্ণ-তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে শতবৎসর পরে প্রভাসের মহাযজ্ঞে কৃষ্ণ অঙ্গে মিলিতা হইয়া স্ব-স্বরূপে লীন হইয়া গেলেন।

এই রাধাই গোপীভাবনিষ্ঠ প্রেমময়-স্বভাবলুব্ধ ভক্তের একমাত্র আদর্শ। জীবকে এই আদর্শ দেখাইয়া প্রেমভক্তির পথে পূর্ণানন্দ প্রদানের জন্যই ব্রজলীলা—ভগবানের "রাধাকৃষ্ণ" অবতার। অতএব ব্রজলীলা বা রাধাকৃষ্ণের রতিরস কদর্য্য বা ঘৃণ্য নহে। ভগবান্ স্ব-স্বরূপেই রমমাণ; তাই তাঁহার নাম আত্মারাম ঈশ্বর। সেই রমণী লীলাই ব্রজলীলা। জীব আর শক্তি লইয়া তাঁহার সকল। জীব আর শক্তি না থাকিলে তিনি নির্গুণ,—নিষ্ক্রিয়। জীব যখন সাধন বলে—নিষ্কাম ভাবে প্রকৃতির বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্কে আত্মসমর্পণ করেন—তখন ভগবানের স্বরূপ-শক্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জীব তখন নিষ্কাম—সে তখন শক্তি লইয়া কি করিবে? তাহার কামনা গিয়াছে,—কর্ম্ম গিয়াছে, শক্তির তাহার প্রয়োজন কি? তাই জীব সে শক্তি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করে। সে শক্তি নিজশক্তি বলিয়া—আনন্দময়ী হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া, ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিয়া মধুরভাবে আলিঙ্গন করতঃ মিলিত হয়েন। এইরূপ ভগবান্ ও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাত্মক মিলনের নাম রমণ;—যোগীর ইহাই সমাধি। ভগবান্ ভক্তের সহিত রমণ করিবেন; ভক্তও ভগবানের সহিত রমণ করিবেন। এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় নহে, স্বাভাবিক। ভগবান্ এই প্রকারে যে নিজশক্তি বা প্রকৃতির সহিত রমণ করেন,—এ রমণ মায়িক জগতের কেহ জানিতে পারেনা,—ইহাই ব্রজের অমানুষী গূঢ়লীলা। এই স্বরূপশক্তির শীর্ষস্থানীয়া হ্লাদিনীশক্তি,——সেই আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী ভগবান্কে আনন্দাস্বাদন করাইয়া থাকেন। হ্লাদিনীশক্তি দ্বারায় ভক্তের পোষণ হয়, তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম গোপী। শ্রীমতী রাধাই গোপীকুলশিরোমণি, তাই রাধার প্রেমও সাধ্যের শিরোমণি। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী হ্লাদিনীশক্তি রাধার সহিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন তাহাই রমণ বা রাসক্রীড়া নামে অভিহিত।

তাই গোপীভাবের সাধনায় শৃঙ্গাররসকে মধ্যগতকরতঃ প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া সম্ভোগ মিলন সংঘটিত হয়, তাহাতে সমস্ত প্রকার ভেদ ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়; তাহাতেই (কখনও শ্রীকৃষ্ণ, রাধার ভাবে বিভোর হইয়া রাধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, কখনও বা রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাচরণ করিয়া লীলানন্দ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহারই নাম বিবর্ত্তবিলাস! ভক্তাবতার গৌরাঙ্গদেবে এই ভাব সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছিল।)

রাধা-কৃষ্ণলীলায় জীব প্রেমভক্তির আদর্শ পাইল বটে, কিন্তু কিরূপ সাধনায় তাহা লাভ হইবে, তাহা জানিতে পারিল না। সুতরাং তাহাদের প্রেম-রসের পিপাসা মিটিল না। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি দু'চারিজন ভক্ত ভগবৎ-কৃপায় প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেও, সাধারণ জীব সে গূঢ় উপায় জানিল না। কাজেই সাধনার আদর্শ-জন্য ভগবান্‌কে আবার অবতীর্ণ হইতে হইল। পূর্ণ ভগবান্ ব্যতীত অপূর্ণ জীবকে কে আর সে শিক্ষা দিবে? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।২১

সমাজের শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, সাধারণ লোকও তাহার অনুসরণ করে। তাই ভগবানের কোনও কর্ম্ম না থাকিলেও "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া নিজে কর্ম্ম-আচরণের দ্বারা জীবশিক্ষা দিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণের আদর্শে প্রেমভক্তি লাভের জন্য যখন জীবগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন দয়ার সাগর ভগবান্ রাধাভাবে অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে

নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তাই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, রাধাকৃষ্ণ একদেহে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন,—গৌরাঙ্গের বাহিরে রাধা, অন্তর কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণই রাধাভাব-কান্তিতে আচ্ছাদিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ তত্ত্ব শাস্ত্র পণ্ডিতের বোধগম্য না হইলেও সাধন-পণ্ডিতের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা—
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

—ললিত-মাধব।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হইয়াও দ্বাপরের শেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, পরে সেই উভয় মূর্ত্তিই পুনরায় একতা লাভে কলির প্রথমসন্ধ্যায় প্রকটিত হইয়া চৈতন্য নামক রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রেমরস আস্বাদ করিয়াছিলেন। কারণ এই যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই জড়প্রতিযোগী—চিদ্ঘন-মূর্ত্তি; সুতরাং উভয় স্বরূপেরই প্রায়ই একবিধ উপাদান, কেবল কান্তি ও ভাব মাত্র বিভিন্ন। এই হেতু লীলা অন্তে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপের মহামিলনে তাহাদিগের কেবল কান্তি ও ভাবেরই পরিবর্ত্তন সঙ্গত, নতুবা অন্য কোনরূপ অবস্থান্তর সম্ভবপর নহে; পক্ষান্তরে শক্তি অপেক্ষা শক্তিমানের প্রাধান্যবশতঃ উভয়ের সম্মিলনে কৃষ্ণস্বরূপই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়াছেন, কিন্তু রাধাস্বরূপ কৃষ্ণভাবদ্যুতি-সুবলিত হন নাই। দলভুক্ত গোঁড়া ও গর্ব্বিত শাস্ত্রপণ্ডিতে গৌরাঙ্গ লইয়া বড়ই আন্দোলন-আলোচনা করে। গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার করিলেও রাধাকৃষ্ণ-মিলনে গৌর হইয়াছে,—রাধাভাবকান্তিতে কৃষ্ণ-অঙ্গ

আচ্ছাদিত হইয়াছে, শাস্ত্র-পণ্ডিত একথা স্বীকার করে না; অর্থাৎ বুঝিতে পারে না। আবার গোঁড়ামীর মূঢ়তায়, জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়ায় গোঁড়া গৌর-ভক্ত এ তত্ত্ব বুঝাইতে পারে না,—উপরন্তু বাজে কথায় বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসে। কিন্তু যোগী, জ্ঞানী বা সাধকগণের এ তত্ত্ব বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না।

ভগবান্ রাধাকৃষ্ণ অবতারে যে তত্ত্ব বিকাশ করিয়াছেন, সেই সাধ্য-তত্ত্বের সাধনা-প্রণালী গৌরাঙ্গ অবতারে প্রচারিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব—সাধ্য অর্থাৎ ভগবানের ভাব; আর গৌরাঙ্গতত্ত্ব—সাধনা অর্থাৎ ভক্তের ভাব। সুতরাং যিনি ভগবদ্ভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিয়াছিলেন, তিনিই ভক্তভাবে সেই লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ অবতারের বিভিন্নতা, নতুবা তাঁহাদিগের উপাদানগত কোনও পার্থক্য নাই। ইহাই বৈষ্ণবীয় দর্শনের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব।

ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তিই রাধা; সুতরাং শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শক্তি শ্রীরাধার বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। যথা:—

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।

—শ্রুতি।

যেরূপ মৃগমদ ও তাহার গন্ধে গুণগত কোন পার্থক্য নাই এবং অগ্নি ও তাহার জ্বালাতে রূপগত কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ কৃষ্ণ ও রাধার রূপ-গুণগত কোন প্রভেদ নাই; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা অভিন্ন ও এক-মূর্ত্তি। শক্তিই জীব ও জগতের কারণ, সুতরাং জীব ও জগৎ কার্য্য। কার্য্য কারণে লয় হইবে, আবার কারণ ব্রহ্মে বিলীন হয়। তাই জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসিগণের অদ্বৈতত্ত্বই চরম লক্ষ্য। তাঁহারা জীব-জগতের

ধার ধারেন না। কিন্তু ভক্তগণ লীলারস আস্বাদে লুব্ধ বলিয়া লীলা অর্থাৎ জীব ও জগৎ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; কাজেই ভেদভাবও রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তদীয় শক্তি বা শক্তির কার্য্য জীব-জগৎ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাঁহা হইতে অভিন্ন। তবে এই অভেদ যেমন অচিন্ত্য, তেমনই ভেদ-প্রতীতিও অচিন্তনীয়, অন্যান্য দর্শন হইতে বৈষ্ণব-দর্শনের ইহাই বিশিষ্টতা; গোঁড়া ভক্ত এই কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অন্যান্য বৈদান্তিক-মতের নিন্দা করিয়া নিজেদের মতের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করে। আপন আপন লক্ষ্যকে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই বিচার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রদায়ভেদে বেদান্তের ভাষ্য ও টীকা রচিত হয়। তাই, ভক্ত-বৈদান্তিক বলেন ভগবান্ হইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমাদের সামর্থ্যাতীত, অভেদ কল্পনাও তেমনি আমাদের সামর্থ্যাতীত। অথবা ভেদাভেদবাদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও সেই ভেদ অচিন্ত্য, সেই অভেদও অচিন্ত্য। অর্থাৎ স্পষ্টরূপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব— উহা চিন্তার আয়ত্ত নহে, সেই জন্য এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

গৌরাঙ্গদেব অভেদতত্ত্ব আর রাধাকৃষ্ণ ভেদতত্ত্ব; সাধনায় গৌরাঙ্গত্ব লাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধলীলা-রসমাধুর্য্য আস্বাদন করাই প্রেমিক ভক্তের চরমলক্ষ্য। ইহাই সুনিশ্চয় সাধ্যাবধি। তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অচিন্ত্যাভেদাভেদ মতই বেদান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে সাধনায় অদ্বৈততত্ত্ব অর্থাৎ গৌরাঙ্গত্ব লাভ করিয়া ভেদ-তত্ত্বের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলা-রস মাধুর্য্য আস্বাদন করাই পঞ্চম পুরুষার্থ। কিরূপে গৌরাঙ্গত্ব অর্থাৎ প্রেমময় স্বভাব লাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা-রস আস্বাদন পূর্ব্বক পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায়, পরের প্রবন্ধে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

রসতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধন

—:)*(:—

রাধাকৃষ্ণই রসতত্ত্ব,—সুতরাং জীবের ইহাই সাধ্য ; যে সাধনাবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণের রস-রতি জ্ঞান হয়, তাহাই সাধ্য-সাধন।

রসের পিপাসা জীবের প্রাণে প্রাণে। কেবল জীব কেন,—কুসুম ফুটিয়া রূপে-রসে ফাটিতে থাকে ; বৃক্ষের নবীন শ্যাম-পত্র-কুঞ্জে রূপ আর রস। পৃথিবীময় রূপ আর রসের বিচিত্র লীলা। স্বর্গ, মর্ত্ত্য এই রূপ আর রসের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কোকিলের সুর এই রূপ আর রসের পঞ্চম, শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল সেই রূপ-রসের স্নিগ্ধশ্বাস, নৈশগগনে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুর্য্য—সেই রূপ আর রসের জীবন্ত মর্ত্ত্যলীলা। রূপ শক্তিক্রীড়া—রস সুখের নামান্তর। কাজেই তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ—ধার্ম্মিকের প্রাণের অনুসন্ধান ঐ শক্তি আর রসের দিকে। কেননা, ব্রহ্মই রসস্বরূপ। যথা :—

রসো বৈ সঃ।

শ্রুতি।

রস তিনি। তিনি কে ?—ঋষিরা বলেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি ব্রহ্ম ; ব্রহ্মই আনন্দামৃতরূপ রস। এই রস অস্বাদনার্থই ভগবানের সৃষ্টিকার্য্য ;—জীব সেই বাসনাবিদগ্ধ হইয়া, রসের পিপাসু হইয়া,—ঘুরিয়া মরিতেছে। গোপী-ভাবের সাধনায় সেই রস-রতি জ্ঞান হয়,—হৃদয়ে তাহার প্রকাশ পায়। ভগবানের যে রসপ্রাপ্তি কামনা, সেই রস পূর্ণভাবে রাধায় বিরাজিত ;—

সুতরাং রসের বিকাশ রাধাতত্ত্বে। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজলীলা তাহাই রসের আশ্রয় বা রস-সাধনা।

রাধা আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে রসতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে ব্রজধামে উভয় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই রাধাকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে অর্থাৎ আত্মারূপে প্রতি জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জীব সেই আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে জলভ্রান্ত মৃগের মরীচিকায় ছুটিয়া যাওয়ার ন্যায় —এই সংসার-মরু-ভূখণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। কিন্তু অপূর্ণ জগতে পূর্ণ সুখের আশা করা বিড়ম্বনা। মায়া-মুগ্ধ জীব জানিতে পারে না যে, পূর্ণানন্দ—পূর্ণ সুখ যে তাহার আত্মায় অবস্থিত। মৃগ যেরূপ আপন নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বনমধ্যে ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ জীবও আনন্দের অনুভূতিতে পার্থিব বিষয়ে প্রধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বশতঃ এবং সাধুশাস্ত্রের কৃপায় জীব যখন জানিতে পারে যে, তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ তাহার আত্মাতেই অবস্থিত, তখন বিষয় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়,—সে তখন আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনন্তর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আত্মায় রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বিকাশ করিতে পারিলেই পূর্ণরস ও আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। তাহা সাধন সাপেক্ষ। জগতে অতি সামান্য একটী তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের সুবর্ণযুগে দেবকল্প ঋষিগণ যোগের সুমহান্ পর্ব্বত শৃঙ্গে অধিরোহণ পূর্ব্বক জ্ঞানের দীপ্ত-বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া লইয়া যে সন্ধান করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রের আশ্রয়ে আমরা এখনও সে তত্ত্বের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহাকেও কিঞ্চিৎ সাধনা-সাপেক্ষ,—সেই সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিমানের শক্তিকে সহজে আয়ত্ত করা যায়, কি প্রকারে প্রকৃতির বাসনা-বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়,—

আর কি প্রকারে রসের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া রসের ভাণ্ড নিঃসৃত দরধারায় জ্বলিত-কণ্ঠ জীবের প্রাণ সুশীতল হয়,—তাহার সাধনতত্ত্ব যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

যে পর্য্যন্ত জীব আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া প্রাকৃত-বিষয় ভোগে আসক্ত থাকে, মায়ার সম্মোহনমন্ত্রে ভুলিয়া ভবের হাটে ছুটিয়া বেড়ায়, সে পর্য্যন্ত তাহার বদ্ধাবস্থা,—সুতরাং তাহাকে বদ্ধজীব বলা যাইতে পারে। তৎপরে ভগবানের কৃপায় আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জীব রসানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। প্রথমতঃ মায়ামুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া শেষ রসসংপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জীবের যে সাধনা, সেই অবস্থাতে সাধকগণ হিন্দু ঋষিগণ কর্ত্তৃক—

"শাক্ত ও বৈষ্ণব"

এই দুই নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বহুদিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল হইয়াছে ও হইতেছে। উভয় বাদীই আপন আপন মতের প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য বহু যুক্তি-প্রমাণ দেখাইয়াছেন। শাক্তগণ বলেন, "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে" অর্থাৎ শক্তি-জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্যজনক ও বৃথা। আবার বৈষ্ণবগণ-শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা দেখাইবেন যে, বৈষ্ণবই একমাত্র মুক্তির অধিকারী। পৃথিবীর নানাদেশ নানাসম্প্রদায় আপন আপন ধর্ম্মভাবে বিভোর রহিয়াছে, দুঃখের বিষয় তাহারা বৈষ্ণব কিম্বা শাক্ত না হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগের এইরূপ প্রলাপোক্তি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। পরিধির সকলস্থান হইতে বৃত্তের কেন্দ্র যে সমদূরবর্ত্তী—যত মত, তত পথ—প্রত্যেক ব্যাসার্দ্ধ সমান, পরিধি বা ব্যাসার্দ্ধ স্থিত ব্যক্তি তাহা কি

প্রকারে জানিবে? তাই জগতের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরস্পর বিদ্বেষ-কোলাহল। নতুবা প্রকৃত সাধুর নিকট কোন হিংসা দ্বেষ নাই; তাঁহারা জানেন, যে কোন মতের চরমসাধনায় সকলে একই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবে। সুতরাং বৈয়াকরণিক অর্থানুসারে শাক্ত বা বৈষ্ণব, শক্তি-উপাসক বা বিষ্ণু-উপাসক হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম তাহা নহে; উহা ধর্ম্মের সাধনা-পথেরই স্তরবিভাগ মাত্র। জীব যতদিন মায়ার অধীন থাকে,—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শে মোহিত হয়,—বাসনা-কামনার দাস হইয়া থাকে, ততদিন সে বদ্ধ। সেই বদ্ধজীব সাধুশাস্ত্রের কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন প্রকৃতির বাহুমুক্ত হইবার জন্য সাধন করে, তখন সে শাক্ত; আর যখন মায়ামুক্ত হইয়া আত্মার অসমোর্দ্ধ প্রেম-রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করে, তখন সে বৈষ্ণব। অতএব সাধক, শক্তি বা বিষ্ণুর,—যাঁহারই উপাসক হউন না কেন, সাধনার স্তরভেদে শাক্ত-বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইবে। এইরূপ যে মন্ত্রেই উপাসনা করা হউক না কেন, জীব যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, সাধনার স্তরভেদে—শাক্তাদি নামে অভিহিত হয়। শিবের দৃষ্টান্তে আমরা এই বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

শিব যখন দাক্ষায়ণীকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতেছিলেন, তখন তিনি বদ্ধ জীব মাত্র। তৎপরে যখন দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হইল, শিব সতীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সতী, শিববাক্য গ্রাহ্য না করিয়া দক্ষালয়ে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন শিব বুঝিলেন,—প্রকৃতি' ত তাঁহার বশীভূতা নহেন, কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন। তখন তিনি শক্তিকে প্রকৃত চিনিতে পারিলেন—শক্তি-জ্ঞান হইল,—অমনি তিনি মহাযোগে বসিলেন। শিব শাক্ত হইলেন। এদিকে দাক্ষায়ণী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

শিব ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। যিনি একদিন সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি আজ সেই সতীকে—সেই হারাধনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। তখন গৌরী দেবগণের সাহায্যে মদনদ্বারা শিবের ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শিবের কটাক্ষে মদন মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া গেল। শিব তখন শক্তিকে পত্নীরূপে দাসীর ন্যায় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মরসানন্দে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। এতদিনে শিব বৈষ্ণব হইলেন। তাই মহাদেব পরম বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তিত। শাক্ত মায়াকে বশীভূত করিবার সাধন করিতেছেন; আর বৈষ্ণব শক্তিজয় করিয়াছেন, বৈষ্ণবের নিকট প্রকৃতি মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন। শাক্ত যখন মায়াকে সাধনার দ্বারা বশীভূত করেন, কিম্বা তাঁহার কৃপালাভ করেন, কামকে ভস্মীভূত করেন, তখন বৈষ্ণব-পদবাচ্য হন। এই কারণে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ শক্তিসাধক হইলেও ইঁহারা পরম বৈষ্ণব। আর যে সকল বিষ্ণু-উপাসক বিষয়-বিষ-বিদগ্ধচিত্তে সংসার প্রলোভনে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহারা শাক্তাধম। যে ব্যক্তি প্রকৃতির অনল-বাহুর হাত এড়াইয়াছেন তিনি শক্তি উপাসক হইলেও বৈষ্ণব। শক্তি উপাসক কিম্বা কোন স্ত্রী দেবতার উপাসক যদি শাক্ত হইত, তবে রাধা উপাসক পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামীও শাক্ত; কিন্তু সকলেই তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া জানে। এই হেতুবাদে রামপ্রসাদও পরম বৈষ্ণব। রামপ্রসাদ যেদিন গাহিলেন,—

ভবেরে সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা॥
সগুণে নির্গুণ বাঁধিয়ে বিবাদ ঢেলা দিয়া ভাঙ্গছে ঢেলা।
(সে যে) সকল কাজে সমান রাজী নারাজ হয় সে কাজের বেলা॥

তখন বুঝিলাম রামপ্রসাদ শাক্ত, তিনি মায়াকে জানিয়াছেন ; আর মায়া তাঁহাকে বাঁধিতে পারিবেন না। তারপরে যখন শুনিলাম—

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।

তখন রাম প্রসাদকে বৈষ্ণব বলিয়া সন্দেহ হইল। তারপরে—

বড় দর্শনে দর্শন মিলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
ভক্তি রসের রসিক সে যে সদানন্দে বিরাজ করে॥

তখন আর সন্দেহ মাত্র রহিলনা,--আমরা রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলাম। যে কোন দেবতার উপাসক হউক না কেন, এমন কি মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতিকেও শাক্ত বা বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। অতএব কেবল বিষ্ণু-উপাসক বৈষ্ণব নহে,—পৃথিবীর যে কোন জাতি হউক না কেন, যে সাধনার উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়া মায়ার বাঁধন—আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট পূর্ব্বক ব্রহ্মরসানন্দে ডুবিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠে "বৈষ্ণব" বলিয়া ঘোষণা করিব। আর বাসনা-বিদগ্ধ জীব কৌপীন-কন্থাধারী হইলেও তাহাকে শাক্তাধম কিম্বা বদ্ধজীব বলিতে দ্বিধা করিব না। সুতরাং সকলেই জানিয়া রাখ যে, শাক্ত না হইলে কাহারও বৈষ্ণব হইবার অধিকার নাই।

পাঠক! আপন আপন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ভুলিয়া একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা কর দেখি, তাহা হইলেই উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তোমরা কি মনে কর যে, চোর, বদমায়েস লম্পটগণও শক্তি কি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই মুক্ত হইবে? কিন্তু একটু ভাবিলেই তোমাদের কথার অসারতা বুঝিতে পারিবে। আর শাক্ত বা বৈষ্ণব শব্দে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ কর, সকল বিবাদ ভঞ্জন হইবে,—শাস্ত্রবাক্যেরও মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব মুক্তির অধিকারী,—বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু

বিষ্ণু উপাসক অর্থে বৈষ্ণব শব্দ গ্রহণ করিলে, সে প্রলাপোক্তিতে কে মুক্তি পাইবে কিম্বা কোন ব্যক্তি সে কথায় অনুরক্তি প্রকাশ করিবে? আর শক্তিকে যিনি জানিয়া—তাঁহার বাহুমুক্ত হইয়া ভগবানের প্রেম-মাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। যে কোনও জাতি—যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, এবম্ভূত বৈষ্ণবই মুক্তির অধিকারী,—আমরাও সেই বৈষ্ণবের পদরজঃ ভিখারী।

অতএব রসতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধনের প্রথমাংশের অধিকারী শাক্ত এবং উত্তরাংশের অধিকারী বৈষ্ণব-পদবাচ্য। অর্থাৎ—এ তত্ত্বের সাধকই শাক্ত এবং সিদ্ধকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জীব আত্মস্থ হইয়া, আত্মায় রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বিকাশ করাই রসতত্ত্ব এবং তাহার সাধনাই সাধ্য-সাধনা। গুণময়ী মায়া, ইন্দ্রিয়-পথে জীবকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ানুরক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিষয়ানুরাগ কাম হইতে উৎপন্ন হয়, * সুতরাং কামই জীবের জ্ঞানকে—আত্ম-স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৩৯

যেরূপ অগ্নি ধূমদ্বারা, দর্পণ মলদ্বারা, গর্ভ জরায়ুদ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চির-শত্রু এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং কামদমন করিলেই অর্থাৎ কাম নষ্ট

* ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২।৬২

হইলে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন আনন্দ লাভ ঘটিয়া থাকে। কাম দমন করাই সাধ্য-প্রেমরসের সাধনা। সর্ব্বাপেক্ষা কামের আকর্ষণ কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য সকলেই বলিবেন, কামিনীতে। শাস্ত্রকারগণও তাহাই বলিয়াছেন ;—

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্ বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥

—পুরাণ বচন।

বীজের অঙ্কুর হইতে ফল-পত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় কামিনী-সঙ্গ হইতে পুত্র, গৃহ প্রভৃতি বিষয়সকলে পুরুষদিগের সংসারে আসক্তি জন্মে * ; কেননা রমণী প্রকৃতির কঠিন শৃঙ্খল,—মায়ার মোহিনী শক্তি। এই রমণীকে আত্ম-শক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারিলে, সে শক্তি আত্মভূত হয়,—তখন জীব সম্পূর্ণ। আনন্দানুভূত বাসনা রমণীতে বর্ত্তমান,—সে বাসনার নিবৃত্ত্যর্থই তন্ত্রের পঞ্চ ম-কারের সাধনা বা কুলাচারপদ্ধতি এবং চণ্ডীদাসাদির রস-সাধনা। বর্ত্তমান গ্রন্থকার প্রণীত "তান্ত্রিকগুরু" নামধেয় গ্রন্থে পঞ্চ ম-কারের সাধনা বা কুলাচারপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। অতএব রস-সাধনাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রেমরসার্থী সাধক প্রথমতঃ রাগবর্ত্মোদ্দেশ প্রেমিক গুরুর কৃপালাভ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে রসতত্ত্ব বা রাধাকৃষ্ণের যুগল মন্ত্র কামবীজ (ক্লীঁ) ও কামগায়ত্রী আগমোক্ত বিধানে গ্রহণ করিবে। কেননা,

* কেন জন্মে অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের সাম্মিলন ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য, বিন্দুস্থৈর্য্য প্রকৃতির দাসত্ব, প্রাণের আকুলতা নষ্ট করিবার উপায় প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলি মৎ প্রণীত "জ্ঞানীগুরু" গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

কলিযুগে তন্ত্র-শাস্ত্রমতে দীক্ষা ও সাধন কার্য্য সম্পন্ন করিবার বিধি আছে। যথা :—

আগমোক্তবিধানেন কলৌ মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥

—তন্ত্রসার।

সুবুদ্ধি জন কলিতে তন্ত্র-বিধানে মন্ত্রজপ করিবে, কেননা এই যুগে অন্য বিধানে দেবতাগণ প্রসন্ন হয়েন না। এই কামবীজ ও কামগায়ত্রী আগম-সম্মত রাধা-কৃষ্ণের যুগল মন্ত্র। রসমাধুর্য্যলিপ্সু সাধকগণই উক্ত মন্ত্রের অধিকারী। সমষ্টি আনন্দ বা পূর্ণানন্দের মূলীভূত বীজই কামমন্ত্র। সুতরাং কামবীজ ও কামগায়ত্রীই ব্রজ-ভাবে মাধুর্য্যরস সাধনার মহামন্ত্র। এই মন্ত্রে প্রাকৃত কামের ধ্বংস ও পূর্ণানন্দ লাভ হইয়া থাকে। যথা :—

কামবীজ সহ মন্ত্র গায়ত্রী ভজিলে।
রাধাকৃষ্ণ লভে গিয়া শ্রীরাসমণ্ডলে॥

—ভজন-নির্ণয়।

কামবীজের সাধক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য শ্রীমতী রাধিকা। অতএব শ্রীরাধা ইহার বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়। অতএব রাধাকৃষ্ণই কামবীজ এবং গায়ত্রী সখিগণ। যথা :—

কামবীজ রাধাকৃষ্ণ গায়ত্রী সে সখী।
অতএব গায়ত্রী বীজ পুরাণেতে লিখি॥

—ভজন-নির্ণয়।

কামবীজ ও কামগায়ত্রী প্রদান করিয়া শ্রীগুরু মাধুর্য্য-তত্ত্বলিপ্সু ভক্তের সম্মুখে রস-মার্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন। মঞ্জরী, সখী প্রভৃতি ভজনাঙ্গ

নির্ণয় করিয়া শ্রীগুরু ভক্তকে ব্রজের নিগূঢ় সাধনায় নিযুক্ত করেন। তখন সাধক অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেহে অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ দ্বারা সিদ্ধরূপ ব্রজলোকে—শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন। নিত্য বৃন্দাবনই সিদ্ধ ব্রজ-লোক। নিত্যবৃন্দাবন কিরূপ—

সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনান্তংশ-সম্ভবম্॥
কর্ণিকারং মহদ্ যন্ত্রং ষটকোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গষটপদীস্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
প্রেমানন্দমহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ।
জ্যোতীঃরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতং॥
তৎ কিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি॥

—ব্রহ্মসংহিতা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে মহদ্ধাম, তাহার নাম গোকুল। ইহা সহস্রদল বিশিষ্ট কমলের ন্যায়। এই কমলের কর্ণিকাসকল অনন্তদেবের অংশ-সম্ভূত যে স্থান,—তাহাই গোকুলাখ্য। এই গোকুলরূপ কমল কর্ণিকা একটী ষট্ কোণ বিশিষ্ট মহদ্ যন্ত্র। ইহা বজ্রকীলক অর্থাৎ প্রোজ্জ্বল হীরক-কীলকের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট এবং কামবীজ সমন্বিত। (ইহার ষট্ কোণে ষট্ পদী মহামন্ত্র (কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায় স্বাহা,) বেষ্টন করিয়া আছে।) এই কর্ণিকার উপরেই প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য রস-রাস-বিহার করেন। এই চিৎধাম—এই রস-রাস-মণ্ডল পূর্ণতম সুখরসে অবস্থিত, এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ও কামবীজ মহামন্ত্রে সম্মিলিত। এই কমলের অষ্টদলে অষ্টসখী, এবং কিঞ্জল্ক ও

কেশরসমূহে অসংখ্য গোপী বিরাজিতা। এই স্থলেই রসিকশেখর পূর্ণতম রস রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পূর্ণতমা হ্লাদিনীশক্তি রাধিকাসহ নিত্য-লীলা করিতেছেন। এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণের কামবীজ ও কামগায়ত্রী দ্বারা উপাসনা করিবে। যথা :—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কামগায়ত্রী যাঁর উপাসন॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কন্দর্প, নিখিল কন্দর্পের নিদান, অর্থাৎ সকল কামই এই কামের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অপ্রাকৃত কামের দ্বারাই মাদনী শক্তি শ্রীরাধার সহিত আনন্দময় প্রেমলীলা-বিলাস সংঘটিত হয়। ইনি সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ, অর্থাৎ প্রাকৃত মন্মথ বা মদনেরও মদন। সখীভাবে এই রাধাকৃষ্ণের সেবাধিকারলাভই সাধ্য-সাধন। যেহেতু—

সখী বিনা এই লীলার অন্যে নাহি গতি।
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সখীভাবেই কুঞ্জসেবাধিকার লাভ হয়,—সখিগণ হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের গূঢ়লীলা প্রকাশিত ও যুগল সেবার অধিকার। অতএব শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে এই সকল সখিগণের মধ্যে যে কোন একজনের স্থান পূরণ করিয়া, অর্থাৎ নিজকে তাঁহার স্বরূপ মনে করিয়া,—তাঁহার ন্যায় হইয়া

রাধা-মাধবের নিত্য সেবা করিবে। সখীদিগের রাধাকৃষ্ণের সেবানন্দই একমাত্র সুখ।

ব্রজলীলার পূর্ব্বাবধি এই উজ্জলরসাত্মক প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় শ্রীরাধা ছিলেন,- জীবে তাহার অনুভূতি ছিল। এই রসাস্বাদ জীবে প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রকটলীলা। জীবের গোপী-ভাব গ্রহণ করিয়া, রাধাকৃষ্ণের-মিলনাত্মক আনন্দানুভব করাই বিধেয়। এই শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার মিলনানন্দই বল, আর তান্ত্রিকের হর গৌরীর মিলন সুখই বল,—সকলই পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন। তবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম, এই যা প্রভেদ। প্রকৃতির অতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময়ী-শৃঙ্গারলীলা অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য, আর প্রাকৃত রতি কন্দর্পের কলুষময়ী কাম-ক্রীড়া পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য। এই প্রাকৃতাপ্রাকৃত উভয়লীলা, প্রত্যেক প্রাপঞ্চিক নারনারীর বাহ্যান্তরে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা অপ্রাকৃত নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। প্রাকৃত অনিত্য লীলাতেই তন্ময় রহিয়াছে। যেরূপ ব্রজগোপীগণ মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-শৃঙ্গার লীলায় তন্ময় থাকিয়া, প্রাকৃত কন্দর্পের অনিত্য কামলীলা বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ প্রাকৃত নরনারীও অনিত্য কাম ক্রীড়ায় অতিনিবিষ্ট হইয়া, নিত্য-শৃঙ্গার-লীলা ভুলিয়া রহিয়াছে। যদি এই সমুদায় প্রাকৃত কামক্রীড়াপরায়ণ নরনারী সাধুশাস্ত্র মুখে রাধাকৃষ্ণের রাসাদি শৃঙ্গারলীলা শ্রবণ করিয়া, তদনুসন্ধানে সবিশেষ যত্নবান হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদে গোপ্যানুগতিময়ী ভক্তি লাভ করিয়া অনায়াসে প্রাকৃত কন্দর্প-ক্রীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে এবং পরিণামে গোপী দেহের অধিকারী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি অনন্ত শৃঙ্গার-লীলা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব সাধক সখীভাবে আপন হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ-

সেবা করিবে।) মনোময় দেহে আশ্রিত নিত্য সখীর ন্যায় তাহাদের চরণসেবন, চামরব্যজন, মালাগ্রন্থন, শয্যারচনা এবং শৃঙ্গাররসাত্মক মিলনাদি করিবে। সর্ব্বদা সেবা পরিচর্য্যা করিতে হইবে। প্রতি দিন, মাস, তিথ্যনুসারে ব্রজলীলার অনুকরণে লীলাদি সম্পন্ন করিবে। ইহা কেবল মনদ্বারা ধ্যেয় নহে, মনশ্চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা এই উভয়বিধা গোপ্যনু-গতিময়ী ভক্তিদ্বারা সেব্য। (এই কারণে গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত, গোপী-জনোচিত ভাব ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের যুগলসেবা করিবে। এইরূপ সাধনায় ক্রমশঃ সাধকের মনোময় সিদ্ধদেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। অন্ত-শ্চিন্তিতাভীষ্ট তৎসাক্ষাৎ-সেবোপযোগা দেহ, অর্থাৎ—স্বাভীষ্ট গোপীমূর্ত্তির নিরন্তর পরিচিন্তনে সাধকের হৃদয় মধ্যে, তৎস্বরূপ যে চিন্তাময়ী মূর্ত্তির উদয় হয়, তাহাই সিদ্ধ গোপীদেহ। এই সিদ্ধদেহের সঞ্চার না হইলে, ভক্ত রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না, তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ-সেবারও অধিকারী হয় না। অতএব ভক্তের প্রথমতঃ সিদ্ধদেহ লাভের জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং বাহ্যাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্যব্রজলোকে—শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখীর ন্যায় সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনস্থ ফল-পুষ্প-পত্র-শয্যাসনাদি দ্বারা রাধাকৃষ্ণের সেবা করিবে।

(প্রথমতঃ গোপীভাবলিপ্সু ভক্ত মনে মনে গোপীমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া নিয়ত তাঁহারই অনুধ্যানে কালাতিপাত করিবেন, সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎ কৃপাপ্রার্থনা করিবেন। ভক্তের ইষ্টচিন্তা বলবতী হইলে স্বাভীষ্ট গোপীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইবে। তাঁহার অতুলনীয় রূপমাধুরী-দর্শনে সাধক আত্মহারা হইবেন। স্বতঃই গ্রহাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তিচিন্তনে সর্ব্বদা তন্ময় থাকিবেন। এই গোপীমূর্ত্তির নিয়ত অনুধ্যান হইতে সাধকের হৃদয়মধ্যে, অভিনব মূর্ত্তির সঞ্চার হইবে, সিদ্ধগোপীদেহের উদয় হইবে। ইহা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান-সম্মত। কেননা—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাস্তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।২২-২৩

যেরূপ গহ্বরমধ্যে তৈলপায়িকা (আশুলা), পেশস্কৃত নামক ভ্রমর (কাঁচপোকা বা কুমরিকা পোকা) বিশেষের নিরন্তর পরিচিন্তনে, পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্নেহ, দ্বেষ, ভয় বা অনুরাগ বশতঃ যে ব্যক্তি যে বিষয় চিন্তা করে, সে অচিরকালমধ্যে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তদীয় ধ্যেয়স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। এই কারণে গুণময় সাধক অনুরাগবশে, সেই গোপীস্বরূপের চিন্তা করিয়া, স্বকীয় হৃদয় মধ্যে ভগবৎ-সেবোপযোগী গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই অন্তশ্চিন্তিত গোপীদেহই সিদ্ধদেহ। হৃদয়ে ইহা সঞ্চারিত হইলে, সাধক স্বাভীষ্ট গোপীকে আর আপনা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করেন না; স্বকীয় আত্মস্বরূপ তদনুগত তৎ-প্রতিবিম্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই গোপীদেহে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই সময় গোপীর প্রেমময়স্বভাবে, সাধকের গুণময় প্রাকৃতস্বভাব লয় হইয়া যায়। তখন ভক্তের উদ্দীপনা বিভাব হয়,—ভক্ত রাধাকৃষ্ণানন্দ অনুভব করিতে পারে, তাঁহাদের শৃঙ্গারাত্মক রাসক্রীড়ায় ভক্তের তাঁহাদের অপেক্ষা কোটিগুণ সুখ হয়; অর্থাৎ ভক্ত পূর্ণসুখ অনুভব করিতে পারে। তাহাতেই ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে রাধার ভাবে বিভোর হইয়া রাধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, কখনও বা শ্রীরাধিকারূপে কৃষ্ণের স্বরূপ-আচরণ করিয়া লীলানন্দ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের কখনও অন্ত-কৃষ্ণ বহিঃ-রাধা; আবার কখনও

অন্তর-রাধা, বহিঃকৃষ্ণ এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ায়, ভক্ত উভয়েরই প্রেম-রসাস্বাদ করিয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ে সাধক প্রাকৃত গুণময়দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোময় সূক্ষ্মদেহে, অর্থাৎ সিদ্ধ-গোপীদেহে নিত্যবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবোত্তরা গতি লাভ করিয়া, তাঁহাদের অলৌকিক লীলারস-মাধুর্য্যে অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

সহজ সাধন-রহস্য

আমরা রসতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধনের যেরূপ প্রণালী বিবৃত করিলাম, তাহা প্রকৃত বৈষ্ণব (শক্তিজয়ী অর্থাৎ মায়ামুক্ত) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বাহ্যবিষয়ে অনুরাগ থাকিলে অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেহের স্ফূর্ত্তি হয় না,—বাহ্যবিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় স্বাভীষ্ট গোপীমূর্ত্তির নিরন্তর পরিচিন্তনের ব্যাঘাত হয়; কাজেই নিত্য-সিদ্ধ ব্রজলোকে শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতি সখিগণের ন্যায় সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ সেবা কদাপি সম্ভবপর নহে। আবার অন্যরূপ সাধনভক্তির সাহায্যে প্রেমময়স্বভাব প্রাপ্তির উপায় নাই; তদ্দ্বারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া ঐশ্বর্য্য-সুখোত্তরাগতি প্রাপ্তি হয়, কিন্তু সখীদিগের ন্যায় প্রেমসেবোত্তরাগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব শৃঙ্গাররসাত্মক গোপীভাবলিপ্সু সাধকের গোপ্যানুগতিময়ী ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। যথা —

কর্ম্মতপ যোগজ্ঞান, বিধি-ভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

তবে তাহার উপায় কি ?—শাস্ত্রকারগণ সে উপায় করিয়া দিয়াছেন। রামানন্দ, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক ভক্তগণের সাধনাই তাহাদিগের অনুকরণীয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাম হইতেই জীবের বহির্বিষয়ে অনুরাগ হয় ; সে কামের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা কামিনীতে অধিক। যদিও শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৫ অঃ

আত্মা স্ত্রী, পুরুষ কিম্বা নপুংসক নহেন ; যখন যেরূপ শরীর আশ্রয় করেন, তদনুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপে উল্লিখিত হন। বাস্তবিক স্ত্রী ও পুরুষ এক চৈতন্যেরই বিকাশ ; আধারভেদে—গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র। তবে পরস্পরের এরূপ প্রবল আকর্ষণ কেন ? * নর ও নারীর আত্মা এক হইলেও নরে চিৎশক্তির এবং নারীতে আনন্দশক্তির বিকাশাধিক্য বশতঃ নর—নারীর প্রতি, নারী—নরের প্রতি স্বভাববশতঃ আকৃষ্ট হয়। উদ্দেশ্য এই যে উভয়ে আত্মসংমিশ্রণ করিয়া আপন আপন অভাব পূরণ

* নরনারীর পরস্পরের আকর্ষণের কারণ ও তাহা নিবারণোপায় মৎ প্রণীত "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থে বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে সংক্ষেপে কারণ প্রদর্শিত হইল।

করতঃ পূর্ণত্ব লাভ করিবে। তাই সর্ব্বাপেক্ষা কামিনীতে কামের *আকর্ষণ অত্যধিক। সুতরাং কামিনীতে আত্মসংমিশ্রণ করিতে পারিলে,* জীব আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ করিয়া জগতের প্রধান আকর্ষণ নষ্ট করতঃ সহজে অন্তর রাজ্যে গমন করিতে পারে। তাই তন্ত্রশাস্ত্রে কুলাচারের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ কুলসাধন ভিন্ন মায়াময় জীবের কামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। তন্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন, বেদ পুরাণানুযায়ী উপদেশ মত রমণীর আসঙ্গ-লিপ্সা পরিত্যাগ করা জীবের দুঃসাধ্য। প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব স্থূল রূপ-রসাদির অল্প-বিস্তর ভোগ করিবেই করিবে; কিন্তু যদি কোনরূপে তাহার প্রিয় ভোগ্যবস্তুর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধা উদয় করিয়া দেওয়া যায়, তবে সে কত ভোগ করিবে করুক না—ঐ তীব্র শ্রদ্ধার বলে স্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই। এই কারণে গোপীভাব লুব্ধ ভক্ত, ভগবৎশাস্ত্র-বিরোধী তন্ত্রসম্মত কুলাচারের অনুষ্ঠানে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন। তাঁহারা কুলসাধনবলে কামমুক্ত হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং গোপ্যনুগতিময়ী ভক্তিলাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে মহামন্মথ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল-সুধা প্রাপ্ত হন।

অতএব গোপীভাবলিপ্সু প্রবর্ত্তক-ভক্ত অর্থাৎ বাহ্যানুরক্ত সাধক বাহিরে শাক্তভাবে এবং অন্তরে বৈষ্ণবভাবে ভগবানের উপাসনা করিবে। তন্ত্রশাস্ত্র-মতে শাক্তের কুলাচার সাধন বর্ত্তমান গ্রন্থকার প্রণীত "তান্ত্রিক গুরু," নামধেয় গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিশাস্ত্র-মতে শাক্ত-ভাব অর্থাৎ কুলাচারের সাধনাই আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

পূর্ব্বে যেমন সাধকের অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-দেহে সিদ্ধব্রজলোকে সাক্ষাদ্ভজনের প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ সাধকের গুণময় প্রাকৃত দেহদ্বারা রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভজনের উপায়ই কুলাচার প্রথা। সখীভাব-

লুব্ধ সাধক শ্রীগুরুকে বৃন্দাবনেশ্বর, অভিলষিত যে কোন রমণীকে বৃন্দাবনেশ্বরী এবং যথাবিহিত স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন মনে করিয়া, সখীরূপে প্রাকৃত দেহদ্বারা সাক্ষাৎভজন করিবে। আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে রাধারূপে কল্পনা করা যায়; কিন্তু স্বকীয়া রমণীতে উচ্চনীচ জ্ঞান থাকা বিধায় এবং লোক-ধর্ম্ম অপেক্ষা থাকায় তদীয় প্রেম তরল; আর সমাজ-বিরুদ্ধ বশতঃ পরকীয়া নারীতে প্রেমের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সহজেই বিকশিত হয় এবং লোকলজ্জা, ভয়-ঘৃণা, বেদ-বিধি অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ যাঁহাকে প্রেমের গুরু রাধারূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহারও গোপী-স্বভাব প্রাপ্তির জন্য একান্ত অনুরাগ থাকা চাই; সুতরাং সাধিকা রমণীর প্রয়োজন। নতুবা প্রাকৃতকামাসক্ত নারীর সঙ্গে পুরুষের অধোগতিই হইয়া থাকে। অতএব আপন স্বভাবানুরূপ নারী অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে। চণ্ডীদাসের আশ্রিতা সাধক-গোপী শ্রীমতী রামমণি রজকিনী।—চণ্ডীদাস বলিয়াছেন;—

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাধিকা রমণীকে শ্রীরাধারূপে আশ্রয় করিবে। তাহা হইলে কি হইবে?—

যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভব নদী হয় পার॥

এইরূপ গোপ্যনুগতা রমণী ব্যতিরেকে পুরুষান্তর রতা সমুদায় রমণীই ব্যাভিচারিণী। ব্যাভিচার-দুষ্টা রমণীরা স্বয়ং ঘোরতর অধর্ম্মের পঙ্কে নিমগ্ন হয় এবং স্বসঙ্গীকেও আত্মবৎ কলুষিত করে। এই হেতু এতাদৃশ রমণীসংসর্গে পুরুষের মুক্তিমার্গ উদ্ঘাটিত হয় না, নরকের পথই প্রশস্ত হয়। চণ্ডিদাস বলিয়াছেন ;—

ব্যাভিচারী নারী, না হয় কাণ্ডারী,
নায়িকা বাছিয়া লবে।
তার আবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ ধরম যাবে॥

কৃষ্ণকার্য্য ব্যতিরেকে যে রমণীর দেহেন্দ্রিয়ের আর অন্য কার্য্য সাধনের অবসর নাই, কৃষ্ণলীলা চিন্তা ব্যতিরেকে যে রমণী হৃদয়ের আর বিষয়ান্তর চিন্তার অবকাশ নাই, যে রমণীর দেহ, মন, প্রাণ শ্যামসুন্দরের পরম প্রেমে বিভাবিত ; সেই রমণী, গোপীভাব লাভেচ্ছু সাধকের উপযুক্তা সহচরী। সুতরাং গোপীত্ব লাভ করিতে হইলে, ঐরূপ রমণীকে যেরূপ গোপীজনোচিত ভাব ও আচরণের অনুকরণ করিতে হইবে, পুরুষ সমূহকেও সেইরূপ ভাবাদির অবলম্বন করিতে হইবে।

এই ভাব-সাধনার জন্য বাঙ্গলার বাবাজীদিগের গৃহে একাধিক বৈষ্ণবীর সমাবেশ দেখা যায়। এই বৈষ্ণবী, বাবাজীদিগের সেবাদাসী নহে ; তাহাদিগের প্রেম-শিক্ষাদাতাগুরু—শ্রীমতী রাধিকা। কাম-কাননাসক্ত বর্ব্বর, উচ্চাধিকারীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে এই দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক গোপীত্বলাভ করিতে হইলে ভক্তগণের শাস্ত্রীয় লক্ষণাক্রান্ত ও স্বকীয় ভাবানুগত, নায়িকা বাছিয়া লইতে হইবে। পরে তাঁহাকে শ্রীমতী রাধা মনে করিয়া, তাঁহাকে লইয়া সখীর ন্যায় শ্রীগুরুর

সাক্ষাৎসেবা করিবেন। তিনি যেরূপ সাধকরূপ বহির্দ্দেহে সমুচিত দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের বহিরঙ্গ সেবা করেন, তদ্রূপ অন্তশ্চিন্তিত-গোপীদেহে, তদুপযোগী দ্রব্যাদি সহযোগে, নিত্য-সখীর ন্যায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। এইরূপ সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে, ভক্তের ক্রমশঃ গুণময়ভাব ক্ষয় হইয়া অন্তশ্চিন্তিতগোপীদেহের পুষ্টি হইতে থাকে। প্রেমের পরিপাক দশায় যখন অনুগমমান ভক্ত ও তদাশ্রিতা সাধকগোপী, অন্তর্জ্জগতে সিদ্ধদেহে, সম্পূর্ণ একতাভাব প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় মন্দিরে, প্রেম-শৃঙ্খলে চিরবন্দী করিয়া, তাঁহার রাসাদি নিত্যলীলা-পারাবারে চির-নিমগ্ন হন। ভক্ত এইরূপ গোপীঅনুগতি দ্বারা গুণময়দেহের অবসানে, প্রেমময় গোপীদেহে নিত্যবৃন্দাবনের রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হন। চণ্ডীদাসকে বাশুলী দেবী ইহাই বলিয়াছিলেন ;—

বাশুলী কহিছে কহি তব হিত, মরিয়া হইবে রজক ঝি।
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হইবে। এক দেহ হ'য়ে নিত্যেতে যাবে।
সেবাতে সন্তুষ্ট করিল যে শ্রীরূপমঞ্জরী পাইল সে॥
কভু জল কভু তাম্বুল যোগায়। কভু শ্রীঅঙ্গে বসন পরায়।
সখীদেহ ধরি সেবাতে গেল ; রাধাকৃষ্ণ দোঁহে ব্রজেতে পেল।

এইরূপ সাধনায় ভক্তের সিদ্ধগোপীদেহের প্রকাশ হইলে, তখন তাঁহার প্রেম-নেত্রে, সেই আশ্রিতা সাধক-গোপীই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং স্বকীয় আত্মস্বরূপও তদনুগত তৎপ্রতিবিম্বরূপে প্রতীত হয়।

নিত্যসখীগণ যেরূপ রাধা-ধ্যান, রাধা-জ্ঞান, রাধা-প্রাণ ও রাধা-অনুগত হইয়া ব্রজেশ্বরীর সেবা করিয়া থাকেন ; তদ্রূপ ভক্ত আশ্রিতা-নায়িকানিষ্ঠ হইয়া রাধা-জ্ঞানে কায়মনোপ্রাণে তাঁহার সেবা করিবেন। নায়িকানিষ্ঠ হইয়া এইরূপ সাধনকে অস্মদ্দেশের লোক—

"কিশোরী ভজন"

আখ্যা দিয়া থাকে। কিরূপে কিশোরীভজন করিবে? চণ্ডীদাস বলিয়াছেন ;—

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী চরণ সার॥
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে,
কিশোরী নয়ন তারা।
যে দিকে নিরখি, কিশোরী দেখি,
কিশোরী জগৎ ভরা॥

রমণীর দ্বিতীয় পুরুষ-সংসর্গে যে দোষ হয়, পুরুষের দ্বিতীয়রমণী সংসর্গেও সেই দোষ উৎপন্ন হয়; সুতরাং পুরুষান্তররতা ব্যাভিচারিণী রমণী যেমন সাধনের যোগ্যা নহে, দ্বিতীয় রমণীতে আসক্ত ব্যাভিচারী পুরুষও সেইরূপ উপযুক্ত নহে। সুতরাং গুরুকৃপামাত্র নায়কনায়িকা পরস্পর অনুরক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুধ্যানে ও তাঁহাদিগের মধুর-লীলা কথোপকথনে রত থাকিয়া নিয়ত আনন্দসাগরে অবস্থিতি করেন। তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ে স্বাভীষ্ট গোপীস্বরূপের কল্পনা করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ব্রজদেবীর ন্যায় পরস্পরের মধুর সেবা পরিচর্য্যাও করেন। কিন্তু সর্ব্বদা রমণীনিষ্ঠ হইয়া থাকিলে আসঙ্গলিপ্সা অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কাম-কলুষিত আসক্তির পরিণাম ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণময় মায়িক কার্য্যদ্বারা কামাসক্তি কদাপি পবিত্র ভগবৎপ্রেমে পরিণত হইতে পারে না। এইরূপ নায়ক-নায়িকা, ইন্দ্রিয় পরিতর্পণের আশায়

কেবল ইন্দ্রিয়সুখ-দাতৃজ্ঞানে পরস্পর আসক্ত হইয়া, কামানলে আত্মাহুতি প্রদান করে—নরকের পথ প্রসারিত করে। ইহাতে জীবের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়—আধ্যাত্মিক শ্রী নষ্ট হয় এবং দেহ-মন অকর্ম্মণ্য এবং ভক্তি বিনষ্ট হয়। অতএব নায়িকা-নিষ্ঠ ভক্ত সংযত হইয়া সাধক-গোপীর সেবা করিবেন। কিরূপে সেবা করিতে হইবে?—

স্নান যে করিব, জল না ছুঁইব,
এলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব, নীরে না ভিতিব,
নাহি দুঃখ শোক ক্লেশ।
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা।

তবে যাঁহারা রামানন্দ রায়ের ন্যায় সংযত, প্রেমের সাধনায় কাম-ভস্মীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা নায়িকা সঙ্গে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। রামানন্দ রায়—

এক দেবদাসী আর সুন্দর তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

এইরূপে সেবা করিয়াও ইন্দ্রিয়বিকারে কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চল হইতেন না। সেইরূপ নির্বিকারভক্ত যথেচ্ছভাবে আশ্রিতা সাধক-গোপীর সেবা করিতে পারেন। আর যাঁহারা—

রস পরিপাটী, স্থবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে,
উছলিয়া বহি যায়॥

এইরূপে প্রেমনন্দভাবে সম্ভোগ করিতে পারেন, তাঁহারা শৃঙ্গারাদি দ্বারাও গোপীর সেবা-পরিচর্য্যা করিবেন। যাঁহারা সাধক-গোপীর সহিত শৃঙ্গার রসাত্মকসাধনাবলম্বনে শুক্রের অধোস্রোত রুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা রতি-রসে মত্ত হইলেও ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্তু তাহা সাধন-সাপেক্ষ; পাঠক! আমি "জ্ঞানীগুরু" গ্রন্থের সাধন কল্পে, "নাদবিন্দু যোগ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সাধন-প্রণালী ব্যক্ত করিয়াছি, তাহার নাম বিন্দু সাধন। কিন্তু এই—

"শৃঙ্গার-সাধন"

সেরূপ নহে, ইহা শুক্র-পরিপাকরূপ ধাতব সাধনের তাপ-প্রয়োগ মাত্র। যেরূপ ইক্ষুরস অগ্নি সন্তাপে ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া গুড়-শর্করাদি অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে নির্ম্মল এবং গাঢ়তম ওলায় পরিণত হয়, সেরূপ চরম-ধাতুও শৃঙ্গারের প্রেম সন্তাপে ক্রমশঃ গাঢ় ও কাম-সম্বন্ধ শূন্য হইয়া

পরিশেষে নির্ম্মল ও গাঢ়তম ভগবৎ-প্রকাশক বিশুদ্ধ সত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়। এই সাধন-প্রণালী যার পর নাই গুরুতর এবং সাতিশয় ভয়ঙ্কর। সুতরাং শৃঙ্গার-সাধনে অধিকার লাভ না করিয়া কেহ কদাচ তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না। সাধনার ক্রম এইরূপ ;—

পাঠক! সুষুম্না নাড়ীর ছয়টী স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোপযোগী ছয়টী স্নায়ুকেন্দ্র রহিয়াছে। সেই ছয়টী স্নায়ুকেন্দ্রই শাস্ত্রোক্ত ষট্ চক্র। * সুষুম্নার অধোমুখস্থিত সর্ব্বাধঃ স্নায়ুকেন্দ্রই মূলাধার এবং ঊর্দ্ধ প্রান্তস্থ সর্ব্বোর্দ্ধ স্নায়ুকেন্দ্রই আজ্ঞাচক্র। এই আজ্ঞাচক্রই বুদ্ধি বা চেতনা-শক্তির বাসস্থান। ঊর্দ্ধে মহাকাশে চিদানন্দময় সহস্রদল কমল অবস্থিত। ইহা সমুদায়দেহ-ব্যাপক হইলেও, মস্তিষ্কস্থিত চেতনা-শক্তির আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন কেবল উর্দ্ধতা মাত্র অপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বোপরি কল্পিত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ও মেরু-মজ্জার সারভূত রসই শুক্র ; এই হেতু শুক্রকে মজ্জারস বলে। ইড়ানাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাত্মক স্নায়ুসমূহ যেরূপ রস, রক্তাদি শারীরিক উপাদান হইতে নিয়ত শুক্রকণাসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক, তৎসমুদায় মস্তিষ্কে আনয়ন করিয়া, তাহার পুষ্টি সাধন করিতেছে, পিঙ্গলা নাড়ীর অন্তর্গত কর্ম্মাত্মক স্নায়ুসমূহও সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে শুক্রকণা গ্রহণ পূর্ব্বক, নিয়ত তৎসমুদায় দেহেন্দ্রিয় কার্য্যে ব্যয় করিয়া, তাহার ক্ষয় সাধন করিতেছে। কিন্তু সাধারণ দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারে শুক্র অণুমরিমাণে ধীরে ধীরে ক্ষয়িত হয় বলিয়া সুস্পষ্ট বুঝা যায় না, কেবল শৃঙ্গার-ক্রিয়াতেই ইহা অধিক পরিমাণে সত্বর ব্যয়িত হয় বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। নরনারীর

---

* ষট্চক্র, নাড়ী ও বায়ুর কথা প্রভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থে, বিন্দু সাধনার উপায় "জ্ঞানী-গুরু" গ্রন্থে এবং বিন্দু ধারণের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঐ উভয় গ্রন্থেও "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক শৃঙ্গারে বিক্ষুব্ধ হইলে, তাহা হইতে শুক্রসমূহ নিঃসৃত হইয়া, পিঙ্গল নাড়ীর অন্তর্গত কর্ম্মাত্মক স্নায়ু সমূহ কর্তৃক প্রথমতঃ সুষুম্না-মুখে উপস্থিত হয়, পরে তত্রত্য কাম-বায়ুর প্রতিকূলতায় উহা অধোগামিনী নাড়ী অবলম্বন করিয়া মূত্র-নাড়ীপথে বহির্গত হয়। যদি তৎকালে পিঙ্গলানাড়ী বহমান থাকে, তাহা হইলে শুক্রের এই অধঃপ্রবাহের বেগ অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। শুক্ররাশি অনুকূলবায়ু পাইয়া, প্রবলবেগে বহির্গত হয়; সুতরাং দক্ষিণদেশস্থিত পিঙ্গলানাড়ীতে বহমান বায়ু প্রেমসাধনের অনুকূল নহে।* শৃঙ্গারে যখন পিঙ্গলানাড়ীর অন্তর্গত কর্ম্মাত্মক স্নায়ু-সমূহ কর্তৃক শুক্ররাশি বাহিত হইয়া সুষুম্নামুখে উপস্থিত হয়, তখন গুরূপদিষ্ট উপায়ে অধোগতি-পথ অবরুদ্ধ হইলে, উহা ইড়ামুখে প্রবিষ্ট হইয়া, তন্মধ্যস্থ জ্ঞানাত্মক স্নায়ু-সমূহ কর্তৃক পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া থাকে।

গুরূপদিষ্ট প্রণালীটী আর কিছুই নহে, প্রাণায়াম। তবে যোগশাস্ত্রোক্ত প্রাণায়াম হইতে ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে প্রথম রেচন, তৎপরে পূরণ এবং শেষে কুম্ভক করিতে হয়। শৃঙ্গারাসক্ত হইয়া, প্রথমতঃ অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম নাসাপুট রোধ করতঃ ষোড়শ বার মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিয়া, দক্ষিণ নাসাপুট বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা রোধ করতঃ দ্বাত্রিংশৎবার মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে। তৎপরে উভয় নাসাপুট রোধ করতঃ চতুঃষষ্টিবার মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ুস্তম্ভন করিলে, সুষুম্নামার্গ প্রচ্ছন্ন থাকে না, তাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়া চিজ্জগৎ প্রকাশিত করে। ইহা দ্বারা শৃঙ্গারে ধাতু রক্ষায় সমর্থ হওয়া যায়। পূর্ব্বে

* দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে, যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে, সহজ পাইবে তবে॥

সম্যক্‌রূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া, তাহাতে পরিপক্ক হইলে, শৃঙ্গার সাধন আরম্ভ করিতে হয়। *

শৃঙ্গার-সাধনায় পূরণকালে শুক্র ইড়ানাড়ী-পথে পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া থাকে। তৎকালে ইড়ানাড়ী বহমান থাকায় শুক্রের এই উর্দ্ধ-প্রবাহের বেগ অধিকতর বর্দ্ধিত হয়, শুক্ররাশি অনুকূলবায়ু পাইয়া, অনায়াসে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। সুতরাং ইড়ানাড়ীতে শ্বাসবহন কালে শৃঙ্গার সাধন করিবে, কারণ ইড়া নাড়ীতে বহমান বায়ু প্রেম-সাধনে অনুকূলতা করে। † যাঁহারা শৃঙ্গার-সাধনে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শৃঙ্গারে মস্তিষ্ক হইতে শুক্ররাশি পিঙ্গলামার্গে সুষুম্নার মুখে উপস্থিত হইলে, যখন চেষ্টা সহকারে তাহাকে ইড়া-মার্গে পুনরায় মস্তিষ্কে প্রেরণ করিতে হয়, সেই সময় তাঁহারা প্রকৃত শৃঙ্গার-রস-আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। ক্রমশঃ গুরূপদিষ্ট সাধন প্রভাবে সুষুম্নাদ্বারস্থ কাম-বায়ুকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া, শুক্রের অধোগতিপথ রুদ্ধ করিতে হয়; তখন প্রেমময় শৃঙ্গারে মস্তিষ্ক হইতে শুক্ররাশি পিঙ্গলাপথে সুষুম্নার মুখে উপস্থিত হইয়া, বিনা আয়াসে স্বতঃই ইড়াপথে পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত হয়, সেই সময় প্রকৃত পক্ষে শৃঙ্গাররস আস্বাদ করা যায়।

এইরূপে নায়ক-নায়িকা যখন প্রেমময় শৃঙ্গারের অনুষ্ঠানে ধাতুরাশি মন্থন করিয়া, তাহা হইতে চিদানন্দময় সহস্রদল কমলকে প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই ধাতু-সরোবরে যুগপৎ দুইটী প্রবাহের উদয় হয়।

* মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" ও "জ্ঞানীগুরু" গ্রন্থদ্বয়ে প্রাণায়াম ও তাহার সাধন-প্রণালী বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে। প্রবর্ত্ত-সাধক প্রথমতঃ উক্ত পুস্তকদ্বয় দৃষ্টে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

† যখন সাধন, করিবা তখন, ইড়ায় টানিবা শ্বাস।
তাহ'লে কখন, না হবে পতন, জগৎ ঘোষিবে যশ ॥

তাঁহাদিগের ধাতুময় মস্তিষ্ক হইতে ধাতুরাশি নিঃসৃত হইয়া, যেরূপ এক-দিকে পিঙ্গলামার্গের অন্তর্গত কর্ম্মাত্মক স্নায়ুসমূহ দ্বারা সুষুম্না-মুখে উপস্থিত হয়, সেইরূপ অন্য দিকে সেই সুষুম্না-মুখস্থিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে প্রবিষ্ট হইয়া, তদন্তর্গত জ্ঞানাত্মক-স্নায়ুসমূহ দ্বারা পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত হয়। সুতরাং তৎকালে সাধক নর-নারীর ইড়া ও পিঙ্গলা এবং তদন্তর্গত উর্দ্ধ-গামী ও অধোগামী ধাতু-প্রবাহদ্বয় সম্মিলিত হইয়া একাকার হয়। ইড়া ও পিঙ্গলা সম্মিলিত হইলেই তদুভয়াত্মক সুষুম্নামার্গ উদ্ঘাটিত হয়, সহস্রার হইতে মূলাধারে চিচ্ছক্তি প্রকটিত হইয়া, অষ্টদলকমলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাই রসিক শিরোমণি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

দুই ধারা যখন একত্র থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে॥

এই হেতু সেই সময় প্রেমিক নর-নারী নিত্য-প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তনশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভেদাভেদস্বরূপ অবলোকন করিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হন—তাঁহাদিগের অনুরূপদশা লাভ করেন। নিষ্কামভক্ত নর-নারী প্রেম-ময়-শৃঙ্গারে চিচ্ছক্তির সার-সর্ব্বস্ব হৃদয়-কমলে প্রাপ্ত হইয়া, যাবতীয় ভেদ-জ্ঞান বিসর্জ্জন করেন, কোনও এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। তাঁহাদিগের এই প্রেমবিলাসসুখ লৌকিক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, শাস্ত্রযুক্তিরও বহির্ভূত। নিত্য প্রেমবিলাস বিবর্ত্তনশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমানন্দময় ভাব কিরূপ ব্যাপক ও মহান্, তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতে পারেন। এই হেতু, কেবল তাঁহারাই অনুরূপ প্রেমময় শৃঙ্গারে সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় বস্তুকে হৃদয়কমলে আনয়ন করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ করেন। এইরূপ যাবতীয় দেহেন্দ্রিয়-সাধ্য প্রেমসাধন হইতে তাঁহাদিগের সমুদায় দেহেন্দ্রিয়ই উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় গোপীস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ দুইখণ্ড কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষিত হইলে, তন্মধ্যস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নি আত্ম-

প্রকাশ করিয়া, তদুভয়কে অগ্নিময় করে, সেইরূপ শৃঙ্গারসাধন-পরায়ণ নর-নারীর মস্তিষ্ক-গুপ্ত-চিচ্ছক্তি প্রেমময় শৃঙ্গারে সমুদায় স্নায়ুময় কেন্দ্রে প্রকটিত হইয়া, তাঁহাদিগকে চিদানন্দময় স্বরূপ প্রদান করেন।

সুষুম্নামুখাগত শুক্ররাশি অধোমার্গে নিঃসৃত হওয়াই মানব সাধারণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনই শৃঙ্গাররসের প্রথম সোপান। এই হেতু যাঁহারা শৃঙ্গার-সাধনে প্রথম প্রবর্ত্তিত হন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সুষুম্না-মুখে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে ইড়া-মার্গে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অনায়াসে কৃতকার্য্যও হন। শুক্রের উর্দ্ধপ্রবাহ সিদ্ধ হইলে ভক্ত অনর্থের হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া, নিষ্ঠাগুণ লাভ করেন—প্রেমভক্তিদেবীর করুণারূপ অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। এই-হেতু ইহাকে প্রবর্ত্ত-ভক্তের কারুণ্যামৃতধারায় স্নান কহে। শৃঙ্গারে রতি স্থির হইলেই, সাধকের উর্দ্ধগত মস্তিষ্কস্থিত শুক্ররাশি সহজে পিঙ্গলাপথ অবলম্বন করিয়া, সুষুম্না-মুখে অবতীর্ণ হয় না; অথচ তাহাকে অবতারিত করিতে না পারিলেও প্রেমানন্দলাভের উপায় নাই। এইহেতু সাধকগণ যত্নসহকারে মস্তিষ্কস্থিত সাধন-পক্ক শুক্ররাশিকে পিঙ্গলামার্গ-যোগে সুষুম্না-মুখে আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের আজ্ঞাচক্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত যাবতীয় স্নায়ুকেন্দ্রেই সহস্রারস্থিত প্রেমানন্দ-প্রবাহে প্লাবিত হয়, তাঁহা-দিগের সমুদায় দেহেন্দ্রিয়ই প্রেমরসে পুষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণভোগ্য তারুণ্য প্রাপ্ত হয়। এইহেতু ইহাকে সাধক-ভক্তের তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান কহে। এই সাধকাবস্থার সাধন হইতেই সাধক-নরনারীর শুক্র সরোবরের উর্দ্ধাধঃ প্রবাহ স্বভাবসিদ্ধ হয়, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মুখ সংযুক্ত হয় এবং সুষুম্না মার্গ উদ্ঘাটিত হয়। তাই তাঁহারা প্রেমময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সহজপ্রেমে সিদ্ধশৃঙ্গার-রস আস্বাদ করেন, এই সময় সিদ্ধভক্ত লাবণ্যা-মৃত ধারায় অভিষিক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-প্রাপ্ত হন।

সহজ ভাবে সহজ প্রেম-রসের আস্বাদন সিদ্ধভক্তের সিদ্ধদশার সহজ সাধন। এইহেতু নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার সাধনকে "সহজ ভজন" বলে। স্বভাবানুগত সাধনকে **"সহজ সাধন"** বলা যাইতে পারে। একজন ভোগ ভালবাসে, তাহাকে যোগপন্থা প্রদান করিলে তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু ভোগের ভিতর দিয়া যোগপথে উন্নীত করিতে পারিলেই তাহা স্বভাবানুগত হওয়ায় **"সহজ"** আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মানুষ, প্রাকৃত নর নারীও মানুষ; কিন্তু প্রাকৃত নরনারী যেরূপ মায়ার গুণরাগে রঞ্জিত বিকৃত মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ বিকৃত মানুষ নহেন; তিনি শুদ্ধ ও নিত্য-মানুষমণ্ডলীরও আরাধ্য স্বতঃসিদ্ধ মানুষ। তাই তাঁহাকে সহজমানুষ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সহজ মানুষ, তদীয় নিত্য-পারিষদ গোপ-গোপীগণও সহজ মানুষ। মানুষধাম নিত্য-বৃন্দাবনে সহজমানুষ শ্রীকৃষ্ণ সহজমানুষ গোপ-গোপীগণের সহজ-প্রেমে চির-ঋণী হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত নিত্য মানুষলীলা করিতেছেন। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন;—

গোলক উপর, মানুষ বসতি,
তাহার উপর নাই।
মানুষ ভাবেতে, বসতি করিলে,
তবে সে মানুষ পাই॥

এই মানুষধামের মানুষলীলায় মানুষব্যতিরেকে আর কাহারও অধিকার নাই। যাঁহারা মানুষের অনুগত হইয়া, নিয়ত মানুষাচার করেন, কেবল তাঁহারাই মানুষ হইয়া, এই মানুষ লীলার অধিকারী হন। সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ মানুষরূপে মানুষমন্ত্র প্রদান করেন, মানুষরূপে মানুষাচার শিক্ষা দেন, আবার মানুষরূপে মনপ্রাণ হরণ করেন। তাই প্রাকৃতমানুষ সহজমানুষের

সহজ ভাবের অধিকারী হইয়া স্বরূপে সহজ মানুষের ভজনা করেন। সহজ ভাবে সহজমানুষের এইরূপ সাক্ষাৎ উপাসনাকেই সহজ ভজন কহে।

নিত্য বৃন্দাবনে দাস, সখা, গুরু (পিতামাতাদি), কান্তা এই চতুর্ব্বিধ মানুষ, সহজমানুষ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধ সেবক। জগতেও তাঁহার এইরূপ চারিভাবের চারিপ্রকার সাধক-মানুষ বর্ত্তমান আছে। এই চতুর্ব্বিধ সাধক মানুষের চতুর্ব্বিধ সাক্ষাৎ উপাসনাই সহজ ভজন; কিন্তু রসিক-ভক্তগণ মধুররসের অন্তরঙ্গসাধক, তাই, তাঁহারা মধুররসের সাক্ষাৎ উপাসনাকেই "সহজ ভজন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী, তাঁহাকে তপ, জপ ছাড়াইয়া সর্ব্বসাধ্য শ্রেষ্ঠ সহজভজনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যথা :—

বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে॥

অতএব নায়ক—নায়িকার শৃঙ্গাররসাত্মক সাধনই সহজ ভজন। প্রাপঞ্চিক নরনারীও গোপীদিগের ন্যায় সহজমানুষ। তাহারাও গোপীদিগের ন্যায় সহজমানুষ-শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদাভেদে বর্ত্তমান। কেবল আবরিকা মায়াশক্তির আবরণ বশতঃ তাহারা আত্মস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ভেদাভেদ উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় যখন সহজমানুষ

শ্রীকৃষ্ণ, রমমাণ নর-নারীর হৃদয়কমলে বিদ্যুদ্বিলাসবৎ প্রকাশমান হন, তখন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তাহাদিগের স্বরূপাচ্ছাদিকা মায়াকে অন্তর্হিত হইতে হয়। তাই, তৎকালে তাঁহারা নিমেষ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদাভেদ অন্বিত নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হন—মুহূর্তমাত্র অভেদাংশে "ত্বমহং" জ্ঞান বিসর্জ্জন করিয়া, বিভেদাংশে আনন্দময় মূর্ত্তিতে কৃষ্ণস্বরূপ আস্বাদন করেন। প্রাকৃত নর-নারী কামময় শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় নিমেষমাত্র যে সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় কমলে প্রাপ্ত হইয়া, নিমেষমাত্র স্বয়ং সহজমানুষ হয়, প্রেমময় শৃঙ্গার সাধনে সেই সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়কমলে চিরবন্দী করিয়া ভক্ত স্বয়ং সহজমানুষ হইয়া যান। তাই, সহজ-ভজনশীল রসিক নায়ক-নায়িকা নিয়ত অটলসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রেমময় শৃঙ্গারের অনুষ্ঠানে নিয়ত হৃদয়-কমলে সহজমানুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রকটন করেন। তাই রসিক ভক্ত গাহিয়াছেন,—

যে রস-রতি করেছে সাধ্য,
র'য়েছে তার জগৎ বাধ্য।

প্রাকৃত নর-নারী শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় ধাতুবিসর্জ্জনকালে, যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মুহূর্ত্ত ভোগ করেন, সাধকনায়ক-নায়িকার সিদ্ধাবস্থায় তাহার কোটিগুণ আনন্দ সদাসর্ব্বদাই তাঁহারা ভোগ করিয়া থাকেন। সহজমানুষ শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপীপ্রেমে ঋণী, কেবল গোপীহৃদয়ে প্রেম-শৃঙ্খলে বন্দী। তাই, সহজ ভজনপরায়ণ নর-নারী সহজ ভজনে গোপীর দশা লাভ করিলেই, প্রেমশৃঙ্খলে সহজ-মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিয়া এবং স্বয়ং সহজমানুষ হইয়া, নিত্য বৃন্দাবনে গমন করেন।

শৃঙ্গার-সাধনে সাধকদম্পতী অনায়াসে বিন্দুসাধনায় আত্মরক্ষা করিতে পারেন বটে; কিন্তু শৃঙ্গারে আত্মরক্ষণমাত্রই গোপীত্ব লাভ ঘটে না। পরম পাবন ভগবৎ-যশঃকীর্ত্তনে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মনোমালিন্য তিরোহিত

হইয়া পবিত্রতার উদয় হয়। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আসক্তি করিয়া, পরস্পরের নিকট হইতে নির্ম্মল ভক্তসঙ্গোত্থ সুখ প্রাপ্ত হন। সুতরাং ভক্তিপ্রতিকূল ইন্দ্রিয়-সুখভোগ হইতে স্বতঃই তাঁহাদিগের বিরতি জন্মিয়া আইসে। যথা :—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২

নায়ক-নায়িকা এইরূপ শৃঙ্গাররসাত্মক সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া, ভক্তিপ্রতিকূল অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করেন, শৃঙ্গাররসাত্মক সেবার চরমধাতু রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলেই প্রাকৃতকাম বশীভূত হয়, চিত্তের স্থৈর্য্য সংঘটিত হয়। তদবস্থায় প্রিয়জনসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃকরণের আর পাত্রান্তরে অনুরক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে প্রেমিকদম্পতি পরিণামে পরস্পরের শ্রীচরণে নিষ্ঠা-ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ নিষ্ঠাবান্ নায়ক-নায়িকা, পরস্পরকে অত্যধিক রূপ-গুণসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করেন— পরস্পরকে সর্ব্বোত্তম কান্ত বলিয়া প্রতীতি করেন। তখন, তাঁহারাই সর্ব্বদা পরস্পরের সংসর্গবাঞ্ছা করেন, অনুক্ষণ দর্শনাদির অভিলাষ করেন। সুতরাং নিষ্ঠা হইতে কালক্রমে তাঁহাদিগের হৃদয়ে রুচির সঞ্চার হয়। রুচি জন্মিলে তাঁহারা পরস্পরের গুণ দোষের প্রতি আর লক্ষ্য করেন না, কেবল পরস্পরের সুখময় সংসর্গ ই অভিলাষ করেন। স্বাভিলাষ-সংসর্গ ই আসক্তির একমাত্র জনক, সর্ব্বত্র রুচিকর সংসর্গ হইতেই আসক্তি-সঞ্চার দৃষ্ট হয়। এই কারণে, রুচিসম্পন্ন রাগানুগীয় ভক্ত-দম্পতি, পরস্পরের অভিলাষময় সংসর্গ হইতে কালক্রমে অত্যাসক্তির অধিকারী হন।

আসক্তি জন্মিলে, তাঁহারা পরস্পরকে কোন এক অতুলনীয় সুমধুর পদার্থ বলিয়া অনুভব করেন ; প্রিয়জনের দোষ 'গুণ' বলিয়া উপলব্ধি করেন। এই অবস্থায় তাঁহারা কুলধর্ম্মলজ্জাধৈর্য্যাদি সমুদায় ভুলিয়া পরস্পরের ভজনা করেন—প্রিয়জনের সুখ-সাধনের জন্য সকল প্রকার আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন করেন। এইরূপ অত্যাসক্ত নায়ক-নায়িকার কালক্রমে প্রীতির সঞ্চার হয়। ইহাই গোপিকানিষ্ঠ সমর্থারতি ; জাতরতি নায়ক-নায়িকা, পরস্পরকে মূর্ত্তিমান আনন্দ বলিয়া অনুভব করেন, পরস্পরের স্মরণ-মননে আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন। এই অবস্থায় তাঁহাদিগের দেহেন্দ্রিয়সুখ যেন পরস্পরের দেহেন্দ্রিয়-সুখের সহিত মিলিয়া যায় ; অথচ উভয়েই, নিয়ত উভয়ের সুখ সম্পাদনে রত থাকিয়া,প্রিয়জন হইতে কোটিগুণ সুখ উপভোগ করেন। এই প্রীতিই, তাঁহাদিগের প্রেম-বিলাসে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, পরিণামে প্রেমস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। শাস্ত্রেও তাহা উক্ত আছে। যথা :—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া,
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

রাগানুগীয় শ্রদ্ধাবান্ সাধকদম্পতির ভক্তিই, সাধনার এইরূপ ক্রমানুসারে পরিপুষ্ট হইয়া, গোপিকানিষ্ঠ নির্ম্মল প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। অঙ্গারে শর্করা আছে, অথচ উহা শত ধৌত হইলেও শর্করায় পরিণত হয় না কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে অঙ্গার পরিষ্কৃত হইলে, উহা পরিশেষে মিষ্টতঃ শর্করায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। সেইরূপ প্রাকৃতনর-নারীর কলুষময়

শৃঙ্গারে ও পঙ্কিল কামে ভগবানের প্রেমানন্দাস্বাদ থাকিলেও, তাহারা উহার অনুভব করিতে পারে না, কাজেই কদাপি তাহারা ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে সক্ষম হয় না; কেবল এক মাত্র, প্রেমিকদম্পতীর গুরূপদিষ্ট শৃঙ্গার-রসাত্মক সাধনভক্তিবলে প্রেমলাভ হইয়া থাকে। এই প্রেম পরিপাক দশায় স্বকীয় উজ্জ্বল প্রেমরসবৃত্তি প্রকাশ করে। সাধকদম্পতী ইহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনুভব করেন, তাঁহার উজ্জ্বলপ্রেমরস আস্বাদন করেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের মনশ্চিন্তিতাভীষ্ট গোপীই, সিদ্ধদেহরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহারা বাহিরে মায়াময়-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, অভ্যন্তরে গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা মায়াময়দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তাহাদিগের চিত্তগত ভাবের পরিপাকানুসারে, যেরূপ ক্রমশঃ সিদ্ধগোপীদেহ পুষ্ট হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ মায়াময় দেহেরও অবসান ঘটে। পরিশেষে মায়িক দেহের অবসানে, সাধকদম্পতী কেবল আনন্দঘনস্বরূপে বিরাজ করেন। এই সাধনলভ্য-গোপীদেহ গুণময়ী মূর্ত্তিবিশেষ নহে, উহা আনন্দঘন বিগ্রহ। জড়দেহের যেমন স্বগত ভেদ আছে, চিদানন্দঘন-বিগ্রহের সেরূপ স্বগত ভেদ নাই। সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ গোপীদেহ, জড়মূর্ত্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিসম্পন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট নহে, উহা সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-সম্পন্ন ও স্বগত ভেদবর্জ্জিত কেবলানন্দময়ী মূর্ত্তি। * এই কারণে গোপী-কৃষ্ণের সম্মিলন প্রাকৃত নর-নারীর সম্মিলন নহে, উহা সর্ব্বাঙ্গীন সম্ভোগ। সাধক-দম্পতী এইরূপে গোপীদেহ লাভ করিলে আপনাদিগকে কেবল আনন্দময়ী কৃষ্ণপ্রিয়া বলিয়াই অনুভব করেন, নচেৎ কোন অভিনব দেহধারী বলিয়া প্রতীতি করেন না। ফলতঃ জাতরতিভক্ত গোপীজনোচিত মনোবৃত্তি-

* অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি' ও "আনন্দমাত্রকরপাদনখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা" গোপীস্বরূপও তদ্রূপ।

সমূহ লাভ করেন, গোপীজনের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন সম্ভোগরসাভাস উপলব্ধি করেন। তাই, তিনি গোপী। এতদ্ব্যতিরেকে ভক্তহৃদয়ে কোন পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ উদিত হয় না।

জাতরতি রসিক-দম্পতী যেরূপ স্বস্ব আত্মস্বরূপকে নবগোপী বলিয়া উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ পরস্পরকেও প্রেমানন্দময়ী গোপী বলিয়া অনুভব করেন। তাঁহারা পরস্পরের গোপীজনোচিত ভাব-চেষ্টা-মুদ্রা দেখিয়া উভয়ে উভয়কে নিত্যসিদ্ধ সখী বলিয়া নিরূপণ করেন। তাঁহাদিগের চিত্তগত ভাব প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উজ্জ্বলাখ্য প্রেমস্বরূপে পর্য্য-বসিত হয়। এইরূপ প্রেমোদয় হইলে, যখন তাঁহাদিগের সিদ্ধগোপীদেহ সম্যক্ পরিপুষ্ট হয়—উন্মুখ-যৌবনা কান্তার ন্যায় পতি সংসর্গের যোগ্যতা জন্মে, তখনই তাঁহাদিগের সেই প্রেমপুষ্টদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনু-রাগ, মহাভাব প্রভৃতি উজ্জ্বলরসাত্মক প্রেমবিলাসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। চিচ্ছক্তি এই সময়ে তাঁহাদিগের প্রেমনেত্রসম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের মহান্তঃ-পুরের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন—তাঁহাদিগকে সমগ্র বৃন্দাবনের সম্পদ প্রদান করেন।

অতএব উজ্জ্বলপ্রেমের অধিকারী হইলেই ভক্ত সিদ্ধিলাভ করেন—শ্রীগোপীরূপে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। তথায় স্বকীয় গুরুরূপা নিত্য-সখীর সহিত অভিন্ন হন, তখন স্বয়ং নিত্যসখী হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসে চিরনিমগ্ন হন। যথা :—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতিঃ॥

—উজ্জ্বলনীলমণি।

যেরূপ দুইখণ্ড জতু (গালা) পরস্পর সংযোগ পূর্ব্বক হিঙ্গুলবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া অগ্নিসন্তপ্ত করিলে, উহা অভিন্ন হইয়া বাহ্যাভ্যন্তরে হিঙ্গুলাকার ধারণ করে, তদ্রূপ শৃঙ্গাররসাত্মক নায়ক-নায়িকারাও আশ্রয়-বিষয়ভাবাপন্ন উজ্জ্বলরসময় চিত্তদ্বয় প্রদীপ্ত প্রেমসন্তাপে নিত্যসখীভাবময়ী অভিন্নচিত্ততা প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা অবিদ্যাযোগরহিত আনন্দঘনমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, নিত্যসখীরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনন্তবিলাসসাগরে অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হন এবং তাঁহাদের অসমোর্দ্ধ প্রেমরসমাধুর্য্য আস্বাদন করেন।

শৃঙ্গাররসাত্মক সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে গোপীভাবলুব্ধ সাধক, এইরূপে আশ্রিত গুরুরূপা নিত্যসখীর সহিত অভিন্ন হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সাধনার স্তর ও সিদ্ধ লক্ষণ

প্রেমভক্তি-প্রচারক মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্ধানের পর, তদীয় ভক্তমণ্ডলী যে সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়" নামে খ্যাত। উজ্জ্বলাখ্য মধুররসের সাধনাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য; দাস্যাদিরসের সাধক যে উক্ত সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না, এমত নহে। তবে উক্ত সম্প্রদায় প্রধানতঃ মধুর রসের প্রবর্ত্তক। তন্মূলে গোস্বামিগণকর্ত্তৃক শাস্ত্রাদিও রচিত হইয়াছে, তাহাই অস্মদ্দেশে ভক্তিশাস্ত্র নামে খ্যাত। কাম-কামনামুক্ত নির্ব্বিকার সাধক ব্যতীত অন্য কেহ

রসতত্ত্ব ও সাধ্যসাধনের অধিকারী নহে; কাজেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি নির্ম্মল রাগমার্গে লক্ষ্য রাখিয়া সহজ ভজনপন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যতদূর সম্ভব তন্ত্রোক্ত পশুভাবেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, বাহ্যিক শৌচাচারের পক্ষপাতী হইয়াছেন। আহারে শৌচ, বিহারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচি-শুদ্ধ থাকিয়া নাম-ব্রহ্মজ্ঞানে কেবল মাত্র শ্রীভগবানের নাম-জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, ইহাই তাঁহাদের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের তিরোভাবের স্বল্পকাল পরেই প্রবৃত্তিপূর্ণ মানবমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ মার্গেও কলুষিত ভাব সকল প্রবেশ করাইয়া ফেলিল। সূক্ষ্মভাবটুকু ছাড়িয়া স্থূলবিষয় গ্রহণ করিয়া বসিল—পরকীয়া নায়িকার উপপতির প্রতি আন্তরিক টানটুকু গ্রহণ করতঃ ঈশ্বরে উহার আরোপ না করিয়া পরকীয়া স্ত্রী লইয়া সাধন আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ-যোগ-মার্গের ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়া উহাকে কতকটা নিজের প্রবৃত্তির মত করিয়া লইল। আর না করিয়াই বা সে কি করে? সে যে অত শুদ্ধ ভাবে চলিতে অক্ষম। সে যে যোগ ও ভোগের মিশ্রিত ভাবই গ্রহণ করিতে পারে। সে ধর্ম্ম লাভ চায়; কিন্তু তৎসঙ্গে একটু আধটু রূপরসাদি ভোগেরও লালসা রাখে। সেই জন্যই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর কর্ত্তা-ভজা, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, সহজিয়া আলেখিয়া প্রভৃতি মতের উপাসনা ও গুপ্তসাধন-প্রণালী সকলের উৎপত্তি। তাহারা তন্ত্রোক্ত পশ্বাচারের পরিবর্ত্তে কুলাচার প্রথা অবলম্বন করিয়া বসিল।

বঙ্গদেশের প্রতি নগরে—প্রতি গ্রামে—প্রতি পল্লীতে এইরূপ বৈষ্ণবের স্বতন্ত্র পল্লী বসিয়া গিয়াছে। তাহারা আবার যোগ ছাড়িয়া ভোগটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজগতে ধ্বজা উড়াইয়াছে। সাধারণ লোক

উক্ত ধর্ম্মের যোগ-রহস্য অবগত না হইয়া, কেবল বাহ্যভোগ দৃষ্টে প্রলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মমার্গ কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন ভূত-প্রেত কর্তৃক অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় দিন দিন ইহাদিগের দলপুষ্টি হইতেছে। তান্ত্রিক সাধকগণ যেরূপ পঞ্চ-ম-কারের সাধনা বলিয়া অক্লেশে বোতল বোতল মদ উদরস্থ এবং মাংস লোভে পশুপক্ষী বংশ ধ্বংস করিতেছে, তদ্রূপ ইহারাও মধুররসের সাধনা বলিয়া —সহজ ভজন বলিয়া, সোজাসুজি—সহজ ভাবেই ব্যভিচার করিতেছে। তাই সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের মধুর রসের নামে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোঁসাইকে তাহারা লম্পট, বদমায়েস অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ঐরূপ বৈষ্ণব উপেক্ষাস্পদ হইলেও, তাহাদিগের পন্থা কখনই ঘৃণ্য নহে। ধর্ম্মরাজ্যের অধিকাংশ স্থানই চিরদিন ভূত-প্রেত ও বানরগণ কর্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে। তথাপি তাহাদিগের ভিতরেও সময় সময় নন্দী বা হনুমানের দর্শন লাভ ঘটিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহাতে সাধন-পন্থা দূষিত হইতে পারে না। আমিই বিনষ্ট হইব, কিন্তু ধর্ম্ম নষ্ট হইবে কেন? তাই ঐ সকলের মূলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বহু প্রাচীন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রবাহ, সেই যোগ ভোগের সম্মিলন; আর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই তান্ত্রিককুলাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত প্রতিক্রিয়ার সম্মিলনের কিছু কিছু ভাব! তন্ত্রশাস্ত্র মতে সর্ব্বোচ্চ সহস্রার—অকুল স্থান, আর সর্ব্বনিম্ন মূলাধার—কুল স্থান; এইস্থানে শুক্র সম্বন্ধীয় সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া, এই সাধনাকে কুলাচার বলা হইয়া থাকে। যোগেশ্বর মহাদেব বলিয়াছেন;—

কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ মন্ত্রং ন সিধ্যতি ॥

—নিরুত্তর তন্ত্র।

কুলাচার ব্যতিরেকে কলিতে কোন মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। বাস্তবিক কলির ভোগ-পরায়ণ জীব কামের কবল হইতে উদ্ধার হইতে না পারিলে, কিরূপে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবে? তাই তাহারা কুল-সাধনবলে কামমুক্ত হইয়া ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে। কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি বৈষ্ণব-শাখাসম্প্রদায়গুলির ঈশ্বর, মুক্তি, সংযম ত্যাগ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটী কথার উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকে ঈশ্বরকে "আলেক্‌লতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বোধ হয়, সংস্কৃত "অলক্ষ্য" হইতে "আলেক্‌" কথাটীর উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ "আলেক্‌" শুদ্ধসত্ত্ব-মানবমনে প্রবিষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া "কর্ত্তা" বা গুরুরূপে আবির্ভূত হয়। ঐরূপ মানবকে তাঁহারা "সহজ" উপাধি দিয়া থাকেন। যথার্থ গুরুভাবে ভাবিত মানবই ঐ সম্প্রদায়ের উপাস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, উহার নাম কর্ত্তা-ভজা হইয়াছে। তাহারা দেবদেবী-মূর্ত্ত্যাদির অস্বীকার না করিলেও, কাহারও বড় একটা উপাসনা করে না। সকলে ঈশ্বরের "অরূপরূপের" উপাসনা করে। দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর উপাসনা করাই ইহাদের প্রধান সাধন। যখন ভারতে দেবদেবীর উপাসনা আদৌ প্রচলিত হয় নাই, সেই উপনিষদের কাল হইতেই গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা প্রবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ উপনিষদেই রহিয়াছে "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ!" ভারতে গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা অতীব প্রাচীন। সুতরাং মানুষ গুরুর পূজা করিয়া, তাহারা কোনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করে না। "আলেক্‌লতার" ও বিশুদ্ধ মানবে আবেশ সম্বন্ধে তাহারা বলে—

আলেকে আসে, আলেকে যায়।
আলেকের দেখা কেউ না পায়॥

আলেককে চিনেছে যেই।
তিন লোকের ঠাকুর সেই॥

"সহজ" মানুষের লক্ষণ, তিনি "অটুট" হইয়া থাকেন—অর্থাৎ রমণীর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিলেও তাঁহার কখনও কামভাবে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না—অটল শুক্র রমণীর ভাব-তরঙ্গে টলিয়া পড়েনা। তাই তাহারা বলে, "রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।" সংসারে কামকাঞ্চনের ভিতর অনাসক্তভাবে না থাকিতে পারিলে, সাধক, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিতে পারেনা। সেইজন্য ইহারা উপদেশ দিয়া থাকে যে—

রাধুনী হইবি, ব্যঞ্জন বঁটিবি,
হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়।
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
সাপ না গিলিবে তায়॥
অমিয় সাগরে সিনান করিবি,
কেশ না ভিজিবে তায়।
মাকড়সার জালে হাতীরে বাঁধিবি,
পীরিতি মিলিবে তায়॥

ইহাদিগের ভিতরেও সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা আছে। যথা:—

আউল বাউল দরবেশ সাঁই।
সাঁইয়ের পরে আর নাই॥

এই সম্প্রদায়ের লোক সিদ্ধ হইলে তবে, সাঁই হইয়া থাকে। কিরূপ নরনারী ইহাদিগের সম্প্রদায়োক্ত সাধনার অধিকারী?—তাহারা বলে,—

মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা।
তবে হবি কর্ত্তা ভজা॥

পাঠক! দেখিলে এই সকল সম্প্রদায়োক্ত সাধনপন্থাগুলি কিরূপ ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত; এখন পাশব-প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব যদি অনধিকারী হইয়া সেইকার্য্যে হস্তক্ষেপ করতঃ তাহা কলুষিত করিয়া ফেলে, তজ্জন্য তাহাদিগের সাধন-পন্থাগুলিকে কেহই অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবেনা। অধিকারী হইয়া যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই, সুধী-ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, জাতজীব মাত্রেই সুখের অভিলাষী,—কেহই দুঃখ ভোগ করিতে চাহেনা,—সকলেই সুখের জন্য লালায়িত;—কিন্তু ইহজগতে সুখ কোথাও নাই, ইহজগতের সমস্তই অনিত্য। অনিত্য পদার্থে নিত্যসুখ কোথায়? ফুলের ধারে ঝরা, জীবনের ধারে মরা, হাসির ধারে কান্না, আলোর ধারে অন্ধকার, সংযোগের ধারে বিয়োগ,—এইরূপ সর্ব্বত্র; সুতরাং নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন সুখ এই অনিত্য জগতে নাই। উপাসনা এই সুখ প্রাপ্তির জন্য। শ্রীভগবানের চিন্ময় নিত্যানন্দ ধাম হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর নিত্যরস-ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া জগতে আসিতেছে, তাঁহারই অনুভূতিতে জীব সুখান্বেষী হয়। মধুর গন্ধে অলিকুল যেমন আকুল হয়, জীবও তদ্রূপ সেই সুখের গন্ধে অন্ধ ও উদ্ভ্রান্ত হয়,—অতএব সে সুখ প্রাপ্তিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, ভজনা বা উপাসনার চরম উদ্দেশ্য। আবার সেই রসের পূর্ণ প্রাপ্তি মধুর-রসে,—মধুররসে পূর্ণানন্দ। মধুরে যুগলের উপাসনা। অতএব পূর্ণানন্দ বা পূর্ণসুখ প্রাপ্তির জন্য প্রথমতঃ কামমুক্ত হইয়া, পরিশেষে কামানুগাভক্তি-বলে যুগলের উপাসনা করিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রের ভিতর যেমন সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথা আছে, তদ্রূপ বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে জীবের চারিপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। তটস্থ, প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ এই চারিপ্রকার অবস্থার মধ্যে তটস্থদেহে ক্রিয়াশূন্যতা; তটস্থভাব, প্রাকৃত জীবভাব অর্থাৎ সে অবস্থায় জীব কোন উপাসনার পথ

অবলম্বন করে না। তন্ত্রে সাধকদিগকে যেরূপ পশু, বীর ও দিব্যভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা আছে, তদ্রূপ ভক্তিমার্গের সাধকগণেরও প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ এই তিন প্রকার শ্রেণীর কথা আছে। তন্ত্রে যেরূপ পশ্বাদিভাবে সাধনার প্রকার ভেদ আছে, তদ্রূপ ভক্তিমার্গের এই তিন প্রকার অবস্থায় তিন প্রকারের ভজন-প্রণালী আছে। প্রবর্ত্তক অবস্থায় আশ্রয়সিদ্ধ। আশ্রয়সিদ্ধ অর্থে আশ্রয়াবলম্বন ভক্ত-ভাব-সিদ্ধ। সাধনমার্গে প্রবেশলাভ করিয়া সাধনভক্তির অঙ্গগুলি সাধন করিবার কালে উপাসককে প্রবর্ত্তক বলা যায়। প্রবর্ত্তকের ভাব সিদ্ধ হইলে ভগবৎ-মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য হৃদয়ে যে তীব্র উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হয় এবং প্রকৃত ভাবের জন্য প্রাণে যে আকুল আবেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এইরূপ অবস্থার উপাসককে সাধক বলা যায়। যথা :—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাঁহাদিগের ভগবদ্বিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্ন নিবৃত্তি হয় নাই এবং ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, এবং বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, এইরূপ ভেদদর্শন জন্য তিনি সাধক। আর—

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততং প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাঁহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব হয় না, সর্ব্বদা ভগবৎ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদ বিষয়ে পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ। সিদ্ধ ও সাধকের অন্তঃকরণ ভগবদ্ভাবে ভাবিত বলিয়া, তাঁহাদিগের উভয়কেই ভগবদ্ভক্ত বলা যায়। কিন্তু প্রবর্ত্তক, ভক্তমধ্যে পরিগণিত নহে।

সিদ্ধ দুই প্রকার; এক—সংপ্রাপ্তিসিদ্ধরূপ সিদ্ধ, অপর—নিত্যসিদ্ধ। সাধনদ্বারা এবং ভগবৎ কৃপাবশতঃ সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধ দুই প্রকার। সাধনদ্বারা সিদ্ধ আবার দুইশ্রেণীতে বিভক্ত; যাঁহারা মন্ত্রাদির সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রসিদ্ধ; আর যাঁহারা যোগ-যাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ। কৃপাপ্রাপ্তসিদ্ধও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যাঁহারা স্বপ্নে ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন—তাঁহারা স্বপ্নসিদ্ধ, আর যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন—তাঁহারা কৃপাসিদ্ধ। আর—

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ।।

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহাদিগের গুণ মুকুন্দের ন্যায় নিত্য ও আনন্দরূপ এবং যাঁহারা আপনা অপেক্ষা ভগবানে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ। এই নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, ভগবানের কোন কার্য্য সম্পাদনার্থ সময় সময় নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। আর ভগবান যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গে পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সকল গুণ ও অন্যান্য সিদ্ধিপ্রদত্বাদি গুণসকলও নিত্যসিদ্ধগণে বর্ত্তমান আছে।

প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী বিহিত আছে। যথা :—

মন্ত্র, নাম, ভাব প্রেম আর রসাশ্রয়।
এই পঞ্চরূপ হয় সাধন আশ্রয়॥
প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়।
প্রবর্ত্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামাশ্রয়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রবর্ত্তক, সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের সাধনার্থ মন্ত্র, নাম, ভাব, প্রেম ও রস এই পাঁচটী আশ্রয়স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে মন্ত্র ও নাম প্রবর্ত্তক ভক্তের, ভাব ও প্রেম এবং রস সাধক ও সিদ্ধভক্তের আশ্রয়। সিদ্ধ ভক্ত যুগলরূপের নিত্যলীলায় নিরত নিমগ্ন থাকিয়া, পূর্ণ রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি আনন্দ-লীলা-রসবিগ্রহ, হেমাভ-দিব্য-ছবি সুন্দর মহাপ্রেমরসপ্রদ পূর্ণানন্দরসময়মূর্ত্তি ভাবিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

লেখকের মন্তব্য

———(:*:)———

প্রেমভক্তি লাভকরতঃ স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবানের লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের চরম-সাধ্য; সুতরাং সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। সাধন দ্বারা পর পর ধর্ম্মে উন্নীত হইতে হয়। সাধনার তিনটী উপায়—

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই তিনটী উপায় ওতঃপ্রোত সম্বন্ধে জড়িত —এক সূত্রে গাঁথা; ইহার কোনটী ছাড়িলে ধর্ম্মের পূর্ণসাধন হইতে পারে না। যেমন মৎস্য—দুইপার্শ্বে পাখ্না ও একটী পুচ্ছ দ্বারা জলমধ্যে অনায়াসে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু একটীর অভাবে অন্য দুইটী অঙ্গও বিকল হইয়া পড়ে—কাজেই আর সুখে সাঁতার দিতে পারে না; তদ্রূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে জীব ধর্ম্ম রাজ্যে অক্লেশে ভ্রমণ করিতে পারিবে, কিন্তু ইহার একটীর অভাবে, অন্যগুলিও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে —কাজেই জীব মোহান্ধকারে নিমগ্ন হয়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পপাদপের আশ্রয় ছাড়িয়া পরগাছা অবলম্বন করিয়াছে; কাজেই কল্পতরুর ফল লাভ ঘটিয়া উঠিতেছে না। তাই, একধর্ম্মাশ্রিত হইয়াও আজি জ্ঞানবাদী, কর্ম্মবাদী ও ভক্তিবাদী পরস্পর বিদ্বেষ কোলাহলে ধর্ম্মজগতে ভীষণ গণ্ডগোল উঠাইয়াছে। সম্প্রদায়ান্ধগণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ লইয়া বিবাদ করেন। বস্তুতঃ ঐ তিনই এক। অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকেই সদা বোধগম্য রাখা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ, আর অনুরাগের বস্তুতে নিয়ত চিত্ত থাকা ভক্তির লক্ষণ। এই উভয়কেই যোগশাস্ত্রে চিত্তসমাধান অর্থাৎ সমাধি বলে। সুতরাং অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততা ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান এই তিনেই আছে। যাহারা কিছু স্থূলবুদ্ধি—দার্শনিকতত্ত্ব পরিপাক করিতে পারেনা এবং সংযমে অশক্ত; অথচ হৃদয়ের আবেগসম্পন্ন, তাহারাই ভক্ত্যভিমানী হয়। তাদৃশ স্থূলবুদ্ধিব্যক্তিগণ ও যাহাদের হৃদয়াবেগ কম, কিন্তু শারীরিক সংযম অধিক, তাহারাই যোগাভিমানী হয়। আর যাহাদের হৃদয়াবেগ ও হৃদয়ের সংযমের অভাব কিন্তু দার্শনিকবিষয় আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা জ্ঞানাভিমানী হয়। ইহারা সকলেই অধম অধিকারী। বস্তুতঃ দম্ফ ঝম্ফ করা বা শারীরিক

সংযম করা, কিম্বা কেবল শাস্ত্রোপদেশ ও বক্তৃতা করা, প্রকৃত ভক্ত বা যোগী, কিম্বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে। সদ্বিষয়ে তীব্র আবেগ, পূর্ণ শারীরসংযম ও সম্যক্ প্রভা, এই তিন না থাকিলে কেহ ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানী কিছুই হইতে পারে না—কোন মার্গেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

একসময় এতদ্দেশে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য ছিল; কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির অভাবে তাহা পুনঃ পুনঃ সকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব কর্ম্মের সম্প্রসারণ করিয়া জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু তাহাও ঈশ্বরসম্বন্ধে নীরবতাপ্রযুক্ত নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণপূর্ব্বক স্বীয় সার্ব্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষা ও মায়াবাদের কঠোরতায় পরিণত হইলে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া, তাহার সহিত প্রেমভক্তি মিলাইয়া, হিন্দুধর্ম্ম মধুর করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

চৈতন্যদেব শেষ অবতার; সুতরাং চৈতন্যোক্ত প্রেমভক্তি লাভই সাধ্যাবধি অর্থাৎ চরম ধর্ম্ম। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে প্রেম-ভক্তিলাভই মানবের পরম পুরুষার্থ। আমরা এ পর্য্যন্ত সেই প্রেমভক্তি লাভেরই উপায় বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। তবে ভক্তির অধিকারী ও স্তরভেদে, তাহার সাধনা ও সাধ্যফল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হইলেও সুধী ব্যক্তিগণ তাহা হইতে সাধ্য-প্রেমভক্তি লাভের উপায়স্বরূপ এক সার্ব্বভৌম পন্থাই দেখিতে পাইবেন। আরও দেখিবেন যে, ঐ সাধনপন্থার মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞানও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে। আধুনিক বৈষ্ণবগণ "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড" বলিয়া মুন্সিয়ানা চালে বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেও, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদস্বরূপ

শ্রীমৎ রামানন্দ রায় "স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়" বলিয়া কর্ম্মযোগেই ভক্তির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া, শিক্ষার্থী শিষ্যের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ;—রামানন্দ ভাব-কণ্টকিত গাত্রে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইয়া দেবাবিষ্টের ন্যায় উত্তর করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নোত্তর হইতেই আমরা, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টীর মীমাংসা করিব। যথা :—

প্রভু কহে কহ মোরে সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
এহ বাহ্য প্রভু কহে আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসার॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর॥
রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য-প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য-প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহোত্তম কিছু আগে আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা-প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপাকরি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে রাধা-প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অতএব প্রেমময়-স্বভাব লাভ করিয়া, রাধাপ্রেমাস্বাদ করাই সাধ্য-শিরোমণি অর্থাৎ চরমসাধ্য। সেই চরমসাধ্য স্বধর্ম্মাচরণে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিষ্কামকর্ম্ম, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেমভক্তি দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তাপ্রেমে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইয়া রাধাপ্রেমে, পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং এইগুলি এক একটী স্বতন্ত্র সাধ্য-ভক্তি পন্থা নহে ; উহারা চরমসাধ্যে উপনীত হইবার ক্রমোন্নতি-স্তর মাত্র। স্বধর্ম্মাচরণে আরম্ভ করিয়া এই স্তরগুলির ভিতর দিয়া সাধন করিতে করিতে পরিশেষে রাধাপ্রেমের অধিকারী হইতে হইবে। ইহা আমাদের হাতগড়া কথা নহে,—প্রেমভক্তি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কর্ত্তৃক ইহা প্রকটিত এবং রাগমার্গের রসিকভক্ত কর্ত্তৃক কথিত। অতএব সাধকগণ নানা পন্থা ধরিয়া, নানা শাস্ত্র খুঁজিয়া হয়রাণ না হইয়া, এই পন্থা অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ রাধাপ্রেমের অধিকারী হইয়া সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ এবং নিত্য পূর্ণানন্দের অধিকারী হইবে,—মরজগতে অমরত্বলাভ এবং মানবজীবনের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। আমরা ধারাবাহিকভাবে একবার প্রেমভক্তি লাভের সার্ব্বভৌম পথটা আলোচনা করিয়া, এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

যাঁহারা হঠাৎ ভগবৎ-কৃপালাভ করিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়া যান, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র; সেরূপ ভাগ্যবান্ জীব কয়জন আছেন, জানিনা। সাধারণতঃ আমাদের ন্যায় জীবের অন্ততঃ তাঁহার কৃপা আকর্ষণের জন্যও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ভক্তিবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে,—এতদর্থে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা। মানবজীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষনীয় বিষয় Discipline অর্থাৎ শৃঙ্খলা। যে ব্যক্তি প্রথম হইতে কোন বিধিমার্গে চলে না, তাহাতে ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশৃঙ্খলার আবর্জ্জনা তাহার সারাজীবনে জড়াইয়া যায়,—উচ্ছৃঙ্খলতায় স্বেচ্ছাচারিতা আইসে, স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে ক্রমে ক্রমে অধোগতির পথে টানিয়া লয়। তাই স্বধর্ম্মাচারণই সাধ্য, কেননা স্বধর্ম্মাচরণ হইতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া মানবের ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। যে, যেগুণে জন্মিয়াছে; সেই গুণোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের নামই স্বধর্ম্মাচরণ। স্বধর্ম্মাচরণের সাধকের গুণক্ষয় হইয়া জ্ঞান-ভক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে যেরূপ গুণক্ষয় হয়, তদ্রূপ আবার গুণসঞ্চয় হইয়া থাকে; তাই কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে "কর্ম্মফল" ভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা। এই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, বিধিমার্গে চলিয়া অভিমানশূন্য ও তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয় কাজেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। তখন তাহার জীবন বিধিময় এবং কর্ম্ম ভগবদর্পিত হওয়ায়, আর তাহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই। এখন স্বতন্ত্রতাই তাহার উন্নতি, আর তাহাকে বিধিমার্গের গণ্ডীর ভিতর রাখা কর্ত্তব্য নয়হ। তাই তখন তাহার স্বধর্ম্মত্যাগই ধর্ম্ম। তখন বিশুদ্ধচিত্তে সাধক শাস্ত্রাদি বিচারদ্বারা, নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা, জগতের সৃষ্টিকৌশল দ্বারা জ্ঞানালোচনা করিবে। এই জ্ঞান যখন ইন্দ্রিগ্রাহ্য যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, ইহমূত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ জন্মিয়া

একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় ও অবলম্বন করিবে, তখন ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ বা আসক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। প্রকৃত ভক্তির ইহাই প্রথম স্তর। এই ভক্তিতে স্তব-স্তুতি থাকে, প্রার্থনা-মিনতি থাকে; আরাধনা উপাসনা সকলই থাকে। কাজেই ইহার নাম সাধন-ভক্তি। তৎপরে ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হয়—ভক্তির কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার স্নিগ্ধতনুস্পর্শে সংসার-কোলাহল ভুলিয়া, যখন সমগ্র হৃদয়বৃত্তির সহিত সাধক তাহাতে মজে, তখন জ্ঞানের বন্ধন খুলিয়া যায়। জ্ঞানশূন্য হইলে ভক্তি তদ্গতা—স্বার্থ চিন্তা থাকেনা, বিচার থাকেনা, উদ্দেশ্য থাকেনা—ষোল আনাই তুমি। জ্ঞানশূন্যা বিশুদ্ধ ভক্তির সাধনায় ক্রমশঃ ভগবানের মহিমজ্ঞান দূরে যায়, অর্থাৎ ভগবান সর্ব্বশক্তি-মান্, পাপ-পুণ্যের দণ্ডদাতা, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দূরীভূত হইয়া প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন সে আমার প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ, মাত্র এইজ্ঞানে পুত্রের ন্যায়, ভৃত্যের ন্যায়, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের সেবা করিতে বাসনা জন্মে। এইখানে রাগানুগাভক্তি প্রকৃত পক্ষে ভাবভক্তিতে পর্য্যবসিত হইল। ভাবের মোহে বিভোর হইতে পারিলে ভগবান্ আপনার হয়েন, নিকটে আসেন। সাধনায় দাস্য ভাব পুষ্ট হইয়া দাস্যের সঙ্কোচ দূরে যায়, তখন ভগবানে প্রাণের প্রেম-সখীত্ব অর্পিত হয়। সখ্যপ্রেমের ক্ষীরধারায় ভগবান্ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আনন্দিত ও প্রীত হয়েন। সখ্যভাবে ভক্ত ও ভগবান্ এক হইয়া যান। তখন ব্রজের রাখালবালকগণের ন্যায় অসঙ্কোচে ভগবানের সহিত খেলা, কাঁধে চড়া চড়ি, একত্র শয়ন-ভোজন, নবপল্লবে ব্যজন, বন-ফুল মালায় বিভূষণ প্রভৃতি করিয়া ভক্ত বিভোর হইয়া যান। তাঁহার অভাবে চারিদিক শূন্য দেখেন। এই সখ্য-ভাব পরিপুষ্ট হইলে বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার হয়। তখন সাধক, ভগবান্‌কে নিজ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বোধ করিয়া থাকেন

ভক্ত নিজে পিতা মাতা হইয়া, ভগবানকে শিশু পুত্রের ন্যায় আদর যত্ন করিয়া থাকেন। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া—বাসনা-কামনা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র পুত্রের সেবাই জনক-জননীর ধ্যান-জ্ঞান। পুত্রের নিকট পিতা মাতা কিছুই চাহেন না; আপনা ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া পুত্রের সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য ব্যস্ত। এইরূপ ভাব ভগবানে জন্মিলে, তাহাকে বাৎসল্য ভাব বলে। নন্দ-যশোদার বাৎসল্যভক্তিতে ভগবান্ বালক সাজিয়া যশোদার স্তন্যপান, নন্দের বাধা মাথায় বহন করিয়াছিলেন। বাৎসল্য ভাবের পরিপাক দশায় যখন ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান, তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পিত হইয়া যায়, তখনই কান্তাভাব বলা যায়। স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিয়া, যৌবন-জীবন দেহভার সমর্পণ করিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসিলে, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধ্যের শেষ অবস্থা,—ভাবভক্তির ইহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা। *

ভক্ত তখন সর্ব্বপ্রকার বেদবিহিত কর্ম্ম ও লোক-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কেবল প্রেম-কারুণ্য কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন ;—

---

* মৎপ্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে। তখন মনঃস্থির করিবার জন্য "যোগীগুরু" পুস্তকের লিখিত আসন, মুদ্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে এবং "জ্ঞানীগুরু" পুস্তকের লিখিত জ্ঞানালোচনা করিবে। তৎপরে "যোগীগুরু" বা "জ্ঞানীগুরু" পুস্তকোক্ত সাধনায় সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি কিম্বা "তান্ত্রিক-গুরু" পুস্তকোক্ত স্থূলসাধনায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিবে। তদনন্তর "প্রেমিক গুরু" পুস্তকের লিখিত সাধনার গোপিকানিষ্ঠ প্রেমময়স্বভাব লাভ করতঃ ভগবানের অসমোর্দ্ধ লীলা-রস-মাধুর্য্যে অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং মৎপ্রণীত পুস্তক কয়খানিতে হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক কয়খানিতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল অভাব পূর্ণ করিবে।

তপঃ-জপ আর আহ্নিক পূজন,
মূলমন্ত্র আমার তুমি একজন,
তব নাম-গান-শ্রবণ-কীর্ত্তন
সাধন-ভজন আমার হে ;—
গয়া গঙ্গা বারাণশী বৃন্দাবন,
কোটিতীর্থ আমার ও রাঙ্গাচরণ,
তব সম্মিলনে এই সামান্য ভবন,
নন্দন-কানন সমান আমার ॥

সতী যেমন পতি বিনা কিছুই জানে না, ভগবানে সেইরূপ ভাব জন্মিলে তাহাকে কান্তাভাব বলা যায়। কিন্তু প্রেমিক ঋষি প্রেমভক্তি-তত্ত্বে শুধু কান্তাপ্রেম দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, স্বকীয় কান্তা স্থলে পরকীয়া কান্তাভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা, পতি-পত্নীর সম্বন্ধেও যেন একটু দূরভাব আছে। পত্নী পতিকে খুব নিকটে দেখেন বটে, অথচ যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভুভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া অপর পুরুষের অনুরাগিণী হন, তাঁহার প্রেমে সে প্রভুভাব, দূরভাব নাই। তাই কান্তাপ্রেমে পরকীয়া ভাবই গৃহীত হইয়াছে। যিনি এই মধুর ভাবে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা আর বাহিরের ধর্ম্ম-কর্ম্ম থাকেনা। তিনি বেদ-বিধি ছাড়া। তিনি প্রেমসুধাপানে মত্ত হইয়া লজ্জা-ভয় ত্যাগ করেন, জাতি-কুলের অভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতল জলে নিক্ষেপ করেন। ব্রজগোপীগণের কামগন্ধহীন প্রেম, মধুররসের পরম আদর্শ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর জর; কখনও কৃষ্ণকে "নির্দ্দয়" "কঠোর" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; কখনও অভিমানে স্ফীত হইয়া "তাহার নাম লইবনা" বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের উচ্ছ্বাস থামা-ইয়া রাখিবার সাধ্য নাই, তাই আবার কখনও হৃদয়ের আবেগে সমস্ত

ভুলিয়া "দেখাদাও" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন। এ অবস্থায় বিরহে বিষের জ্বালা, মিলনে অনন্ত তৃপ্তি। বিরহে বিষের জ্বালা হইলেও প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে। এ সময়ের প্রাণের ভাব ভাষার ব্যক্ত করা অসম্ভব। তখন ভগবান্‌কে—হৃদয়বল্লভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতর পুরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটেনা। ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে থাকিয়া ভক্ত, তদীয় সম্ভোগ-সুধাপানে আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার বিশ্বময় ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি ও ঈশ্বরানুভব হইয়া থাকে, তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রিয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া ভগবত্তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তের সুখের ইয়ত্তা নাই; তাঁহার কুল ধন্য, তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি ধন্য।

(এই গোপিকানিষ্ঠ মধুরভাব ক্রমশঃ প্রেমবিলাস বিবর্ত্তে পুষ্ট হইয়া মহাভাবে পর্য্যবসিত হইয়া প্রৌঢ়দশায় "প্রেমভক্তি" আখ্যাপ্রাপ্ত হয়।) এই অবস্থায় ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে সন্তরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রেমময় স্বভাব লাভ করিয়া দেহান্তে রাধাশ্যামের মহারাসের মহামঞ্চে মিলিয়া তদীয় লীলারস মাধুর্য্যের আনন্দে অনন্ত কলের জন্য নিমগ্ন হইয়া এক হইয়া যান।

ঐ শোন, মধুর বীণা কলতানে বাজিয়া বাজিয়া জীবকে রস উপভোগ জন্য আহ্বান করিতেছে, যাও—মিলিত হও,—আনন্দ মিলনে, সুখ-মিলনে রস-মিলনে। সুখের লেলিহান তৃষ্ণায় জীবের এত আকুল আকাঙ্ক্ষা,—মানুষ মাত্রেই রসের জন্য লালায়িত কিন্তু মরণ-ধর্ম্মশীল পার্থিব পদার্থে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র; মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় রসের জন্য মিথ্যা ছুটাছুটি করিলে দগ্ধকণ্ঠে প্রাণ বিয়োগ হইবে। জীব যদি প্রেমভক্তির সাধনায় গোকুলাখ্য মহাধামে উপস্থিত হইয়া সখীভাবে প্রেমসেবোত্তরা গতি লাভ করিতে পারে, রাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দ অনুভব

করিতে পারে, তবে পূর্ণতম রস, পূর্ণতম সুখ ও পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে।

যদি সুখ চাহ, হৃদয় সুখ-স্বরূপ ভগবানে অর্পণ কর। যদি রস চাই বৃত্তি সমুদায় পূর্ণতম রস বিগ্রহ ঈশ্বরে সমর্পণ কর। যদি কাম দমন করিয়া কামরূপ হইতে চাও, তবে মদন-মোহনে মনের কামনা-বাসনা অর্পণ কর। যদি জগতের সর্ব্বশক্তিকে বশীভূত করিতে চাও,—তবে হ্লাদিনী-শক্তি-মিলন-রসানন্দ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি অর্পণ কর। সুখ আর কোথাও নাই, নিত্য-সুখ সুখময় শ্রীকৃষ্ণে—আনন্দ আর কোথাও নাই, পূর্ণানন্দ হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধায়—সুতরাং রস আর ত কোথাও নাই—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে। অতএব সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া, প্রেমভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, প্রেমকারুণ্যকণ্ঠে বল, "আমি একমাত্র তাঁহারই চরণানুরক্ত, আমাকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পেষণই করুক, আর দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুক, সেই লম্পট যাহাই করুক না কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে।" যথা :—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং
করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু
স এব নাপরঃ॥

ওঁ হরি ওঁ

উত্তর স্কন্ধ

জীবন্মুক্তি

প্রেমিক গুরু

উত্তরস্কন্ধ

—:ও:—

জীবন্মুক্তি

——:০(:*:)০:——

ভক্তিই মুক্তির কারণ

একমাত্র পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদি-রূপ লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা কোনপ্রকার দেবদেবীর পূজা-অর্চনাদি দ্বারা কিম্বা তীর্থস্নানদ্বারা জীব কখনও মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। তপ, জপ, প্রতিমাপূজাদি বালিকাগণের সাংসারিককর্ম্মবোধিকা পুত্তলিকা খেলার ন্যায়। যে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বামীর সহিত সংমিলন না হয়, তাহারা সেই পর্য্যন্ত খেলে, তৎপর তাহারা সেই সকল পুত্তলিকা পেটীকায় তুলিয়া রাখে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥

— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭।২৪-২৫

আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, এ কারণ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার মায়া দ্বারা সম্যক্ আচ্ছন্ন হইয়া,—উৎপত্তি-হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত আমাকে জানিতে পারে না,। সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য স্বভাব, অল্পবুদ্ধি লোক সকল তাহা জানিতে না পারিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমাকে মনুষ্যাদির ন্যায় অবয়বাদি বিশিষ্ট জ্ঞান করে। কল্পিত উপাসনাতে চিত্ত-শুদ্ধি হয় মাত্র, তদ্দ্বারা জীবের কদাচ মুক্তিলাভ হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তি সেই অবিনাশী বুদ্ধ শুদ্ধ পরমেশ্বরকে না জানিয়াও যদিও ইহলোকে বহুসহস্র বৎসর হোম-যাগ-তপস্যাদি করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। যথা :—

যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা ॥

—পঞ্চদশী ; ৬।২০৯-২১০

যে ব্যক্তি যে কোন বস্তুকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে অবশ্যই তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। আর পূজ্য বস্তুর স্বরূপ ও পূজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু

মুক্তিফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতএব—

তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।

সেই পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই, সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে মুক্তি হইতে পারে না।—আবার ভক্তি দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভগবানে, আত্ম বা ব্রহ্মতত্ত্বে প্রাণের প্রবল অনুরাগ, পরা অনুরক্তি বা ঐকান্তিক ভক্তি না জন্মিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে পারে না। যথা :—

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি র্ভক্তি র্জ্ঞানস্য কারণং।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তি র্ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ ॥

—শ্রীমদ্ভগবতী গীতা ১৫।৫৯

যজ্ঞাদি দ্বারা ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্ম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। মুক্তির উপায় জ্ঞান, জ্ঞানের উপায় ভক্তি, সুতরাং ভক্তিই মুক্তির কারণ। অতএব যে সাধকোত্তম মুক্তি ইচ্ছা করিবে, সে তদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার পূজাদি প্রসঙ্গে প্রীতিযুক্ত-মানস হইবে। কায়মনোবাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্রয় করিবে, সর্ব্বদা তাঁহাতে মনোবিধানের চেষ্টা করিবে এবং তদ্গতপ্রাণ হইবে। সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গ—তাঁহার গুণগান ও তাঁহার নামজপে সমুৎসুক হইবে। স্বীয় স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ও বেদবিহিত এবং স্মৃত্যনুমোদিত পূজা যজ্ঞাদি

দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিবে, অর্থাৎ—কামনাবিরহিত হইয়া ঐ সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান ভগবৎ-প্রীত্যর্থই করিবে। তাহার দ্বারা ক্রমশঃ যখন ভক্তি দৃঢ়তরা হইবে, তদনন্তরই তত্ত্বজ্ঞান হইবে; সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে। ভক্তি লাভ হইলে আর বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম, তপস্যা, যোগ, যাগ, পূজাদিতে প্রয়োজন নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন;—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৯

"যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যদবধি আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল করিবে।" এই প্রকার শাস্ত্র-বিধি-বিহিত কর্ম্ম করিয়া যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে, তখন ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা হইবে যে, কতদিনে পরমধন লাভ করিব। আর তখন যাবতীয় জগতের সকলেরই প্রতি বৈরাগ্য হইয়া, যদ্দ্বারা ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যবিগ্রহে মনোনিবেশ হয়, তদুপযোগী বেদান্তাদি শাস্ত্রে রুচি হয়। গুরূপদেশ সহকারে ঐ সকল অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার নিত্য কলেবর—সেই অপার আনন্দসাগর কোনও সময়ে অত্যল্পকালের জন্য অন্তঃকরণে স্পর্শ হয়, তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অত্যল্প জঘন্য সুখের কারণ বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকেনা; সুতরাং কামনা পরিত্যাগ হইয়া যায়। সমুদায় জীব-জগতে ভগবৎসত্তা নিশ্চয় হইয়া সকল জীবের প্রতিই পরম যত্ন উপস্থিত হয়; সুতরাং হিংসাও পরিত্যাগ হয়। এবম্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তত্ত্ববিদ্যা আবির্ভূতা হন, ইহাতে সংশয় নাই। তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই তাঁহার নিত্যানন্দবিগ্রহ যে

পরমাত্মা-ভাব তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতেই সাধকের জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

মুক্তির কারণ স্বরূপ যে ভক্তি, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ ভগবানে সেই ভক্তিযুক্ত হ'ন, সহস্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে আবার কেহ তত্ত্বজ্ঞ হন। ভগবানের যে রূপ পরম সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, নির্গুণ, নিরাকার, জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্ব্বিকল্প, নিত্যচৈতন্য, নিত্যানন্দময় ভগবানের সেই রূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবন্ধ বিমুক্তির জন্য অবলম্বন করেন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা সর্ব্বগত অদ্বৈতস্বরূপ পরমেশ্বরের অব্যয়রূপকে জানিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করে, তাহারাই তাঁহার পরমরূপ অবগত হইয়া মায়াজাল হইতে উত্তীর্ণ হয়। সূক্ষ্মরূপের ন্যায় স্থূলরূপেও তিনি এই সমস্ত বিশ্বপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং সমস্ত রূপই তাঁহার স্থূলরূপের মধ্যে গণ্য, তথাপি আপন আপন গুরূপদিষ্ট ধ্যেয় মূর্ত্তির আরাধনা করিতে হইবে, কারণ উহাই শীঘ্র মুক্তিদানে সমর্থ। এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে যখন গাঢ় ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্ম-স্বরূপ ইষ্ট-দেবতার সূক্ষ্মরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তখন জগতের কোনও রমণীয় বস্তুকে তদপেক্ষা রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না,—জগতের কোনও লাভকে তল্লাভ হইতে অধিক জ্ঞান হয় না; মনপ্রাণ তাঁহার প্রেমরস-মাধুর্য্যে চিরকালের জন্য ডুবিয়া যায়। তাহাতে সেই মহাত্মারা দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম আর ভোগ করেন না। অনন্যমনা হইয়া যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তিনি অচিরে এই দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার হইয়া থাকেন। অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছিলেন;—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১০।১

যাহারা আমাকে সতত শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে এরূপ বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভক্তিই যে একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহা অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত হইল। তত্ত্বদর্শী অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে কৃষ্ণ! যাহারা তদ্গতচিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ সাধকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া, পরমভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহারাই প্রধান যোগী। আর যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্ব-ব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, কুটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তবে দেহাভিমানীরা অতিকষ্টে অব্যক্তগতি লাভ করিতে সমর্থ হয় অতএব যাহারা অব্যক্তব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুর আকর সংসার হইতে মুক্ত করি।"

সর্ব্বমতসমঞ্জসা মুক্তিপথ-প্রদর্শক শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—মুক্তিলাভের যতপ্রকার কারণ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। যথা:—

মোক্ষকারণসমগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।

—বিবেকচূড়ামণি, ৩২

যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। ভগবতী পার্ব্বতীদেবীও পিতা গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন ;—

ভবেন্মুমুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ।
মদর্চ্চাপ্রীতিসংসক্তমানসঃ সাধকোত্তমঃ ॥

—শ্রীমদ্ভগবতীগীতা, ১৫।৫৭

হে রাজেন্দ্র! মুক্তি লাভে ইচ্ছা থাকিলে ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার অর্চ্চনাতেই মন নিবেশ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলেই সাধকের মুক্তি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের প্রধান সাধনই ভক্তি, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি কামনাবিরহিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত স্ববর্ণাশ্রম কর্ত্তব্য যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের দ্বারা ভগবানের প্রীত্যর্থই তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে বিধি প্রতিপালিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন চিত্ত নির্ম্মল হইবে, তখন আত্মজ্ঞানের জন্য সমুদ্যুক্ত হইবে ও সর্ব্বদাই মুক্তি লাভের ইচ্ছা বলবতী হইবে। তখন পুত্র মিত্রাদি সমস্ত বন্ধু-বর্গেই কারুণ্যভাব বিরহিত হইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র-চর্চ্চাতেই অথবা ভগবানের গুণধ্যানানুশীলনেই মন সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই সময়ে কামাদি রিপুগণ ও হিংসাদিবৃত্তি সমুদয় হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে। এই প্রকার অনুষ্ঠানশীল ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। এই তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ হইলেই আত্ম-প্রত্যক্ষ হয় এবং তাদৃশ অবস্থা হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

অতএব ভক্তিই মুমুক্ষুব্যক্তির একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভক্তি যোগেই মানুষ আপন আত্মা, আপন ধর্ম্ম, আপন কর্ম্ম, আপন জ্ঞান, কুল শীল,

খ্যাতি-জাতি, মান যশঃ, পুত্র-কলত্রাদি ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপানন্দে মত্ত হইতে পারে। ভক্তিযোগেই মানুষ, ভগবানের অসমোর্দ্ধ প্রেম-রস-মাধুর্য্যে প্রমত্ত হইয়া আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার মুছিয়া বর্ত্তমান জীবনের সংস্কার ঘুচাইয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ব্রজের কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী আভীর রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আত্মহারা হইয়া তদীয় ধ্যান-মনন করিতে করিতে আপনাদিগকে "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লীলাদির অনুকরণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া ভগবানের মহাভাবে স্বীয় মাতার মস্তকে আপন পদ স্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তিযোগেই স্বরূপতত্ত্ব, অর্থাৎ "সোহহং" জ্ঞান লাভ করিয়া স্বল্পায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব মুক্তির প্রধান করণই যে ভক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা আনন্দের প্রস্রবণস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরে ভক্তিপরায়ণ না হইয়া অন্য উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করে, তাহারা ঘৃত পরিত্যাগ করিয়া এরণ্ড তৈল ভক্ষণ করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়া, তাহারা সংসারেই কৃতকৃতার্থ হওয়া দূরে থাক, সাতিশয় দুঃখই ভোগ করে। যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন ;—

> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥
>
> —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৬২

হে ভারত! সর্ব্বান্তঃকরণে তুমি তাঁহারই (পরমেশ্বরের) শরণাপন্ন হও' তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। ভগবতী পার্ব্বতী দেবীর শ্রীমুখবিগলিত সুধাধারাস্বরূপ তত্ত্বোপদেশ হইতে আবার বলি—

যেন স্মরণ থাকে, "হে পিতঃ! যাহারা আমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন নহে, তাহাদিগের মুক্তিলাভ নিতান্তই দুঃসাধ্য; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ যত্ন পূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে।" যথা :—

কিন্ত্বেতদ্দুর্ল্লভং তাত মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাম্।
তস্মাদ্ভক্তিঃ পরা কার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভিঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবতী গীতা, ১০।৬৬

"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী" এই প্রচলিত বচনটীও স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ

—:*:—

এই রোগ, শোক, জরা মৃত্যুময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিরকালই "মুক্তি" রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। সকল দেশের সকল মনীষিগণই মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আপন আপন গম্ভীর গবেষণা-পূর্ণ যুক্তি সকল ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিতে মুক্তির ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাব পক্ষে সকলেরই প্রায় ঐক্যমত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশীয় সমস্ত প্রসিদ্ধ দার্শনিক বুধমণ্ডলীর মত উদ্ধৃত করিয়া মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আশাকরি পাঠকগণ তাহা হইতে মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বসমন্বয়ী মত গ্রহণ করিয়া নিঃসংশয় হইতে পারিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মুক্তি সধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—জ্ঞান-মুক্তি ও কর্ম্মজ মুক্তি। প্রথম জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ—জ্ঞানের দ্বারা যে মুক্তি আনীত হয়, তাহাকে "নির্ব্বাণ" বা "বিদেহ কৈবল্য" মুক্তি বলে এবং তাহা চরমতম মুক্তি বুঝায়। এই মুক্তিই অনন্তকালব্যাপী মুক্তি। দ্বিতীয় কর্ম্মজ মুক্তি অর্থাৎ—কর্ম্মদ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট-কালব্যাপী মুক্তি। এই কর্ম্মজ মুক্তি অর্থাৎ যাগ যজ্ঞ, তপস্যাদির অনুষ্ঠান, কাশী প্রভৃতি স্থানে তনুত্যাগ ইত্যাদি দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা:—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য।

মাং পূজয়তি নিষ্কামঃ সর্ব্বদা জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স মে লোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥

—শিবগীতা, ১৩,৪

যে ব্যক্তি অজ্ঞানবর্জ্জিত ও নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বদা ভগবানের অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি ভগবল্লোকে গমনপূর্ব্বক বাঞ্ছিত ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে, ইহাকেই সালোক্য মুক্তি বলে।

জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্ যস্তু সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ।
ময়া সমানরূপঃ সন্ মম লোকে মহীয়তে॥

—শিবগীতা, ১৩৫

যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করে, সেই ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতার সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া তদীয় লোকে গমন করে।

সৈব সালোক্যসারূপ্যসামীপ্যা মুক্তি রিষ্যতে॥

—মুক্তিকোপনিষৎ

এই সালোক্য, সারূপ্য মুক্তিই সামীপ্য মুক্তিস্বরূপ। তাই সামীপ্য মুক্তিকে আর একটী পৃথক্ মুক্তিরূপে গণনা করা হয় নাই।

ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মাণি মৎপ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ।
সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

—শিবগীতা, ১৩।৬

যে ব্যক্তি ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি উত্তম লোকে গমন পূর্ব্বক সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগ করিয়া থাকে। ইহাকেই সাষ্টি মুক্তি বলে।

যৎ করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যতি তৎসর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্॥
মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মত্তুল্যপ্রভাববান্॥

—শিবগীতা, ১৩।৭

কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, দান, ও তপস্যা ইত্যাদি যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন, যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি তাঁহার তুল্য প্রভাবশালী হইয়া তদীয় লোকে গমন পূর্ব্বক সুখভোগ করিয়া থাকে; ইহারই নাম সাযুজ্য মুক্তি।

"ইতি চতুর্ব্বিধা মুক্তি র্নির্ব্বাণঞ্চ তদুত্তরং" অর্থাৎ—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির পর নির্ব্বাণমুক্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ ব্যতীত কখন একটা নির্দ্দিষ্ট-কালস্থায়ী এই চারিপ্রকার মুক্তির পক্ষপাতী নহেন। কেননা এই মোক্ষ কর্ম্মাদি দ্বারা লাভ হয়—কিন্তু তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিতকাল সুখসম্ভোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই পরিমিতকাল অন্তে আবার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এ সকল সম্যক্ মুক্তির উপায় নহে—

রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে না। আত্যন্তিক দুঃখ মোচন বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার নামই যথার্থ মুক্তি,—তাহাই নির্ব্বাণ নামে কথিত হয়। পরমপুরুষার্থ নির্ব্বাণের নামান্তর, জগতের যাবতীয় জ্ঞানীব্যক্তি চিরকালই নির্ব্বাণরূপ নিরাপদস্থান লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়া গিয়াছেন। পরমপুরুষার্থ-বিচারই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ অঙ্গ। তাঁহারা প্রথমতঃ মানবজীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া তদনুকূল বলিয়া শাস্ত্রবিচারের অবতারণা করিতেন। অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে দার্শনিকেরা মূলতঃ বক্ষ্যমাণ তিনটী লক্ষ্য বিষয়ের একটীকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; দুঃখনিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপা-বাপ্তি (Self-realisation)। এতদ্ব্যতীত পূর্ণত্বলাভ (Perfection)-কেও কোন কোন দার্শনিক পরমপুরুষার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরিষ্টটল্ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীসীয় দার্শনিকগণ সাধারণতঃ পূর্ণত্বলাভকেই মূল লক্ষ্যরূপে উপস্থিত করিয়াছেন; ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও সুখলাভ, এতদুভয়ের বিরোধ সম্ভাবনা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; কাজেই কর্ত্তব্যতৎপরতা ও সুখাবাপ্তি এই দুইটিকে পরস্পরানুগামিরূপে গ্রহণ করিয়া, এতদুভয়ের ঐক্যরূপ পূর্ণত্বলাভকে পরমপুরুষার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

প্লেটোর মতে কেবল জ্ঞান অথবা সুখান্বেষণেই মানবজীবনের চরমলক্ষ্য পর্য্যবসিত হয় না। বস্তুতঃ বৃত্তিসমূহের পরস্পরাপেক্ষা স্ফুরণরূপ পূর্ণত্বেই আত্মা প্রকৃত জীবন লাভ করে। যদিও প্লেটো স্থানে স্থানে সুখকে দুঃখানুষঙ্গী ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আদ্যোপান্ত দেখিতে গেলে জ্ঞানানুসারী কর্ত্তব্যতৎপরতা (Virtue) ও সুখলাভ, এতদুভয়ের অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করাই প্লেটোর অভিমত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

* Vide Sidgwick's Methods of Ethics P. 106.

এরিষ্টটলের মতে শুভলাভই (Endaimonia) মানবজীবনের চরমলক্ষ্য। এই শুভলাভ সুখলাভের নামান্তর নহে। এরিষ্টটল্ ইহাকে "Perfect activity in a perfect life" অর্থাৎ—"সাধুজীবনের সাধুকর্ম্মানুষ্ঠান" বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন ; সুখ ইহার নিয়ত অনুষঙ্গী মাত্র। কাজেই দেখা যায় উক্ত দার্শনিকদ্বয়ের কেহই সুখ-বিরোধি-কর্ত্তব্য-তৎপরতার বিচার করেন নাই, এবং কর্ত্তব্যতৎপরতা ও সুখ এতদুভয়ের নিয়ত সহচারিত্ব বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করেন নাই। বস্তুতঃ সুখলাভ ও স্বরূপাবাপ্তি এতদুভয় হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে গেলে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের চরমলক্ষ্যত্ব কিছুতেই উপপন্ন হয় না। *

এরিষ্টটলের পরে ষ্টোয়িক্ ও এপিকিউরিয়ান্ মত এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষ্টোয়িক্‌দিগের মতে স্বভাবের অনুবর্ত্তন করাই মনুষ্যের চরমলক্ষ্য ; সুখানুসরণ ইহার বিরোধী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হইয়া বিষানুক্ত পক্কান্নবৎ সুখলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠপন্থা। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, দুঃখনিবৃত্তি ব্যতিরেকে ষ্টোয়িক্‌দিগের অন্য কোন প্রসিদ্ধ লক্ষ্য উপপন্ন হয় না। স্বভাবের অনুবর্ত্তনের (Conformity to nature) প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। ব্যাখ্যাতার ইচ্ছানুসারে ইহাকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ইউরোপের অধুনাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ইহার ছায়াপাত হইয়াছে ; জানিনা কি ঘোরান্ধকারে ইহার পরিণতি হইবে। এই ছায়াপাতের মূল ফরাসি মনীষী রুসো ;—অমানুষী কল্পনাবলে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ফরাসি পণ্ডিত মানবজাতির আদিম অবস্থার এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সেই চিত্রে ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা প্রভু ও ভৃত্য এই সমস্ত ভেদের

---

* Vide Sidgwick's Methods of Ethics, P. 392.

অস্তিত্ব নাই। তাই আসামান্য, অমূলক প্রাধান্য, তাঁহার মতে অত্যাচারের রূপান্তর, স্বার্থপরতার কুৎসিত পরিণাম। "Live according to nature" অর্থাৎ—প্রকৃতির অনুবর্ত্তন কর, অন্যায় অমূলক অস্বাভাবিক তারতম্য দূরীকৃত কর, ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র। বোধ হয় ইহা হইতেই পাঠকগণ ষ্টোয়িক্‌মতের অস্পষ্টার্থত্ব বুঝিতে পারিবেন।

প্রাচীন গ্রীসীয় দর্শনে এপিকিউরাসের মত, ষ্টোয়িক মতের প্রতিদ্বন্দী। এপিকিউরাস্ বসেন যে, সুখলাভই (Happiness) মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম্মের কোন মূল্য নাই। কিন্তু সুখের ব্যাখ্যা তাঁহার মতে স্বতন্ত্র ;—প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তন, সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তিসাধন এপিকিউরাসের মতে দুঃখবৎ হেয় এবং দুঃখাসম্ভিন্ন শান্তিই (Imperturbable tranquillity) সর্ব্বথা অনুসরণীয়। কাজেই একরূপ ধরিতে গেলে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই এপিকিউরিয়ান্ মতে পরমপুরুষার্থ।

এইত গেল প্রাচীনকালের কথা। আধুনিক পাশ্চত্য দার্শনিকেরা অনেকেই সুখ (Pleasure) কেই মানবযত্নের চরমলক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লক্, হিউম, মিল্ বেন্থাম্, বেইন্ ও সিজউইক্ প্রভৃতি দার্শনিকের ইহাই অভিমত। অন্যদিকে জর্ম্মান পণ্ডিত হেগেল্ ও তদনুবর্ত্তী গ্রীন, কেয়ার্ড্ প্রভৃতি দার্শনিক আত্মার পূর্ণত্ব (Self-realisation) সাধনকেই সর্ব্বপ্রকার শেষলক্ষ্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন,—

"To the self-conscious being, pleasure is a possible but not an adequate end ; by itself, indeed, it cannot be made an end at all, except by a self-contradictory abstraction,

(Caird's Kant, Vol. II, p, 230)

চিন্তাশীল মনুষ্যের নিকট সুখ অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে একটী লক্ষ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকে পূর্ণলক্ষ্য বলা যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাকে লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করাও অসঙ্গত। বস্তুতঃ সুখ আত্মপূর্ণত্বলাভের আনুষঙ্গিক ফল হইলেও, মূল-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহাকেই একমাত্র চরমলক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মত উদ্ধৃত হইল, এক্ষণে ভারতীয় দার্শনিকগণের মতাবলীও এই স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। ভারতে ছয়খানি মূল দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। যথা :—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥

গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খ্য, পতঞ্জলির যোগ, ব্যাসের বেদান্ত এবং জৈমিনীর মীমাংসক—এই ছয়জন ঋষির ছয়খানি মূল দর্শনশাস্ত্র। আবার উঁহাদের শিষ্যোপশিষ্যগণ বিরচিত বহু দর্শনশাস্ত্র বিদ্যমান আছে, তাহাও উক্ত নামধেয় শাস্ত্রান্তর্গত। এতদ্ব্যতীত চার্ব্বাক-দর্শন, বৌদ্ধদর্শন, পাশুপত বা শৈবদর্শন, বৈষ্ণব বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন প্রভৃতিও দার্শনিক ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত।

চার্ব্বাক মতে অঙ্গনালিঙ্গন ও ঋণ করিয়া ঘৃতসেবনই পরমপুরুষার্থ। কাজেই এতন্মতে পারতন্ত্র্যই বন্ধ ও স্বাধীনতাই মোক্ষস্বরূপ। দেখিতে গেলে আত্মনাস্তিক দেহাত্মবাদীদিগের পক্ষে দেহমুক্তিই চরমমুক্তি। ঈদৃশ মুক্তিবাদ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—"যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ শুনি শূকরে" অর্থাৎ দেহপাতে যে মুক্তি, তাহা শূকর কুক্কুরাদিরও হইয়া থাকে।

বৌদ্ধমতে সমস্ত বাসনার উচ্ছেদে যে শূন্যস্বরূপ পরিনির্ব্বাণ অধিগত হয়, তাহাই পরমপুরুষার্থ। নির্ব্বাণ আর আত্মোচ্ছেদ একই কথা। এই আত্মোচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির সাধনরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকিলে—বস্তুতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। তাহা না হইলে, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্তর হইতে অন্তরতম আত্মার উচ্ছেদে উদ্যুক্ত হইবে? বুদ্ধবংশ লেখক—বর্ত্তমান বৌদ্ধদিগের গৌরবস্থল রিজ্ ডেভিড্ (Rhys David) সাহেব নির্ব্বাণ শব্দে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, মনুষ্যের সত্তাবিলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নহে, কেবল মাত্র ভ্রম, ঘৃণা ও তৃষ্ণা এই তিনটীর আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্ব্বাণ শব্দে কথিত হয়।*

জৈনমতে আবরণমুক্তিই মুক্তি। এই আবরণ যাহাই কেন হউক না, দুঃখনিবৃত্তি বা সুখলাভের সাধনরূপেই তন্মুক্তি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে।

বৈষ্ণব মতে জীব ভগবানের নিত্যদাস, সুতরাং বন্দন-অর্চ্চনাদি করিয়া জীবস্বরূপ অর্থাৎ—প্রেমসেবোত্তরা গতিলাভই পরমপুরুষার্থ। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর ভিন্ন—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও মূঢ় জীব পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মাপন্ন, তাহাদের অভেদ উপপন্ন হয় না।

শৈব ও পাশুপত মতে পরমেশ্বর কর্ম্মাদিনিরপেক্ষ নিমিত্তকারণ। পশুপতি ঈশ্বর পশুপাশ বিমোক্ষের নিমিত্ত যোগের উপদেশ করিয়াছেন। যোগ ঐশ্বর্য্য ও দুঃখান্ত বিধান করে, ইহাই পরমপুরুষার্থ। শাক্তমতাবলম্বীরাও এই মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

---

*"Nirvana is therefore the something as a sinless, calm state of mind; and if translated at all, may best, perhaps, be rendered "holiness"—holiness, that is, in the Buddhist sense, perfect peace, goodness, and wisdom."

—"Buddhism" by Rhys David, Chap, IV. p. 112,

ভট্টমতাবলম্বিগণ (প্রসিদ্ধ ভট্টপাদ কুমারিল এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া, ইহা ভট্টমত নামে পরিচিত) বলেন, নিত্য নিরতিশয় সুখাভিব্যক্তির নাম মুক্তি। বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান তল্লাভের উপায়, কাজেই ইঁহারা গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং বলিয়া থাকেন যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অন্ধ পঙ্গু ইত্যাদি গৃহধর্ম্মে অক্ষম ব্যক্তিদিগেরই অবলম্বনীয়। ইহারা ঈশ্বর নাস্তিত্ববাদী। এখন কথা এই, ভট্টাভিমত নিত্যসুখ সম্ভাব্য কি না? বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাপেক্ষ সুখের নিত্যত্বসিদ্ধি কিছুতেই উপপন্ন হয় না ;—বিচ্ছেত্ত-সম্বন্ধ যাহার মূল, সে সুখের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? কাজেই সুখলাভকেই পরমপুরুষার্থরূপে নির্দ্দেশ করিতে গেলে, সুখের নিত্যত্বের দিকে না চাহিয়া পরিমাণাধিক্যই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জলদর্শনের যোগানুশাসনই মুখ্য লক্ষ্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যোগানুষ্ঠানের চরম অবস্থায় নির্বীজ সমাধি লাভে অতুল আত্মানন্দ অনুভব করাই, এতন্মতে পরমপুরুষার্থ। ইহাঁরা আত্মার বহুত্ব ও ঈশ্বর স্বীকার করেন,—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি মান ও সমস্ত জগতের নিমিত্তকারণ। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি, তত্ত্বাভ্যাস অথবা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা অধিগম্য। অতএব বলিতে হয়, বেদান্ত ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনাপেক্ষা পাতঞ্জল দর্শনের সূক্ষ্ম লক্ষ্য উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। যোগানুশাসন বেদান্তবাদীরও অবলম্বনীয়।

সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসক দর্শনের মতে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। কিন্তু এই দুঃখনিবৃত্তির প্রকার ভেদ আছে। সাঙ্খ্য বলেন,—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।

—সাঙ্খ্য দর্শন, ১।১

ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহারই নাম পরমপুরুষার্থ।

সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; আত্মা বহু ও পরস্পর ভিন্ন। আত্মা স্বামী, বুদ্ধি তাহার স্ত্রী, অবিবেকাবস্থাতে স্ত্রী জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ স্বামীতে আপনার কর্ত্তৃত্বাদি বিকারের আরোপ করিয়া অপরাধিনী, ও তৎফলে দুঃখভাগিনী হয়। কিন্তু সাধ্বী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সম্পন্না বুদ্ধি যখন পতি-আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান, তখন ইহ-জন্মে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া অন্তে পতিদেহে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে লীন হইয়া যান। ইহাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ। এতন্মতে আত্মার মুক্তাবস্থাই স্বাভাবিক, বন্ধ অজ্ঞানকৃত মাত্র—বন্ধই স্বাভাবিক হইলে শ্রুতিতে মোক্ষসাধনের উপদেশ বিহিত হইত না। সুতরাং বিবেকদ্বারা অজ্ঞান প্রশমিত হইলে দ্রষ্টার আত্মস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। ন্যায়দর্শনকার গৌতম বলিয়াছেন,—

> সুখ-দুঃখ-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরা-
> পায়ে তদন্তরাভাবদপবর্গঃ।
>
> —ন্যায় দর্শন, ১।১।২

দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের অববর্জ্জন বা অভাবরূপ যে সম্পূর্ণ সুখাবস্থা তাহার নাম অপবর্গ বা পরমপুরুষার্থ। ইঁহারা অনুমান প্রমাণবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। তবে যে সংসারে দুঃখের ক্রীড়া দেখা যায়, সে প্রাণিকৃত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে শ্রবণাদিক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে উক্ত দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স লব্ধ হয়, কারণ, মিথ্যা-জ্ঞানই অনাত্মপদার্থ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া তদনুকূল পদার্থে

রাগ, তৎপ্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ ও তন্মুখে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির নিরোধ হয়, পুনর্জ্জন্মের আর সম্ভাবনা থাকেনা, তখন পুরুষ ঘটী যন্ত্রবৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বদুঃখের মূলীভূত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে—ইহারই নাম পরমপুরুষার্থ। ইহাঁরাও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন।

বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা কণাদ ন্যায়দর্শনের ন্যায় অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন; এবং বহু বিষয়ে গোতমের সহিত কণাদের বিশেষ ঐক্য আছে। বৈশেষিক মতে আত্মা নিত্য, বিভু, ও অনুমেয়—সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষাদি তাঁহার লিঙ্গ। সুখ-দুঃখাদি বৈষম্য ও অন্যান্য অবস্থাভেদের ব্যবস্থার্থ আত্মার নানাত্বও স্বীকার করিতে হইবে—আত্মচৈতন্য আগন্তুক, ইচ্ছাদ্বেষাদির ন্যায় চৈতন্যও আত্মার গুণমাত্র। এই গুণসঙ্গ নিরস্ত হইলে আত্মা আকাশের ন্যায় অবস্থান করেন, ইহাই বৈশেষিক মুক্তি। সুতরাং এতন্মতেও অত্যন্তদুঃখ নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ।

মীমাংশকদর্শন—প্রণেতা জৈমিনি ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরীশ্বরবাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা; বস্তুতঃ বৈশেষিক মত নিরাকরণ করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ঈশ্বর না থাকিলেও মনুষ্য বিধিবিহিত কর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চসম্বন্ধ-বিলোপরূপ পরমপদ লাভ করিতে পারে—বেদের ইহাই অভিপ্রায়। জীব বহু, ও কর্ম্মের অনুচর—কর্ম্ম আপনা হইতেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। মোক্ষাবস্থাতে মনোবিনাশ হয় না, বস্তুতঃ আত্মা তখন মনকে লইয়া স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন। তাই তিনি বলিয়াছেন;—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখ-তৃষ্ণার বিশ্রাম-ভূমি। তাহাই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত।

বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখ-নিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখ নিবারণ কল্পেই মানুষের আকুল-আকাঙ্ক্ষার ছুটাছুটী। ঐকান্তিক দুঃখ নিরোধের নামই মুক্তি। ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজালজড়িত অদ্ভূত কথা নহে, প্রাণের অতি নিকটের কথা। তাই জগতের যাবতীয় দার্শনিকগণ "দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধকেই পরম পুরুষার্থ," বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রভেদ এই যে, বিভিন্ন দার্শনিক মতে ইহা বিভিন্নোপায়ে লভ্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এই বিভেদ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতীয় দার্শনিক মতেও অতি সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য প্রভেদ আছে। মাধবাচার্য্যের বর্ণনানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সারদাপীঠাধিরোহণ সময়ে এই বিভেদ প্রদর্শন করিতে আহূত হইয়া বক্ষ্যমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ;—

অত্যন্তনাশো গুণসঙ্গতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসম্বিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ ॥

—শঙ্কর বিজয়।

গুণসঙ্গের সম্পূর্ণ নিরোধ হইলে আত্মার আকাশের ন্যায় শূন্যরূপে অবস্থান, ইহাই বৈশেষিক মুক্তি ; ন্যায় মতে আনন্দ ও জ্ঞানসংমিশ্র পূর্ব্বোক্ত অবস্থাই মোক্ষাবস্থা। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে মুক্তির এরূপ ব্যাখ্যান স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপরসঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে। নৈয়ায়িক মতে অদৃষ্টবশে আত্মার সহিত মনের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় ; ইচ্ছা, দ্বেষ প্রযত্নাদির ন্যায় ইহা আত্মার একটী গুণ মাত্র। যদি বিমুক্ত অবস্থায় গুণসঙ্গতির অত্যন্ত নাশ হইল তবে চৈতন্য কোথায় থাকে, আনন্দই বা কিরূপে উৎপন্ন হয় ? তবে যদি দুঃখাভাবকেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বলা হয়, সে

স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহা হইলে বস্তুতঃ বৈশেষিক মতে ও নৈয়ায়িক মতে কি প্রভেদ রহিল? জৈমিনির মতে মন দিয়া আত্মার স্বরূপানন্দ ভোগই মোক্ষাবস্থা। কিন্তু মন ত অনিত্য পদার্থ, সুতরাং মনের সাহায্যে নিত্যানন্দ উপভোগ অসম্ভব। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল মতে আত্মার স্বরূপানন্দ উপভোগই মুক্তি। সুতরাং এতাবতা যতগুলি দার্শনিক মত আলোচিত হইল, তাহার আমূল বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপাব্যাপ্তি এই তিনটীকেই বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায় পরমপুরুষার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক উক্ত লক্ষ্যত্রয়ে সম্বন্ধ কি?—এবং উহাদের কোনটীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একদিকে দেখা যায় সংসার নানা দুঃখ সঙ্কুল; জীব নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখেই উপতাপিত, মনুষ্যজীবনেব আদিতে অন্ধকার, অন্তে অন্ধকার, মধ্যে সুখ-খদ্যোত ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়াই নিবিয়া যায়। এইরূপে ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িকসুখ দুঃখমূল, দুঃখানুষক্ত ও দুঃখলভ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া, পণ্ডিতেরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। কাজেই পরিণামদর্শী পণ্ডিতেরা বৈষয়িক রাগানুবিদ্ধ সুখলাভ হইতে দুঃখনিবৃত্তরই অনুসরণীয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিকে পরমপুরুষার্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি কি? ইহা ত অভাব-প্রকৃতিক (Negative) মাত্র। ভাবস্বরূপ সুখ হইতে ইহার স্বতঃপ্রাধান্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। সাঙ্খ্যবাদী ও নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা যে দুঃখনিবৃত্তির চরমলক্ষ্যত্ব প্রতিপাদন করেন, তাহা বস্তুগত্যা সুখনিবৃত্তিও বটে। কাজেই দেখা যায় একদল সুখের অনুরোধে দুঃখানুভব স্বীকার করিয়া সুখলাভকেই শ্রেষ্ঠ-লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করেন। অন্য পক্ষ দুঃখবাহুল্য দর্শনে সুখত্যাগ করিতেও সম্মত হইয়া অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির পরমপুরুষার্থত্ব প্রতিপাদনে যত্নপর হ'ন।

এখন কথা এই যে, এই দুই বিরুদ্ধপক্ষের সমন্বয় সম্ভবে কি না, আনন্দ ও অত্যন্তদুঃখ নিবৃত্তির যুগপদবস্থান সংঘটিত হইতে পারে কি না?

বেদান্ত দর্শন এই বিরোধের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈদান্তিক পরমপুরুষার্থ শুষ্ক দুঃখনিবৃত্তি মাত্রও নহে, ক্ষণভঙ্গুর সুখস্বরূপও নহে। বস্তুতঃ দুঃখ-মূলচ্ছেদ ও নিত্যানন্দ সম্পাদনই বেদান্তদর্শনের চরম লক্ষ্য। তাই মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

বিষয়োত্থসুখস্য দুঃখযুক্তেহপ্যলয়ং ব্রহ্মসুখং
ন দুঃখযুক্তম্।
পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন পুনস্তুচ্ছকদুঃখ-
নাশমাত্রম॥

—শঙ্কর বিজয়।

বিষয়জাত সুখসমূহ দুঃখযুক্ত নহে। সেই ব্রহ্মসুখই পরমপুরুষার্থরূপে অধিগম্য, তুচ্ছ দুঃখনাশ পরমপুরুষার্থ নহে। এই পরমানন্দ আত্মাতিরিক্ত অন্য সাধনা সাক্ষেপ নহে ; কাজেই ইহা বিষয়সুখের ন্যায় দুঃখানুষক্ত ও ক্ষণভঙ্গুর হইতে পারে না। অনাত্ম ও অনাত্মীয় পদার্থের 'অহং', 'মম' এই অভিমান দুঃখের নিদান ; জ্ঞানালোকে এই মিথ্যাভিমান দূরীকৃত হইলে দুঃখবীজ সর্ব্বথা দগ্ধীভূত হয়, এবং আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু আত্মার স্বরূপ কি?* বেদান্তশাস্ত্রে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কাজেই আত্মলাভ ও আনন্দ-

---

* আত্মার স্বরূপ এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় মৎপ্রণীত 'জ্ঞানীগুরু' গ্রন্থে সবিশেষ লেখা হইয়াছে, সুতরাং তাহা পাঠ না করিলে এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

লাভ একই কথা। এই অপূর্ব্ব আনন্দের বিনাশ অথবা হ্রাস সম্ভবে না; কারণ জ্ঞানদ্বারা স্বস্বরূপ একবার অধিগত হইলে আর তাহার বিচ্যুতি ঘটিতে পারেনা এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানফলে সমস্ত পদার্থ আত্মার সহিত ঐক্যভাব করিলে সুখবিরোধী অনাত্মীয় পদার্থসমূহ আত্মস্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। আনন্দানুভব পূর্ণত্বজ্ঞানের নিত্যসহচর; পূর্ণত্ব ও পূর্ণকামত্ব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিপাক। কাজেই একদিকে সুখহেতুর নিত্যসদ্ভাব, অন্য-দিকে সুখবিরোধীর অত্যন্তাভাব বিচার্য্যসুখের নিত্যত্ব সম্পাদন করে। একদিকে আত্মনাত্মবিবেক দুঃখবীজ উন্মূলিত করে, অন্যদিকে অদ্বৈত-জ্ঞান অদ্বৈতানন্দ উৎপাদিত করে। যে বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বিতীয় তাহাই সুখ; ত্রিবিধ-ভেদবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তু সুখস্বরূপ নহে। আত্মাই একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, কাজেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী। অতএব এই সুখসম্পাদক সমস্ত বস্তু আত্মতৃপ্তি-সম্পাদনার্থই প্রিয়রূপে পরিগণিত হয়।

সকলেই আত্মাস্তিত্ব-সন্তান ইচ্ছা করে, আত্মবিনাশ কাহারই প্রার্থনীয় নহে। সুতরাং আত্মপ্রেম প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। আবার সমস্ত বস্তু তাঁহারই প্রিয় সাধন করে, তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের উপযোগী বলিয়াই অন্য বস্তুতে প্রিয়ত্ব উপচারিত হয়, সুতরাং আত্মাই পরমানন্দস্বরূপ। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে কাজেই শোক-মোহ দূরে পলায়ন করে এবং নির্ব্বিঘ্নের আত্মানন্দ স্ফুরিত হয়। তাই শিবস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য সূত্রিত করিয়াছেন,— "আত্মলাভাৎ পরলাভলাভাৎ" অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। আত্মলাভ ব্রহ্মলাভ ও আনন্দলাভ একই কথা।—তাই মুনীশ্বর শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ বলিয়াছেন;—

ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি, শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা ॥—[পঞ্চদশী।

ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এবং আত্মবিৎ শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, সেই রসস্বরূপকে, প্রাপ্ত হইলে জীব আনন্দই হইয়া যায়; ইহার অন্যথা নাই; সুতরাং বেদান্ত-মতে আত্মসাক্ষাৎকারলাভ বা স্বস্বরূপে অবস্থানই মনুষ্যের পরমপুষার্থ। ইহাই সর্ব্বমত-সমন্বয়ী নির্ব্বাণ মুক্তি।

বেদান্তোক্ত নির্ব্বাণমুক্তি

সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ী ও সর্ব্ব-ভেদমত-সমঞ্জসা বেদান্তশাস্ত্রের উদারগর্ভে সর্ব্বাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বেদান্তের পরমপুরুষার্থ-বিচার প্রসঙ্গে যে নির্ব্বাণমুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন দার্শনিকের চরম লক্ষ্যস্থ, তন্মধ্যেই সন্নিবিষ্ঠ রহিয়াছে। আবার শুধু নির্ব্বাণমুক্তি নহে, বৈদান্তিক সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিকেও চরম-মুক্তির অবস্থান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর সমুদয় স্থান অধিকার করতঃ সকললোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাধক যখন এই মহান্ সত্যটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এবং এই ভাবটী ক্রমে যখন তাঁহার জীবনগত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি পরমেশ্বরের সহিত একলোকে বাস করেন। ইহাই সালোক্যমুক্তি। এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। যদিও বাহিরে পৃথিবীই তাঁহার বাসভূমি থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অনন্ত কালের জন্য

ব্রহ্মে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করতঃ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দযুক্ত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাবটী ক্রমে যখন সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে, তখনই তাঁহার সালোক্য মুক্তি সিদ্ধ হয়। সাধকের এইরূপ সালোক্যমুক্তির অবস্থা ক্রমে যখন অপেক্ষাকৃত গভীরতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্ম দর্শন বা ব্রহ্মসত্তা অনুভবের ভাব যখন সাধকের অন্তশ্চক্ষুর নিকট উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ করে, প্রেমময়ের প্রেমানন্দ যখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে দেখিতে পান; যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যখন তাঁহার চক্ষু "বিশ্বতশ্চক্ষুর" উজ্জল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই অবস্থার নামই সামীপ্য মুক্তি। যখন সাধকের এইরূপ সামীপ্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে আরও গভীরভাব ধারণ করে, এবং যখন তিনি পরমাত্মায় সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করতঃ আনন্দসুধাপানে নিযুক্ত হয়েন, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে সার্ষ্টি মুক্তি কহে। আর যখন ব্রহ্মকে আপনার সহিত অভেদরূপে অনুভব করেন, তখন সেই অবস্থার নাম সারূপ্যমুক্তি। তদনন্তর ক্রমে যখন সাধক ব্রহ্মসত্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন, অথাৎ ক্রমে যখন তাঁহার বুদ্ধি, মন ব্রহ্মে লয়-বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে নির্ব্বাণ বা চুড়ান্ত মুক্তি বলে। তাই বৈদান্তিক বলিয়াছেন ;—

> ব্রহ্মৈব মুক্তি র্ন ব্রহ্ম ক্বচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতম্।
> অত একবিধা মুক্তি র্ব্বেধসো মনুজস্য বা॥
>
> —বেদান্তসার, ৩ ৪।১০

বিশেষ রহিত যে ব্রহ্মাবস্থা বেদে তাহাকেই মুক্তি বলেন, সুতরাং মুক্তি পদার্থ একপ্রকার ব্যতীত নানা প্রকার হইতে পারে না, তবে সালোক্যাদি-রূপ যে বিশেষ কথন আছে, তাহা কেবল সাধকের অনুরাগ বা জ্ঞানের

গভীরতার তারতম্য মাত্র। নতুবা মুক্তি পদার্থ যাহাকে বলে, তাহা ব্রহ্ম হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই একরূপ। জ্ঞানের পরিপুষ্ট অবস্থায় সাধক যখন ব্রহ্মস্বরূপে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার চূড়ান্ত বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়।

এক্ষণে নির্ব্বাণ কি তাহা আলোচনা করা যাউক। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের ব্রহ্মনির্ব্বাণ শুনিয়া, অনেক অনধিকারী ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া,—কেহবা কিরূপ অর্থে নির্ব্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়, না বুঝিয়া—বেদান্তমতে দোষারোপ করতঃ অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। অনভিজ্ঞের বিজ্ঞতা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ,—বিশেষতঃ বিজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞের কথায় চিরকালই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট নির্ব্বাণ অনাস্বাদিত মধুবৎ, অর্থাৎ—যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন মধুর আস্বাদ—কুমারীর নিকট যেমন স্বামীসহবাস সুখ—একটা 'কি জানি কি' রকমের; কাজেই তাহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ ধারণা করিতে না পারিয়া মুন্সিয়ানা চা'লে বলিয়া থাকে যে "নির্ব্বাণ অর্থে আমরা নিবিয়া যাইতে চাই না, আমরা চিনি হবনা, চিনি খাইতে চাই"। চিনি খাইতে মিষ্টি বটে, কিন্তু চিনি হইলে তাহা সেবন করিয়া সমগ্র জীবের যে আস্বাদানন্দ তোমার ভিতরে অভিব্যক্তি হইবে—নিজের চিনির আস্বাদ কতটুকু? আর সমগ্রজীবের আস্বাদ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার সুখ তাহার কণাংশ নহে। চিনির আস্বাদলোলুপ স্বার্থপর ব্যক্তি কি আর ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীপাদের—

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে গোপীগণ কোটি আস্বাদয়॥

—চৈতন্যচরিতামৃত।

কে এই গোপীভাবের নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? রাধাকৃষ্ণের মিলনাত্মক আত্মার স্বরূপানন্দ উপভোগ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণউপভোগ কখনই গোপীভাবের আদর্শ নহে। নির্ব্বাণ অর্থে নিবিয়া যাওয়া নহে, বিলীন ভাবকেই নির্ব্বাণ বলে। আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ রামানুজ স্বামীও নির্ব্বাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন ;—

অহমর্থবিনাশে চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।

অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ॥

অর্থাৎ—অহং এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ (নির্ব্বাণ) স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ কথার প্রস্তাবের গন্ধ মাত্রে আমি পশ্চাৎ প্রস্থান করি। কিন্তু আমরা নির্ব্বাণ অর্থে "অহং" বিনাশ না বুঝিয়া, বরং তদ্বিপরীত "অহং" প্রতিষ্ঠাই বুঝিয়া থাকি ; সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের ইহাই অভিপ্রায়। ফলকথা, যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যে আত্মা অজর, অমর তাহা নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে?

সমস্ত শ্রুতি, দর্শন, পুরাণ, উপনিষৎ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে মুক্তি সম্বন্ধে যত কিছু বলা হইয়াছে তাহাদ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, জীবাত্মার স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি এবং স্বরূপ ত্যাগই বন্ধন। হৃদয়-গ্রন্থি সমূহের অর্থাৎ—জড় ও চৈতন্যের বন্ধন-গ্রন্থি সমূহের উচ্ছেদই মুক্তি এবং ঐ গ্রন্থির নামই বন্ধন। বস্তুর যথার্থ দর্শন বা ভ্রমবুদ্ধির অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই বন্ধন। চঞ্চলতা শূন্য মনের যে স্থিরভাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি এবং বহুবিষয়ে মনের যে গমনাগমন তাহাই বন্ধন। মনের যে শান্তিরূপ নির্ম্মল আনন্দ তাহাই মুক্তি এবং মনের যে প্রকাশ তাহাই বন্ধন। পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আস্থা না থাকার নামই মুক্তি এবং অনাত্মীয় পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকাও সুদৃঢ় বন্ধন। অনিত্য সংসারের

সমস্ত সংকল্প ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি এবং সংকল্পমাত্রেই বন্ধন.; এমন কি যোগাদি সাধনের সংকল্পও বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বা বাসনার ত্যাগই মুক্তি এবং বাসনা মাত্রেই বন্ধন। সকল প্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি এবং আশা মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে ভোগ-চিন্তার যে বিরাম তাহাই মুক্তি এবং ভোগ-চিন্তাই বন্ধন। সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগই মুক্তি এবং বিষয়সঙ্গই বন্ধন। দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তুর যখন সম্বন্ধ না থাকে তখনই মুক্তি এবং দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহাই বন্ধন। বিশেষ বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত বাক্য দ্বারা মুক্তির একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার স্বরূপভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই এবং স্ব-স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। তবে স্বরূপ সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব-স্বরূপে অবস্থানই যে মুক্তি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যথা :—

মুক্তিৰ্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

অর্থাৎ—অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয়, উদ্দালক, আরুণি শুকদেব, প্রহ্লাদ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বহু ব্যক্তি রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও মুক্তপুরুষ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বাণ অর্থে যে "অহং" নাশ নহে, ইহা আশা করি বুঝিতে পারিয়াছেন। নির্ব্বাণ অর্থে যদি স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে নিবিয়া যাইবে কে? পার্থিব সুখ-দুঃখ, পার্থিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব ভাবের বিলীন অবস্থাকেই নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদিগণ "নির্ব্বাণন্তু মনোলয়ঃ" অর্থাৎ মনের লয়কেই নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব জরা, মরণ ও পীড়াজনিত দুঃসহ দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়াকেই নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বাণ শব্দে সত্তা-

বিলোপ বা একবারে মহাবিনাশ নহে ; কেবল মাত্র ভ্রম, ঘৃণা ও তৃষ্ণা এই তিনটীর আত্যন্তিক, উচ্ছেদই নির্ব্বাণ শব্দে কথিত হয়। প্রফেসার মোক্ষমূলার নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন ;—

"If we look in the Dhamma-Pada, at every passage when Nirvan is mentioned, there is not one which would require that its meaning should be annihilation, while most of all, would become perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvan," that signification.

—Buddha Ghosha's Parable, P. XII.

জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন,—

এষ এব মনোনাশস্তু বিদ্যানাশ এব চ।
যদ্ যৎ সম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জ্জনম্॥
অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ॥

—যোগবাশিষ্ঠ।

যে যে বস্তু সংরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ। এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাহাই নির্ব্বাণ। অতএব অবিদ্যাজনিত মন নিবিয়া যাওয়াকেই নির্ব্বাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অপিচ—

মনোলয়াত্মিকা মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করি॥

—কামাখ্যা তন্ত্র, ৮পঃ

যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া জানিও।

অদ্বৈতমতপ্রতিষ্ঠাতা শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ।

—মণিরত্নমালা।

কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয়?—মনের নাশ হইলে। সুতরাং মুক্তির চরম-অবস্থাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। যখন সাধক শান্তাদি গুণযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরকে আত্ম-স্বরূপে অবলোকন করেন, সেই ব্যক্তি তখন পরম রসানন্দ-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অদ্বৈত পরব্রহ্মে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, ইহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে। যথা :—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ।
নির্ব্বাণং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি॥

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী যখন পুরুষত্যাগিনী হন, অর্থাৎ—যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণতা হন না, পুরুষকে বা চিৎ স্বরূপ আত্মাকে রূপরসাদি কোনরূপ আত্ম-বিকৃতি দেখাইতে পারেন না,—পুরুষ যখন নিগু‍র্ণ হন, অর্থাৎ—যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্ম-চৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত না হয়,—আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না, ঐরূপ নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি বলে। ইহাই সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বিগণের পরমপুরুষার্থ-বিচারের বিশ্রামভূমি। অতএব বেদান্তোক্ত নির্ব্বাণমুক্তি জ্ঞানী মাত্রেরই চরম লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

মুক্তিলাভের উপায়

——:*:——

বেদান্তোক্ত নির্ব্বাণমুক্তিতেই যখন সর্ব্বমতবাদীদিগের পরমপুরুষার্থরূপ চরম লক্ষ্যত্ব লক্ষিত হইতেছে, তখন তল্লাভেই সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্বরূপপ্রতিষ্ঠায় নির্ব্বাণমুক্তি সাধিত হয়, সুতরাং স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরূপে? এই হেতু মুমুক্ষুব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে স্বরূপের অনুসন্ধান করিবে। আমরা বেদান্তমতের পক্ষপাতী, কাজেই, এস্থলে বেদান্ত-প্রতিপাদিত স্বরূপের অনুসরণ করিব।

বেদান্তমতে ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে না। কেন না,—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এ জগৎ সমুদায়ই ব্রহ্ম, যেহেতু তজ্জ—তাঁহা হইতে জন্মে, তল্ল—তাঁহাতে লীন হয়, এবং তদন্—তাঁহাতে স্থিতি করে বা চেষ্টিত হয়। সুতরাং বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, জীব, জন্তু, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে কিছু বস্তু আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই ব্রহ্ম। কারণ এক ব্রহ্ম বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিবে? পরব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত, অনন্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার্য্য, তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ অনন্তসত্তা এক বই দুই হইতে পারে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। যাহা অনন্তরূপে সর্ব্বব্যাপী তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্তুর সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তুই অবস্থান করিতেছে। একথা যদি

প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসত্য। জগৎ আবার অনন্তসত্তা হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদি বল, জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএব জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে। এক ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতঃপ্রোত হইয়াছেন। কোন ন্যায়ে এযুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদার্থ, তাঁহারা পারতঃ পরমেশ্বরের অনন্তসত্তার অস্তিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করেন না। যখনই বলিলে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার করিলে। যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদি। যাহার আদি আছে, তাহার সীমা ও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না। সুতরাং অনন্তপদার্থ অনাদি। অতএব ব্রহ্ম যদি অনাদি ও অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মের শরীর ও রূপ। তিনি অনন্তবিশ্বের বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন; এবং এই অনন্ত-বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল মাত্র পরব্রহ্ম পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন—"আমি বহু হইব,"—তাই চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎরূপে এক বহু হইয়াছেন। সুতরাং এই জগৎ ব্রহ্মবস্তু এবং আমাদের আত্মাও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা। যখন মনুষ্যরূপী অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা মুক্তি।

আমিই ব্রহ্ম; ইহাই আমার স্বরূপ, কিন্তু মায়াপরিশূন্য 'আমি' ব্রহ্ম, —মায়োপাধিক 'আমিই' জীব। জীবে চৈতন্য ও চৈতন্য-চালক শক্তি

বিদ্যমান আছে। চৈতন্য ঈশ্বর,—চৈতন্য-চালক শক্তিই মায়া। যেমন বাসনা সহযোগে জীব নানারূপী, নানা ক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়ার সহযোগে চৈতন্য নানা ক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। জীব মায়াধিকৃত চৈতন্য মায়ামুক্ত ব্রহ্ম।

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময়। চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে, জড় ও চৈতন্যমধ্যবর্ত্তী উভয়ের সংমিশ্রণ—চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বরবাসনা বলে। যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায়। মায়া লয় পাইলে জগৎ লয় পায়। চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সৎ এই দুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে যে স্থূল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়া বা প্রকৃতি। অতএব এক চৈতন্যই বাসনাতে পরিবর্ত্তিত। সূর্য্য যেমন আপন শক্তিতে স্থূল ভূতরূপে জলবর্ষণ করেন, আবার সূক্ষ্মভাবে উহা গ্রহণ করেন,—সেইরূপে ঈশ্বর বাসনাযুক্ত হইয়া জীব হয়েন, আবার বাসনাবিযুক্ত হইলে স্বয়ং হয়েন। ঈশ্বর চৈতন্যের আকর। তাঁহার সক্রিয়ভাব বাসনা তাঁহাতেই লীন হয় বা হইতে পারে, যে অংশে বাসনা নাই, সেই অংশ নিত্য ও সর্ব্বাধাররূপে বর্ত্তমান। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখ্য, আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহ পরিচ্ছেদে নানা দেহে ভেদপ্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। মন প্রতিশরীরে বিভিন্ন, সুতরাং সুখ-দুঃখ, শোকসন্তাপ, জন্ম-মৃত্যু, বন্ধন ও বিমুক্তি প্রভৃতিও ভিন্ন। যথা:—

ঈশ্বরেণৈব জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।
বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ॥

—দ্বৈতবিবেক।

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ ভাব জন্য জীব ও ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার উপাধি হইয়াছে। কারণভাব জন্য অন্তর্য্যামী ঈশ্বরোপাধি এবং কার্য্যভাব জন্য অহংপদবাচ্য জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও কার্য্য-কারণভাব জন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই দ্বৈতভাব নিবারণের উপায় বিবেক, জীবের বিবেকজ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধচৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট শুদ্ধচৈতন্যই অদ্বৈতব্রহ্ম। এইরূপ অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সংসারবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায়।

এখন কথা এই যে, যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিলনা; একমাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনন্ত-দেশ অধিকার করতঃ বর্ত্তমান ছিলেন,—যদিও এই জগতের উপাদান সকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন নাই, তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় শক্তি হইতেই এসমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; যদিও তিনি ইহার সর্ব্বস্ব; তথাচ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতা, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি, এসমস্তই যে জড় ও জীব ভাবাপন্ন ব্রহ্ম, একথা নিম্নাধিকারী জনগণ বিশ্বাস করিতে পারে না। উপরন্তু বিজ্ঞতা করিয়া বলিয়া থাকে,—"জ্ঞানময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ও জড়জগৎরূপে পরিণত হইলেন, এ কথা আদৌ গ্রাহ্য নহে।—আমরা যে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, ইচ্ছা করিয়া অবিদ্যা-বচ্ছিন্ন হইয়া সংসার-তাপে তাপিত হইতেছি এবং আমার সম্মুখস্থ ঐ দস্যুগণ এবং ঐ শিবিকা বাহকগণও সেই ব্রহ্ম—অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে এই মর্ত্ত্যলোকে জীবিকার জন্য সদসৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে, একথা উন্মাদ না হইলে গ্রাহ্য করা যায় না। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবজগৎকে যাহারা মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ করে না, তাহাদিগকে নির্লজ্জ নাস্তিক ব্যতীত মুক্ত পুরুষ কে বলিবে?"

বেদান্তবাদী কিরূপ অর্থে "জগৎ মিথ্যা" এই ভাবটী গ্রহণ করেন, তাহা না বুঝিতে পারিয়া ভেদ-বাদিগণ ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। আচার্য্যপাদ রামানুজও ইহার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। বৈদান্তিক বলেন;—জগৎও ব্যবহারিক জ্ঞানে সত্য। কিন্তু ভ্রম দূর হইলে যেমন সর্প ও রজতজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া রজ্জু ও শুক্তি মাত্র বর্ত্তমান থাকে; তদ্রূপ জ্ঞানাবস্থায় জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তাই জগৎ অসত্য। অবস্তুতে বস্তুজ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা নহে,—শূন্যে সর্পভ্রম নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র। সুতরাং যতক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ সর্প সত্য; কিন্তু ভ্রম অন্তর্হিত হইলে রজ্জুজ্ঞান হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানাবস্থায় ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়; যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণ জগতও সত্য; কিন্তু ভ্রম দূর হইলে জগতের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন; তখন কাজেই জগৎ মিথ্যা। ব্যবহারিক জ্ঞানে জগৎ সত্য, কেবল পারমার্থিকজ্ঞানে মিথ্যা মাত্র। এতদ্রূপে অজ্ঞানাবস্থায় ব্যবহারিক জীব, জ্ঞানাবস্থায় পারমার্থিক ব্রহ্ম। "তত্ত্বমসি" বাক্যদ্বারা আত্মাকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং "নেতি, নেতি" বাক্যদ্বারা এই মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাশ করিয়া শ্রুতিবাক্য সকল এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* তত্ত্বমসি বাক্যটীর "তৎ" পদের অর্থ পরিশুদ্ধ পরমাত্মা ও "ত্বং" পদের অর্থ ব্যবহারিক জীবাত্মা। এই "তৎ" ও "ত্বং" পদের যে ঐক্য, তাহাই "অসি" পদের দ্বারা সাধিত

*মৎপ্রণীত "জ্ঞানীগুরু" পুস্তকে ব্রহ্মবিচার, মায়াবাদ, জগৎ প্রপঞ্চ, জীবেশ্বরভেদ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি, বিরুদ্ধবাদির যুক্তিও যথারীতি খণ্ডিত হইয়াছে, সুতরাং এ সকল তত্ত্ব সম্যক্ জানিতে হইলে উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপযুক্ত অংশই এখানে আলোচিত হইল মাত্র, সুতরাং, জ্ঞানহীন ব্যক্তি অংশমাত্র পাঠে উহার জ্ঞানের বিরাট্‌ভাব বুঝিতে পারিবে না।

হয়। যদি বল, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাত্মার ঐক্য কিপ্রকারে সম্ভব হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন, "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থস্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব, অল্পজ্ঞত্বাদিরূপ যে বিরুদ্ধ অংশ সকল, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক "ত্বং" পদটী শোধন করিয়া লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে—যাহা অস্তি, ভাতি ও প্রীতিরূপে সর্ব্বাবস্থায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—গ্রহণ করিলে ব্রহ্মচৈতন্য এবং জীবচৈতন্য মধ্যে কেবল এক চৈতন্য অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং চৈতন্যপক্ষে ঐক্য সম্ভব হয়।

পাঠক! অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক কিরূপে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য করিয়াছেন, বোধ হয় বুঝিয়াছ? জীব-ব্রহ্মের নির্গুণ একত্ব প্রতিপাদনই অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য; নতুবা গুণের একত্ব মূর্খেও কল্পনা করিতে পারে না। তবে ঐক্য শব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিত নয় যে, দুই বস্তুর পরস্পর সংযোগ দ্বারা ঐক্য করা;—ঐক্য অর্থাৎ একতাভাব, ইহা একই—এরূপ জ্ঞাত হওয়া। যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্তু রহিয়াছে—এ সেই বস্তুই, সেই বস্তু এক এবং এই বস্তু অন্য—এরূপ ভাব নহে। কেবল সেই বস্তুই ভ্রমবশতঃ অন্য বস্তু বলিয়া কল্পিত হইতেছে মাত্র; সুতরাং এরূপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকার্য্য নহে—ভ্রম মাত্র। সুতরাং এ স্থলের ঐক্য দ্বারা দুই বস্তুর একতা বুঝাইতেছে না, কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, পূর্ব্বে তুমি যা ছিলে—সেই তুমিই এই হইয়াছ। ব্যবহারিক জ্ঞানের জীব, পরমার্থিক জ্ঞানে ব্রহ্ম; সুতরাং জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম। আমার স্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ ঐক্যজ্ঞানে যাঁহার প্রতীতি বা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত।

ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ। অবিদ্যাপ্রভাবে ব্যবহারিক-দশায় স্বপ্নসন্দর্শনের ন্যায় অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন

ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ, যে মানুষ সেই মানুষ, তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয় ; সেইরূপ অবিদ্যার ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যথা—

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনা-
হীনমেকম্।
তথা ধী-বিয়োগে নিরাভাসকো যঃ স নিত্যোপলব্ধি-
স্বরূপোঽহমাত্মা।

—হস্তামলক।

যেমন দর্পণের অভাব হইলে তদ্গত প্রতিবিম্বেরও অভাব হয়, তখন উপাধিরহিত মুখমাত্রই অবশিষ্ট থাকে ; তদ্রূপ বুদ্ধির অভাব হইলে প্রতিবিম্বরহিত যে আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই পরমার্থ সত্য নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই আমি। যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই মুক্ত। তাই মুক্তপুরুষ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

অর্থাৎ—অসংখ্য গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি শ্লোকার্দ্ধে বলিতেছি—"ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্মভিন্নও জীব আর কেহ নহে।" বেদবেদান্ত এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। সদ্‌গুরুর কৃপায় জীবের এই চক্ষু উন্মিলিত হইলে, জীব আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া মুক্ত হয়। যথাঃ—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—শ্রুতি।

পরাবর অর্থাৎ কার্য্যকারণস্বরূপ সেই পরমাত্মা জীবকর্ত্তৃক অধিগত হইলে, তাহার হৃদয় দ্বিধাকৃত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং ত্রিবিধ কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করে।

অতএব একমাত্র বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—এক পরোক্ষজ্ঞান,—অপর অপরোক্ষ-জ্ঞান। প্রথমতঃ ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হইয়া পরোক্ষজ্ঞান জন্মে, তৎপরে যখন ব্রহ্মস্বরূপ,—স্ব-স্বরূপে উপলব্ধি হয়, তখন অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করে। ব্যবহারিক দশায় জীবেশ্বরে স্বগত ভেদ,—স্থূলকথায় ব্রহ্ম খাঁটি সোনা, আর জীব খাদমিশান সোনা। তবে কেহ বা অল্প খাদের, আর কেহ বা অধিক খাদের, তাই জীবে জীবে বিভেদ দৃষ্ট হয়। অনেক খাদে অল্পমূল্যের সোনা, আর অল্পখাদে অধিক মূল্যের সোনা। কিন্তু খাঁটি সোনা-কেও সোনা বলে, আর অল্পাধিক যেরূপ খাদমিশানই হউক, তাহাকেও সোনা বলে। তবে তাহাদের মধ্যেও স্বগত ভেদ আছে,—বর্ণের ও গুণের পার্থক্য আছে। কিন্তু স্বর্ণকার যেমন আগুনে গলাইয়া পদার্থবিশেষের সাহায্যে তাহাকে পুনরায় পাকাসোনা করিতে পারে, এবং তখন খাঁটি সোনার সহিত তাহার কোন পার্থক্য থাকে না, তদ্রূপ জীব, বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদ সম্পন্ন,—সেই বাসনা-কামনার বা অবিদ্যার খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে। ইহাই মোক্ষলাভ, ইহার নাম কৈবল্য প্রাপ্তি, ইহাতেই দ্বৈতনিরোধ বা অদ্বৈতসিদ্ধি।

যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্‌জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রহ্মেত্যবধারয়॥

যাঁহার লাভ হইতে আর লাভ নাই, যাঁহার জ্ঞান হইতে আর জ্ঞান নাই, যে সুখ হইতে আর সুখ নাই, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সুতরাং ব্রহ্মে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি অপেক্ষা আর পরমপুরুষার্থ কি হইতে পারে?—ইহারই নাম নির্ব্বাণমুক্তি। আত্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। "জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তিঃ" সুতরাং একমাত্র জ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায়।

বৈরাগ্য-অভ্যাস

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়। আবার আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং" ভক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিকসিত হয়। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি প্রথমতঃ বেদবিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াকলাপাদি সম্পাদন করিবে, তৎফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার হইবে। যখন মুক্তি লাভে বলবতী ইচ্ছা জন্মিবে, তখন আত্মস্বরূপ লাভের জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানালোচনা করিবে। শমদমাদিসম্পন্ন বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিই মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে জ্ঞানালোচনার অধিকারী হন। নতুবা কর্ম্মীব্যক্তিকে জ্ঞান কথা বলিয়া বুদ্ধি-বিভেদ জন্মাইতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। যথা :—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিণাম্।

—শ্রুতি।

মুমুক্ষুব্যক্তি বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত হইয়া জ্ঞানালোচনা করিবে। আত্মানাত্মবিচারের নাম বিবেক এবং আত্মবস্তুতে লক্ষ্য রাখিয়া অনাত্মীয় বস্তুতে যে অনুরাগ পরিহার, তাহাই বৈরাগ্য। একমাত্র ভক্তির সঞ্চারেই বৈরাগ্য সাধিত হয়। আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা যেরূপ অনাত্মীয় বস্তুতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারাও ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ের বিরাগ জন্মিয়া থাকে। বিবেক ও ভক্তি এই দুই বৃত্তির অনুশীলনেই বৈরাগ্য হয়। তবে বিবেকজাত বৈরাগ্যে এবং ভক্তিজাত বৈরাগ্যে স্থূলতঃ পার্থক্য আছে। আমরা পুরাণের—

হরগৌরী মূর্ত্তি

আদর্শ করিয়া এ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। হরগৌরী উভয়েই সংসারত্যাগী শ্মশানবাসী, উভয়েই বৈরাগী বলিয়া ভক্তের নিকট পরিচিত। কিন্তু হরের বৈরাগ্য বিবেকলব্ধ, আর গৌরীর বৈরাগ্য ভক্তিমূলক—প্রেমই তাহার মূল। যোগেশ্বর হর আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা নিত্য আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সমস্ত অনাত্মীয় পদার্থে বিরাগ বশতঃ আত্মারাম হইয়াছেন। তাই বিষয়ের অনিত্যতা জাগরূক রাখিবার জন্য স্বর্ণপুরী ও কুবেররক্ষিত ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া, মরণের মহাক্ষেত্র মহাশ্মশানে তিনি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নরকপাল তাঁহার জলপাত্র, মানবের দগ্ধাবশেষ চিতা-ভস্ম তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, কখনও দ্বীপিচর্ম্মবাসে কটিদেশ আবৃত, কখনও বা দিগম্বর। ভোগীর পক্ষে কি কর্কশ—কি কঠোর—কি ভীষণ মূর্ত্তি! আর প্রেমময়ী গৌরী হরের জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহার অনুরাগে উন্মাদিনী হইয়া শ্মশানবাসী শিবসঙ্গে সোনার অঙ্গে রঙ্গে ছাই মাখিয়াছেন। গৌরী শিবকে চান, নিত্যানিত্যবিচারের তাঁহার অবসর নাই; শিবকে পাইবার জন্য তিনি সব করিতে পারেন। শিব সন্ন্যাসী, তাই তিনিও শ্মশানবাসিনী,

আজি শিব রাজা সাজিলে বিনা প্রতিবাদে গৌরী রাজরাজেশ্বরীরূপে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবেন। গৌরীর ভক্তির প্রেমের ত্যাগ, তাই স্বরূপেই শিবপার্শ্বে শোভা পাইতেছেন, শিবের ন্যায় বিরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! প্রেম বিবেকের অনুসরণ করিতেছেন, বিবেক তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই হর-গৌরী সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে ব্রহ্মতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, বিবেক-বৈরাগ্যতত্ত্ব, প্রেমভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি কোন তত্ত্বই বুঝিতে বাকী থাকে না। এ বিষয়ে শতমুখে পুরাণকারের কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হয়। ভগবান্ বেদব্যাসদেব ব্যতীত এরূপ চিত্র কবিত্বের তুলিতে আর কেহ চিত্রিত করিতে পারেন নাই।

পাঠক! ভক্তির বৈরাগ্য বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ? ভক্তির বৈরাগ্য অপ্রামাণ্য নহে। আমরা ভক্তিতত্ত্বে দেখাইয়াছি যে, পরানুরক্তি-বৃত্তির বিষয়ের দিকে গতি হইলে আসক্তি এবং ভগবানের দিকে গতি হইলে ভক্তি নামে আখ্যাত হয়। সুতরাং আসক্তি ও ভক্তি একাধারে একই সময়ে থাকিতে পারে না, একথা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে। আবার আসক্তি পরিহার এবং বিষয়-বিরক্তি একই কথা। সুতরাং ভক্তিলাভ করিতে পারিলে আপনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বরং বিবেকজ-বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিজাত বৈরাগ্য স্বাভাবিক। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ও প্রাণের টানে যে বিভেদ, বিবেক ও ভক্তি এই উভয়জাত বৈরাগ্যেও পরস্পর সেইরূপ বিভিন্নতা। পরের ছেলে মরিলে কর্ত্তব্য জ্ঞানে শোকসভা করিয়া শোক-প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু আপন ছেলে মরিলে তার শোক সভার প্রয়োজন হয় না, ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া লুটাইতে দেখা যায়। কারণ এখানে যে প্রাণের টান। পরের ছেলেকে বাঘে ধরিলে বলবান্ পুরুষেরও কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিচার আনিয়া উপস্থিত করে—তাহাকে

বাঘের ও নিজের শক্তিসম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হয়; কিন্তু সেই ছেলের ষোড়শী যুবতী জননী—যিনি কুক্কুরের ডাকে শঙ্কিত-হৃদয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন—তিনি সে সময়ে নিকটে থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সন্তানের প্রাণরক্ষার্থ বাঘের মুখে গমন করিতেন, বাঘের বা নিজের শক্তিসম্বন্ধে বিচার করিবার সময়ই হইত না। সুতরাং বিবেক অপেক্ষা ভক্তিজাত বৈরাগ্য স্বাভাবিক। ভক্ত বিষয়সমূহে আসক্ত বা বিরক্ত নহে, তাই বিবেকীর কঠোরতা ও কর্কশতার পরিবর্ত্তে প্রেমিকের সুন্দরতা ও মধুরতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবানের জন্য ভক্ত সব করিতে পারেন,—তাঁহাকে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠও ভক্তের স্পৃহণীয় নহে, আবার তাঁহাকে পাইলে তিনি নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত হন না। তাই বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করতঃ ভগবান্ সম্বন্ধে যে আগ্রহ জন্মে, তাহাকেই বৈরাগ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিবেকী আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করতঃ অন্তর্ম্মুখীন্ হইয়া পড়েন, আর ভগবান্‌কে বুকে করিয়া ভক্ত সবই ভোগ করিয়া থাকেন। ভগবান্‌কে বুকে করিয়া ভক্ত মহাশ্মশানেও সুধাংশুসৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, আবার তাঁহাকে হারাইলে নন্দনকাননও ভক্তের নিকট মরুভূমি হইয়া যায়। বিবেকী আত্ম-স্বরূপ চাহেন; ভক্ত ভগবান্‌কে বুকে করিতে ব্যাকুল। কাজেই তাঁহাদিগের লক্ষ্য বৈরাগ্যেও কিছু প্রভেদ আছে। তাই ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনভেদে—ভাব-ভেদে কেহ কঠোর কেহ সরস, কেহ শুষ্ক, কেহ তাজা, কেহ বিলাসী, কেহ উদাসী, কেহ

গম্ভীর, কেহ বাচাল, কেহ রসাল, কেহ ভয়াল, কেহ শিষ্ট, কেহ ভ্রষ্ট, কেহ রুষ্ট, কেহ তুষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়।

বিবেকী বা ভক্তের লব্ধ বৈরাগ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও মুক্তি-পথে যে বৈরাগ্য প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কারণে বিষয় বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিবে। মুক্তি-প্রদ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশক বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলং॥

—অপরোক্ষানুভূতি, ৪

কাকবিষ্ঠাতে যদ্রূপ কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না, তদ্রূপ সত্যলোক হইতে মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত বিষয়ে যে অনিচ্ছাভাব, তাহারই নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য অতি নির্ম্মল পদার্থ। বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ—চিরাভ্যস্ত বহির্গতি ফিরিয়া অন্তর্মুখী গতি জন্মে। তখন কেবল আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ হইতে থাকে। এবম্প্রকার আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই সংসারাসক্তি পরিত্যাগ হয় না, আবার সংসারাসক্তি পরিত্যাগ না হইলেও নিবৃত্তি-পথাবলম্বনে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; সুতরাং যত্নের সহিত বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হয়। যথা:—

জন্মান্তরশতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসারবাসনা।
সা চিরভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ॥

—মুক্তিকোপনিষৎ, ২।১৫

যে মিথ্যা সংসার-বাসনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্ম হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা চির-অভ্যাসযোগে বৈরাগ্যসাধন ব্যতীত কোন উপায়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। অতএব এই দারুণ সংসারযাতনার নিবারণ জন্য শাস্ত্রালোচনা কর, সাধুসঙ্গ কর, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কর, এবং তপস্যাদ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া শুভবুদ্ধির উপায় কর, তাহা হইলে আপনিই বৈরাগ্য উদয় হইবে। সাধুসঙ্গদ্বারা বৈরাগ্যবীজ সঞ্চিত হইয়া আপনা আপনি যথাকালে অঙ্কুরিত হয়। কারণ সাধুগণ কখনও অনিত্য বা বৃথা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন না এবং তদ্বিষয়ের কল্পনাও করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের সঙ্গিগণও সেইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কালে তদ্রূপ মনোবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বৈরাগ্যবীজ অঙ্কুরিত হয়।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল আপন আপন আশ্রমবিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশাদি ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্ম সকল করিবে, যে হেতু এই ত্রিবিধ কারণে চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত বিবেক উপস্থিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে সাত্ত্বিক বৈরাগের উদয় করাইয়া দেয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার হইয়াও শীঘ্র বৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে। যথা :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।৭

ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির সংযোগে শীঘ্রই জ্ঞানের কারণ বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ সাত্ত্বিকবৈরাগ্য ভিন্ন রাজসিক বা তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। রাজসিক ও তামসিক বৈরাগ্যই শাস্ত্রে নৈমিত্তিকবৈরাগ্য নামে উক্ত হইয়াছে। এই

অবনীমণ্ডলে মনুষ্য সকলের কখন কখন কোন না কোন কারণ বশতঃ নৈমিত্তিকবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিতে যাইয়া, কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদির আকস্মিক মৃত্যুতে, অথবা শত্রুকর্ত্তৃক কি দৈব-দরিদ্রতায় উৎপীড়িত হইয়া যে বৈরাগ্য জন্মে এবং কুঁড়ে, অকর্ম্মা, কাপুরুষের বৈরাগ্যকে নৈমিত্তিকবৈরাগ্য কহে। কেহ কেহ ইহাকে মর্কট বা ফল্গু বৈরাগ্য বলে। সেরূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কারণ উহা কেবল বাসনার অপূরণে অথবা ভোগ্য বস্তুর অভাবে কিম্বা কোনরূপ আশঙ্কায় উপস্থিত হয় মাত্র। তাহারা কিছুদিন পরে আবার বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, নতুবা ত্যাগিসমাজে কলঙ্ক-কালী লেপন করিয়া বেড়ায়। তবে কাহারও কাহারও এরূপ বৈরাগ্যও কাকতালীয়ের ন্যায় * প্রকৃতবৈরাগ্যে পরিণত হয়। যে বৈরাগ্য নিমিত্তরহিত অর্থাৎ—যাহা অকারণে পবিত্র মানসক্ষেত্রে আপনা হইতে উদিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক বৈরাগ্য।

বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মদ্বারা পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি না হইলে অনিমিত্তক সাত্ত্বিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না। তাই ভগবতী গৌরীদেবী গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন ;—

তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে।
চিত্তশুদ্ধ্যর্থমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥

—শ্রীমদ্দেবীভাগবত, ৩৩।১৫

* কাকতালীয় যথা—পরিপক্কাবস্থায় তালফলের পতনকাল উপস্থিত হইলে ঠিক সেই সময়ে তদুপরি কাক বসিবামাত্র তাল ফলটী ভূমিতে নিপতিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে, কাকে তাল ফেলিয়া দিল, কিন্তু বাস্তবিক কাকের ভরে তাল পড়েনা। পতন সময় উপস্থিত হইলে আপনিই পড়ে, কাক নিমিত্ত মাত্র। তদ্রূপ বন্ধু-বিয়োগাদি নৈমিত্তিক কারণে বৈরাগ্য

হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাবৎ যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বৈরাগ্যের উদয় হইতে পরিপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ত্তৃক চারিটী স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয়, চতুর্থ বশীকার। প্রথম অবস্থায় বৈরাগ্য অঙ্কুরিত হইয়া বিষয়-বাসনাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মে; এই অবস্থার নাম যতমান বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় কতক বাসনা থাকে এবং কতক নষ্ট হইয়া যায়। যেগুলি থাকে সেই গুলিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করার নামই ব্যতিরেকবৈরাগ্য। তৃতীয় অবস্থায় সমুদয় বাসনা নষ্ট হইয়া যায়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ইহাই একেন্দ্রিয়বৈরাগ্য। চতুর্থাবস্থায় সংস্কারটীও লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ—আদৌ কোন প্রকার বাসনার উদ্রেকই হয় না। এই অবস্থাটী বৈরাগ্যের চরম, ইহাকেই বশীকার নামক উত্তম বৈরাগ্য বলে। যথা:—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।

—পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৫ সূত্র।

দৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ ইহকালে যাহা দেখা ও ভোগ করা যায় এবং আনুশ্রাবিক বিষয় অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে যে স্বর্গাদিভোগ বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, এই দুইটী বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, সেই অবস্থাকে বশীকার-বৈরাগ্য বলে। ইহাই বৈদান্তিকের "ইহমুত্রার্থফলভোগবিরাগ" রূপ উত্তম বিবিদিষা-বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্যই মানবের সংসারমূল ছেদন করিবার

জন্মিয়া স্থায়ী হইলে, বুঝিতে হইবে বন্ধু বিয়োগাদি নিমিত্ত মাত্র; তাহার জন্মান্তরের শুভফল পরিপক্ক হইয়াছিল। নতুবা সকলেরই বন্ধুবিয়োগ হইতেছে, কিন্তু বৈরাগ্য জন্মিতে কাহারও দেখা যায় না।

খড়্গাস্বরূপ। যাহার বৈরাগ্য জন্মে নাই, সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, যথা :—

নহ্যসংজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি।

—শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ।

অতএব বৈরাগ্য ব্যতীত দেহবন্ধন বিমুক্তির আর অন্য উপায় নাই। কারণ বৈরাগ্যযুক্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসনা সকল আপনা হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বাসনা ক্ষয় হইলেই নিঃস্পৃহ হওয়া হইল—নিঃস্পৃহ হইলেই আর কোনরূপ বন্ধন থাকে না; তখনই মুক্তিলাভ হয়। যথা,—

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নষ্টসর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥

— মুক্তিকোপনিষৎ ২।২২

সমাধি অথবা কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হউক আর নাই হউক, যে ব্যক্তির হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা উদিত হয় না, সেই ব্যক্তিই মুক্ত। কেননা, অনাত্ম-বাসনা অর্থাৎ মিথ্যা সংসার-বাসনা-সমূহ-দ্বারা পরমাত্ম-বাসনা আবৃত আছে, এজন্য বৈরাগ্য দ্বারা অনাত্ম-বাসনা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর পরমাত্ম-বাসনা স্বয়ং প্রকাশ পায়। লোকগত বাসনা, শাস্ত্রগত বাসনা এবং দেহগত বাসনাদি দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। বৈরাগ্যসাধন দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলেই স্বয়ং আত্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হইয়া মুক্তি প্রদান করে। সুতরাং মুক্তি প্রদায়ক আত্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস করা মুমুক্ষুব্যক্তির প্রধান কর্ত্তব্য। যাহাদিগের জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির পরিপাকে আপনা হইতেই বৈরাগ্যসঞ্চার হয়, তাহারা অতি ভাগ্যবান্। যথা :—

তে মহান্তো মহাপ্রজ্ঞা নিমিত্তেন বিনৈব হি।
বৈরাগ্যং জায়তে যেষাং তেষামমলমানসম্ ॥

যোগাবশিষ্ট, মুঃ প্রঃ, ১১অঃ ২৪ শ্লোঃ

এই পৃথিবীতে যাঁহাদিগের বিনাকারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তাঁহারাই নির্ম্মল-মানস মহাপ্রাজ্ঞ মহান্ত।

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ

বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আত্মস্বরূপে কিম্বা সচ্চিদানন্দবিগ্রহে মনোনিবেশ হওয়ায় চিত্ত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অটল হয়। কারণ এই অবস্থায় চিত্তের বৃত্তি সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের আর কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না, কাজেই ঘৃণা, লজ্জা, মায়াদি অন্তর্হিত হইয়া সাধক তখন শিবস্বরূপে অবস্থিতি করেন। কারণ—

এতৈর্ব্বদ্ধঃ পশুঃ প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ।

—ভৈরবযামল।

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল অর্থাৎ জাত্যাভিমান, শীল, মান; এই অষ্ট পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে পশু বলা যায়; আর এই পাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। এইরূপে শিবত্বলাভ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন অহংবুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি করুণাভাব তিরোহিত হয়। সেই সময় স্ব-স্বরূপে

অবস্থিতির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রকার ঋষিগণের অভিপ্রায়। যথা :—

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮।১০

দৃঢ়তর বৈরাগ্যাভ্যাসে যখন তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, তখন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। জ্ঞান না হইলে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। তাই শাস্ত্রে আছে যে—

ব্রাহ্মণস্য বিনান্যস্য সন্ন্যাসো নাস্তি চণ্ডিকে।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত অন্যের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার নাই। অন্যে গ্রহণ করিলে পাপভাগী হইবে মাত্র, কোন উপকার হইবে না। সন্ন্যাস অর্থে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ। যাঁহারা নির্ব্বাণমুক্তি লাভের বাঞ্ছা করেন, সন্ন্যাস কেবল তাঁহাদিগের পক্ষেই আশ্রয়নীয়,——তাঁহাদিগের পক্ষেই সন্ন্যাস যথার্থ সশরীরে মোক্ষ-সুখ ভোগ করা। নতুবা অন্যের পক্ষে তাহা কেবল কষ্টের কারণ মাত্র। বিশেষতঃ সন্ন্যাসের অধিকারী না হইয়া যাহারা সংসারকার্য্যসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাদিগকে ভ্রষ্টাচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অতএব যাহাদিগের সন্ন্যাসের অধিকার না জন্মিয়াছে, তাহারা যেন কদাচ উহা গ্রহণ না করেন। কারণ, তদ্দ্বারা তাহাদিগের উভয়দিকই নষ্ট হইবে; কেবল শ্রম মাত্র সার হইবে। পূর্ব্বকালে যাহারা অধিকারী না হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিত, দেশের রাজা তাহাদিগকে তজ্জন্য দণ্ডভাগী করিতেন। এক্ষণে রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী—সমাজ স্বেচ্ছাচারী, তাই যাহার

যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া যাইতেছে। ইহাতে সে নিজেত প্রতারিত হই-তেছে, উপরন্তু অন্যকেও ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করিতেছে।

অতএব যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন অক্ষমতা প্রযুক্ত ক্রিয়া মাত্র হইতে বিরত হইবে এবং যখন অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিবে, তখনই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থোক্ত-"আশ্রমাণা-মহং তূর্য্যো" অর্থাৎ—আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস), ও "ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ," অর্থাৎ—আমি ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা এবং গীতার "অনিকেতঃ" শব্দ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট সন্ন্যাসী-প্রিয় বলিয়া, যে আশ্রম বা আশ্রমীর মহত্ত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সেই পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মের কলঙ্ককালিমা অর্পিত হয়, তাহারা দেশের—দশের——সমাজের ঘোর শত্রু। অতএব উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে। ফল পক্ক হইলে আপনা হইতেই বৃন্তচ্যুত হয়, কিন্তু বলপূর্ব্বক পাতিত করিলে না পাকিতেই পচিয়া যায়, কিম্বা পাকিলেও তেমন সুমিষ্ট হয় না। তদ্রূপ সাধনার পরিপক্কাবস্থায় আপনা হইতেই সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, নতুবা যাহারা বলপূর্ব্বক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে তাহারা বিড়ম্বনাভোগ ব্যতীত কখন সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। অতএব সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী হইয়া তবে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিবে।

বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষুব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসা-শ্রমে গমন করিবার সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, প্রতিবাসী ও গ্রামস্থজনগণকে আহ্বান করিয়া, সকলের নিকট হইতে প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নিরপেক্ষ-হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। তৎপরে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিবে যে সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য উপস্থিত হইয়াছি, কৃপা করিয়া প্রসন্ন হউন।

গুরুদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া পরে দীক্ষিত করিবেন। শিষ্য সন্ন্যাসগ্রহণ জন্য স্নান করিয়া প্রথমতঃ সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকার্য্য সমাধা করিবে। তৎপরে দেবঋণ জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের পূজা করিবে, ঋষিঋণ জন্য সনক, সনন্দন, সনাতন, নারদ ও ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে এবং পিতৃঋণ জন্য পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ ও প্রমাতামহী প্রভৃতির পূজা করিবে। তদনন্তর বিধানানুসারে পিণ্ডদান করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে—

তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ।
গুণাতীতপদে যুয়ম্ অনৃণং কুরুত চিরাৎ॥

অর্থাৎ—হে পিতৃমাতৃগণ! দেবগণ! ঋষিগণ! আপনারা সকলেই পরিতৃপ্ত হউন। আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনারা শীঘ্র আমাকে স্ব স্ব ঋণ হইতে মুক্ত করুন। এইরূপে আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে পরিমুক্ত হইয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একশত আটবার "ত্র্যম্বক" মন্ত্র জপ করিবে। ইত্যবসরে গুরুদেব বেদীতে মণ্ডল রচনা করিয়া ঘটস্থাপন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন। তৎপরে পরমব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিয়া বহ্নিস্থাপন করিবেন, সেই বহ্নিতে শিষ্যের ইষ্টদেবতার হোম করিয়া শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, তণ্ডুল, যব, তিল প্রভৃতি একত্র করিয়া তদ্বারা সাকল্য হোম করাইবেন। তৎপরে ব্যাহৃতি অর্থাৎ—ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই মন্ত্র ত্রয়ে হোম করাইবেন, তৎপরে পঞ্চপ্রাণাদির হোম করাইবেন, তৎপরে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের বিরজা হোম করাইবেন; এইরূপে সমস্ত তত্ত্বই আহুতি দিয়া আপনাকে মৃতবৎ ভাবনা

করিবে। তৎপরে যজ্ঞসূত্র উন্মোচন পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত করিয়া যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবে। গুরুদেব সেই সময়ে শিষ্যকে বলিবেন ;—

বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচার শাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥

অর্থাৎ তুমি বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম, আচার এবং শাস্ত্ররূপ যন্ত্রে যোজিত ছিলে। এক্ষণে পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী—সিংহ যেরূপ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়, তুমিও সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া নির্গত হইলে। তোমার বর্ণাশ্রম নাই,—ধর্ম্মাধর্ম্মও নাই। যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে, ততদিন মনুষ্য বেদ-বিধির দাস, কিন্তু বর্ণাশ্রমাভিমান শূন্য হইলে আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। তদনন্তর শিখাচ্ছেদন পূর্ব্বক শিখা হোম করিবে। তৎপরে গুরুদেব শিষ্যকে বলিবেন ;—

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥

হে মহাপ্রাজ্ঞ! তৎ ত্বমসি অর্থাৎ—তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনাকে "হংস" ও সোঽহং এইরূপ ভাবনা কর এবং এক্ষণে অহঙ্কার ও মমতা-রহিত হইয়া আত্মস্বরূপে (ব্রহ্মভাবে) অবস্থান পূর্ব্বক সুখে বিচরণ কর।

তদনন্তর গুরুদেব ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া—

"নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমোনমঃ।
ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে ॥" *

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিষ্যকে নমস্কার করিবেন। অনন্তর জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া বেড়ান।

---

* হে বিশ্বরূপ! তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার, তোমাকে ও আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমিই বিশ্বরূপ—তুমিই সেই পরম ব্রহ্ম, সেই পরম ব্রহ্মই তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।

এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়া সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, সর্ব্বপ্রকার কামনা রহিত, স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। এই বিশ্বকে সৎস্বরূপ ব্রহ্মময় চিন্তা করিবেন। আপনার নাম, রূপ জাতি ইত্যাদি বিস্মৃত হইয়া আপনাতে আত্মার ধ্যান করিবেন। ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক, সঙ্গরহিত, মমতা ও অভিমানশূন্য, ধীর, জিতেন্দ্রিয় স্পৃহারহিত, নিষ্কাম, শান্ত, নিরপেক্ষ, প্রতিহিংসারহিত, ক্রোধরহিত, সঙ্কল্পরহিত, উদ্যম-রহিত, নিশ্চেষ্ট, শোকরহিত, দোষরহিত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী এবং শীতবাত ও আতপাদি সহ্য করিতে অভ্যাস করিবেন, শুভাশুভ তুল্যজ্ঞান করিবেন, লোভশূন্য হইবেন এবং লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান করিবেন। ধাতুদ্রব্যগ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যাব্যবহার ও স্ত্রীলোকের সহিত একত্রাবস্থান বা হাস্যপরি-হাসাদি এমন কি স্ত্রী লোকের প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন না। দেশ-কাল পাত্র বিচার না করিয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিবেন। কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিবেন না। স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ব-সাধারণের সেবাদ্বারা এবং আত্মতত্ত্ব বিচারদ্বারা কালাতিপাত করিবেন। অনিকেতঃ অর্থাৎ—কোনস্থানে অধিক দিন বাস করিবেন না। যাবৎ জীবিত থাকিবেন, তাবৎ জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি করিয়া দেহপাত হইলে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন।

সন্ন্যাসীর দেহ দাহ করিতে নাই, তাঁহাদিগের মৃতদেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া পরিশুদ্ধ ভূমিতে প্রোথিত করিবে, নতুবা জলে ভাসা-ইয়া দিবে। যথা ঃ—

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮।২৮৪

কিন্তু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্তরভেদে দাহাদির ব্যবস্থা আছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রথম হইতে পরিপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের তারতম্যানুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা :—

চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবশ্চ বহূদককুটীচকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥

—সূতসংহিতা।

সন্ন্যাসাশ্রমী চারি প্রকার, যথা বহূদক, কুটীচক, হংস ও পরমহংস। ইহাদিগের মধ্যে একটীর পর একটী অপেক্ষাকৃত উত্তম বলিয়া কথিত হয়। আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা—মৃদুতানুসারে এইরূপে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। আত্মস্বরূপে অবস্থিত পূর্ণ সন্ন্যাসীকেই পরমহংস বলে। ইঁহারা সন্ন্যাস-চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছভাবে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। যথা :—

দণ্ডং তোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবেৎ পরমহংসকঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণাস্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে॥

—পরমহংসোপনিষৎ।

আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইলে দণ্ড অর্থাৎ দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্নাদি জলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমহংস হইবেন। তাঁহারা যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা নাই। এই চারি শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের মৃতদেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে যে,—

কুটীচকং চ প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকং।
হংসং জলে তু নিক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপূরয়েৎ॥

—নির্ণয়সিন্ধু।

কুটীচককে দাহ, বহূদককে জলে তারণ, হংসকে জলে নিমজ্জন এবং পরমহংসকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে।

সন্ন্যাসিদিগের সম্প্রদায়কে 'মণ্ডলী' কহে, উক্ত মণ্ডলীর অবস্থিতি স্থানকে 'মঠ' এবং তাহার অধ্যক্ষকে 'মহান্ত' বলে। যে সন্ন্যাসী মানব-সমাজে ধর্ম্মোপদেশ দান ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে 'আচার্য্য' নামে অভিহিত করা হয়। যাঁহারা প্রতিনিয়ত নানাদেশে ও তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা 'পরিব্রাজক' আখ্যা প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীমাত্রেই 'স্বামী' নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই চিরকাল হিন্দুসমাজের গুরু; তাই স্বামী উপাধি তাঁহাদিগেরই একচেটিয়া। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারিতায় অন্যসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও কোন কোন খ্যাতিপ্রতিপত্তিলোলুপ ব্যক্তি গুরু সাজিয়া সমাজে সেবা-পূজা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহাদিগের প্রকৃত গুরুত্ব থাকিলে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নামজাহির করিবার প্রয়োজন হইত না। সত্যের উপাধি ধারণে কি সত্যের বিকাশ হয়?

সন্ন্যাসীকে দর্শন মাত্রেই ব্রাহ্মণগণ "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া এবং ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ "নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণাম করিবে। সন্ন্যাসীর দেহ মৃতবৎ, সুতরাং গৃহস্থব্যক্তি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে পারিবে না। যখন তাঁহাদিগের আত্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরমহংসত্ব লাভ হইবে তখন আর ঐ নিয়মপালনের প্রয়োজন হইবে না। কেননা পরমহংসের দেহ পর্য্যন্ত চিন্ময়, সুতরাং জাতি বা বেদবিধি সম্বন্ধে বিচার না করিয়া নারায়ণ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিবে। যথা :—

চতুর্ণাং সন্ন্যাসিনাং যঃ পরমহংস উচ্যতে।
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং মুক্তাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মোপমাঃ॥

—পরমহংসোপনিষৎ।

চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসীর মধ্যে যিনি পরমহংস নামে উক্ত হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা সকলেই মুক্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন, এই শ্রুতিবাক্যও ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর বৈদিক বা স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকার নাই। তাঁহার জননাশৌচ কিম্বা মরণাশৌচ ভোগ করিতে হয় না। সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলেও তাঁহার জ্ঞাতিগণের অশৌচ হয় না, তাঁহার শ্রাদ্ধাদিও করিতে হইবে না। হিন্দু দায়ভাগ সন্ন্যাসীকে তজ্জন্য পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। দেশের রাজাই সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের আশ্রয় দাতা, রক্ষক ও পালক। আবার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ও কায়মনোপ্রাণে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সন্ন্যাস সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৈবকর্ম্মে, আর্ষকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। যথা ঃ—

নাপি দৈবে ন বা পিত্র্যে নার্ষে কুত্যেঽধিকারিতা ॥

অবধূতাদি সন্ন্যাস

—————:*:—————

সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিধান বিবৃত করা হইল পরমহংস ব্যতীত অন্য সন্ন্যাসী "পতিতঃ স্যাৎ বিপর্য্যয়ে" তাহার বিপরীতাচরণ করিলে পতিত হয়। সেরূপ ভ্রষ্টাচারী আর কোন আশ্রমেই গ্রহণীয় নহে। তাহাতে ই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির এবং সুকোমল-

হৃদয় রমণীগণের পক্ষে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার শিশ্নোদরপরায়ণ কলির মানবগণের জন্য বৈদিক সন্ন্যাস বিহিত নহে; কারণ, ভোগলোলুপতা প্রযুক্ত পতন অনিবার্য্য। তাই কলির সর্ব্বসাধারণের (স্ত্রী, শূদ্রাদির পর্য্যন্ত) জন্য তন্ত্রোক্ত সন্ন্যাস বা অবধূতাশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকালে শৈবসংস্কার বিধানানুসারে অবধূতাশ্রম অবলম্বন করাকেই সন্ন্যাসগ্রহণ বলা হইয়া থাকে।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮।২২২

কলিযুগে অবধূতাশ্রমকেই সন্ন্যাস বলে। যখন সমুদায় কাম্যকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, তৎকালে অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি অবধূতাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, কুলাবধূত, নকুলাবধূত প্রভৃতি ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ব্রহ্মাবধূতগণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও নিয়মাদি পালন করিয়া থাকেন; আর অন্যান্য অবধূত শাক্ত কিম্বা শৈবমতেরই পূর্ণতর অবস্থা। সুতরাং পৃথক্ আর ইহাদের বিবরণ বিবৃত করিলাম না।* শাস্ত্রে অবধূতের এইরূপ লক্ষণ লেখা আছে—

অ——আশাপাশবিনির্ম্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্ম্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যং অকারস্তস্যলক্ষণম্॥
ব——বাসনা বর্জ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরাময়ম্।
বর্ত্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্॥

* অবধূতের শ্রেণী ও তাঁহাদের সাধনা সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "তান্ত্রিক-গুরু" পুস্তকে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে, এজন্য এখানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

ধূ——ধূলিধূসরগাত্রাণি ধূতচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণাধ্যাননির্ম্মুক্তো ধূকারস্তস্য লক্ষণম্॥
ত——তত্ত্বচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ।
তমোহঙ্কারনির্ম্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্।

সংস্কৃতাংশ নিতান্ত কোমল বলিয়া বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। এক্ষণে অবধূত-লক্ষণে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিবে যে, সন্ন্যাসাশ্রম এবং অবধূতাশ্রমে কোনই পার্থক্য নাই; কেবল শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা মাত্র। সর্ব্বপ্রকার অবধূতগণই পূর্ণতর অবস্থায় উপনীত হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় পরমহংস হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারাও পরমহংসের ন্যায় নিয়ম-নিষেধের অতীত, সকল সম্প্রদায়িকের লক্ষণের পরবর্ত্তী, এমন কি মুক্তিরও আকাজ্ক্ষা করেন না। পরমহংস যেরূপ ব্রহ্মময়, তদ্রূপ অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। যথা :—

অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতী শিবা দেবি।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অবধূত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং অবধূতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীস্বরূপা গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিয়া পূজা ও প্রণাম করিবে। ফলে দণ্ডী পরমহংসে ও অবধূত পরমহংসে কোনই ভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের দর্শনমাত্রেই গৃহস্থ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে দেশে বাস করেন, তথায় অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি হইতে পারে না। যে দেশ দিয়া তাঁহারা গমন করেন, সে দেশ পবিত্র ও ধন্য হয়। অবধূত পরমহংসগণ দ্বিতীয় শিব। যথা :—

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ ॥

অবধূত যোগীর ন্যায় যোগ-নিয়মের বশীভূত নহেন, ভোগীর ন্যায় ভোগ-পরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন; তিনি বীরের ন্যায় বল-প্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, তপজপাদিকারী সাধকও নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শাক্তও নহেন কিম্বা বৈষ্ণবও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম-নিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন। যে কোন জাতি অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলে, তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই পূজ্য ও প্রণম্য হইবেন।

শাস্ত্রোক্ত অবধূতাশ্রমী ব্যতীত বামাচারী, ব্রহ্মচারী, কাপালিক, ভৈরব-ভৈরবী, দণ্ডী, নাগা, নথী, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, উর্দ্ধবাহু, আকাশ-মুখী, ঠারেশ্বরী, অধোমুখী, পঞ্চধুনী, মৌনব্রতী, জলশয্যী, ধারাতপস্বী, কড়ালিঙ্গী, ফরারি, দুধাধারী, অলুণা, ঠিকরনাথী, গোরক্ষনাথী, উদাসী বা নানকসাহী প্রভৃতি আধুনিক ত্যাগীসম্প্রদায় এতদ্দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভক্তাবধূত নামে আরও একটী সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে বিস্তারিত হইয়াছে। ভক্তাবধূতগণ "বৈষ্ণব" নামে পরিচিত। তাঁহা-দিগের মধ্যে রামাৎ, কবিরপন্থী, দাদূপন্থী, রয়দাসী, রামসেনেহী, মাধ্বাচারী, বল্লভাচারী, মিরাবাই, নিমাৎ অর্থাৎ গৌড়ীয়, কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, ন্যাড়া, সাধ্বী, সহজী, খুসিবিশ্বাসী, গৌরবাদী, নবরসিক, বলরামী, রাধাবল্লভী, সখীভাবক, চরণদাসী,

হরিশ্চন্দী, সধ্নপন্থী, চুহরপন্থী, আপাপন্থী, কুণ্ডাপন্থী, অনহদ্ পন্থী, অভ্যাগত, মাধবী, আচারী, অটলমার্গী, পলটুদাসী, বুনিয়াদদাসী, সৎনামী, বীজমার্গী প্রভৃতি শাখা সম্প্রদায় আছে। ইহা ভিন্ন আরও যে কত সম্প্রদায় আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। প্রকৃতির অধোস্রোতে আজি হিন্দুসমাজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইলেও এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়কেতন এক দিন সগর্ব্বে ভারতের বক্ষে উড়াইয়াছিলেন। এইরূপ ত্যাগ ও ত্যাগীর দৃষ্টান্ত ভারত ভিন্ন অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা একদিন সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উচ্চমঞ্চে দাড়াইলেও কখনও কুক্কুর শৃগালাদির ন্যায় ভোগ্যবস্তুতে ভুলিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সকল ত্যাগীসম্প্রদায় এক্ষণে তাহারই সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণকেই সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। তবে প্রধানতঃ তাঁহারা দুইশ্রেণীতে বিভক্ত; এক বিবেকী—অপর ভক্ত। যাঁহারা আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা আত্মস্বরূপ লাভের জন্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন, তাঁহারা বিবেকী;—আর যাঁহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগকে ভক্ত-সন্ন্যাসী বলা যায়। তবে যে কোন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করা হউক না কেন, বৈরাগ্য যে তাহার মূল কারণ সন্দেহ নাই; তাই সকলেই সন্ন্যাসী। পূর্ব্বের লোক একটী ছেলেকে সন্ন্যাসী করিতে পারিলে বংশের সহিত নিজকে ধন্য জ্ঞান করিত। কিন্তু এখনকার লোক সন্ন্যাসী হইবে ভাবিয়া ছেলেকে সাধুর নিকট যাইতে দেয় না, পুত্রের নিয়মনিষ্ঠা কিম্বা নিরামিষ ভোজন অথবা সৎগ্রন্থাদি পাঠ পিতার অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাহারা ভারতীয় শিক্ষায় বঞ্চিত, কাজেই সন্ন্যাসের মহোচ্চ গভীর তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। নতুবা অধিকাংশ সন্ন্যাসীকে উন্মার্গগামী দেখিয়া পুত্রকে তৎপথে যাইতে দিতে আশঙ্কা

করে। ভগবান গৌরাঙ্গদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসে গমন করিলে, তদীয় বৃদ্ধ পিতামাতা চখের জলে বুক ভাসাইয়া ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "আমার বিশ্বরূপ যেন গৃহে ফিরিয়া না আইসে।" ধন্য পিতামাতা!—পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে আসিলে পতিত হইবে, তাই পুত্রবৎসল পিতামাতা পুত্রবিরহে মৃতপ্রায় হইয়াও পুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন। এমন পিতামাতা না হইলে কি গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় পুত্রলাভ করিবার সৌভাগ্য হইত। আধ্যাত্মিক গভীর-চিন্তানিরত ও ভগবদ্ভাবে বিভোর ভারতই একদিন তারস্বরে গাহিয়াছিলেন ;—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥

অপার সম্বিৎসুখ-সমুদ্ররূপ পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও বসুমতী পবিত্রা হইয়া থাকেন। তবেই দেখ সন্ন্যাসীর স্থান কত উর্দ্ধে?—তাই শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য এই কৌপীন-কন্থাধারী ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগকে উপলক্ষ করিয়া গাহিয়াছিলেন ;—

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য

বৈদিক বিধানে সন্ন্যাসী হইতে হইলে জীবনের শেষদশায় হওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিজকুমার প্রথমতঃ সাবিত্রী দীক্ষা লাভকরতঃ মৌঞ্জী-মেখলা ধারণ করিয়া অরণ্যে গুরুগৃহে উপনয়ন করিবে। তথায় বাস করিয়া স্বাধ্যাভ্যাসের সহিত নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম, বেদাদি শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও চিত্তসংযম শিক্ষা করিবে। বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বক সংযমাভ্যাসে জ্ঞানলাভ লইলে স্বগৃহে সমাবর্ত্তন করতঃ শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবে। তৎপরে গৃহস্থাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন ও কুলপাবন পুত্রাদি উৎপাদন করিবে। তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনই দ্বিজাতির কর্ত্তব্য। এই আশ্রমে থাকিয়া একান্তে বাস করতঃ আত্মানাত্ম বিচারদ্বারা যখন তীব্র বৈরাগ্যের উদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখনই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যাহাদের জিহ্বোপস্থ সংযত হইয়া বিষয়বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাদের আর অন্য কোন আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না। এমন কি এইরূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আর সন্ন্যাসেরও দরকার নাই। যাহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে তাহাদের জন্যই সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত। তাহাও উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং শিশুতনয়, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে. সে মহাপাতকী হইয়া থাকে। যথা :—

মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮।১৯

যে ব্যক্তি স্বীয় পিতামাতা ও পত্নী প্রভৃতিকে পরিতৃপ্ত না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করে তাহাকে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাদি জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তাই শাস্ত্রে আছে যে—

বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধী॥

—মনুসংহিতা।

বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও দারপরিগ্রহ করিবে, প্রৌঢ়সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় (পঞ্চাশোর্দ্ধে) সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। শাস্ত্রকারগণের এরূপ কঠোর আজ্ঞাসত্বেও বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, কপিলদেব, শুকদেব, গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি অবতারগণ এবং কত মহাত্মা আত্মীয়বর্গকে শোকাকুল করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল আদর্শ মহাপুরুষের দ্বারা ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে কোন সময়ে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই কারণে শাস্ত্র "তত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে" ইত্যাদি বাক্যে সন্ন্যাসের অধিকার নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ভগবানের প্রেমাকর্ষণ যে ব্যক্তি অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট শাস্ত্র-যুক্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। তাই প্রেমের মহাজন শ্রীমৎ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—

তত্তৎ ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

সেই মাধুর্য্যভাব উপস্থিত হইলে ঈশ্বরলাভবিষয়ে এতাদৃশ বোধ উৎপন্ন হয় যে, যুক্তি কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে না।

অতএব উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্যগুলি অনধিকারীর শাসন মাত্র। ব্রহ্মচর্য্য মুক্তিরূপ কল্পতরুর মূল, গার্হস্থ্য তাহার শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রকাণ্ড কাণ্ড, বানপ্রস্থ তাহার মুকুল এবং সন্ন্যাস তাহার শান্তিসুধারসভরা সুপরিপক্ক ফল। এই অমৃতময় ফল যে ব্যক্তি জীবনে লাভ করিতে পারিল না, তাহার জীবনই বৃথা। কাজেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সংসার-লালসা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে।

[illegible]ন্ ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ পূর্ব্বক ফকির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা :—

Sell all that ye have, and give alms ; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there your heart be also.

—Bibel, St, Luke XII,

পারস্য কবি হাফেজ বলিয়াছেন ; :—

"যদি মহান পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সংসারের সর্ব্বস্ব বিনাশ কর, তোমার আপাদ-মস্তক ঈশ্বরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে। তোমার অস্তিত্বের ভূমি বিলোড়িত হইলে মনে করিও না যে তুমি বিনষ্ট হইবে।"

"দেওয়ান হাফেজ" নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবের নিকট "সন্ন্যাসঃ শীর্ষণি স্থিতঃ" অর্থাৎ সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত" বলিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের গুরুত্ব বুঝাইয়াছেন। সুতরাং মুক্তিরূপ কল্পপাদপের ফল ভক্ষণে ইচ্ছা থাকিলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, পৃথিবীর এই চারিটী শ্রেষ্ঠধর্ম্মসম্প্রদায়ের আর্য্যগণেরই অনুমোদিত। কিন্তু আজি হিন্দুধর্ম্মানু-

মোদিত ব্রহ্মচর্য্যরূপ মূল ছেদিত হওয়ায়, মুক্তি-কল্পপাদপের অন্যান্য অঙ্গ শ্রীহীন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আর সেই শুষ্ক-পাদপে অসংখ্য পরগাছা গজাইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, এই উভয় আশ্রমই জীর্ণদশাগ্রস্ত কঙ্কালাবশেষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল বিদ্যা, জ্ঞান, সংযমশিক্ষা হউক, আর না হউক দীর্ঘকেশ-শ্মশ্রুনখাদি রাখিয়া কষায় ধারণ ও রুক্ষ স্নানাদির বাহ্য-অনুষ্ঠানকারীই লোকসমাজে ব্রহ্মচারী। দেবকৃত্য, পিতৃকৃত্য, স্বাধ্যায় ও আশ্রমোচিত অন্যান্য অবশ্যপালনীয় কার্য্য কর বা না কর, বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারিলেই সে গৃহস্থ। শিক্ষিতা বধূমাতার মন্ত্রণায় উপযুক্ত পুত্র বাটীর বাহির করিয়া দিলে তখন পিতামাতা বানপ্রস্থী। আর যখন প্রাণবায়ু বাহির হইলে নশ্বর তনুকে ছিন্নবস্ত্রে জড়াইয়া কলসীকাঁথা সহ শ্মশানে নিক্ষেপ করিবে, তখনই পূর্ণসমাধি—সন্ন্যাস সিদ্ধ হইবে। হায়! হায়!! ব্রহ্মচর্য্য অভাবে * ও কাল প্রভাবে হেমপ্রভা ভারতের কি মলিন মূর্ত্তি হইয়াছে। তাই আজ ভারতবাসীও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিন্দিত হইয়া পড়িয়াছে।

বিষম কাল পড়িয়াছে। বিষম কাল পড়িয়াছে বলিয়াই ত ভয় হয়। হায়রে! জন্মজন্মান্তর তপস্যা না করিলে মানব যে সন্ন্যাস কখনই লাভ করিতে পারিত না, আজকাল কালপ্রভাবে সেই পাপপুণ্যাতীত পবিত্র আশ্রম সাধারণের সন্দেহ স্থল হইয়া পড়িয়াছে। কুক্ষণেই রাক্ষসরাজ রাবণ কপট সন্ন্যাসীর বেশে সীতা হরণ করিল, সেই অবধি চোর, ডাকাত, নরঘাতক, লম্পট, বদমায়েস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধির

* মৎপ্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য সাধনে" ব্রহ্মচর্য্য ও তাহার উপকারিতা লেখা হইয়াছে।

মানসে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতেছে। সন্ন্যাসিগণ হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থানীয়; তাই হিন্দুগণ সাধুসন্ন্যাসিগণকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকে, অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূগণ অবাধে অকুণ্ঠিতচিত্তে সাধুর নিকট গমন এবং সম্ভাষালাপাদি করে। অনেক বদমায়েস সেইজন্য পবিত্র সন্ন্যাসীর সাজে আবরিত হইয়া সাধারণের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করতঃ আপন মতলব-সিদ্ধি ও নিশ্চিন্তে বিনা পরিশ্রমে উদরপোষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভাল জিনিষেরই ভেল বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের মহত্ত্বই বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু সাধারণ লোকে এইরূপ ভণ্ড কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া আর সাধুসন্ন্যাসীকে সরল প্রাণে সেবাপূজা করিতে সাহসী হয় না। বিশেষতঃ অপরিশুদ্ধচিত্ত বশতঃ প্রকৃত সাধু-মহাত্মাকে চিনিবারও তাহাদের শক্তি নাই। সাঁচ্চা কহেত মারে লাঠি, ঝুটা জগৎ ভুলায়" কাজেই আড়ম্বরপূর্ণ রচন-বচনবাগীশ ভণ্ডই সমাজের লোকদিগকে মুগ্ধকরতঃ মতলব সিদ্ধি করিয়া লয়। সাধারণে প্রকৃত সাধুকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের আপন আপন হৃদয়ের আদর্শানুযায়ী জটাজূটসমাযুক্ত, চিম্‌টা-করঙ্গধারী বিরাট্ সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহারা প্রকৃতসাধুর নিকট যাইয়া সুখ না পাইয়া তাঁহাদের সাধুত্বে সন্দিহান হইয়া পড়ে। কাজেই সমাজের দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সাধু দূরে সরিয়া পড়িতেছেন; আর সে স্থান যত চোর প্রতারকে অধিকার করিয়া লইতেছে। নতুবা সাধু সূর্য্যস্বরূপ; অন্ধে তাহা দেখিতে না পাইলেও অধ্যাত্ম-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট কি তাঁহারা অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন? সাধুর শান্ত ও আনন্দঘনমূর্ত্তি, ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব যাঁহার নিকট যাইয়া অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও শান্তি ও আনন্দ পায়, তিনিই যথার্থ সাধু। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রেও প্রকৃত সাধুর সুমহান লক্ষণগুলি সুন্দরভাবে প্রকটিত আছে। কোন শাস্ত্রেই ঐন্দ্রজালিকতা ও শক্তিমত্তা সাধুর লক্ষণে লিখিত হয় নাই।

তাই বলিতেছিলাম, অনধিকারী ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ভণ্ড-দল পুষ্ট ও নিজের দুরদৃষ্ট লাভ করিও না। যখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্য দৃঢ় হইবে এবং সাংসারিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিনষ্ট হইবে, তখনই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য রহিত, অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, এতাদৃশ ধর্ম্মবিঘাতী-ব্যক্তি অসম্পূর্ণাভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। কুক্কুর যেমন বমন করিয়া পুনরায় তাহাই ভক্ষণ করে,—পতিত সন্ন্যাসীও তদ্রূপ। যথা :—

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।১৫।৩৬

যে গৃহের সর্ব্বত্রই ত্রিবর্গ রোপণ করা আছে, সেই গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া কোন সন্ন্যাসী যদি পুনর্ব্বার সেই ত্রিবর্গেরই সেবা করে, তবে সেই নির্লজ্জ ব্যক্তিকে বমনভোজী কুক্কুর শব্দে অভিহিত করা যায়। অতএব আত্ম-প্রতারক না হইয়া নিজকে বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে গমন করিবে।

যদিও তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রীয় কোন প্রকার বিধি নিষেধের অধীন নহেন, তথাপি পূর্ণসন্ন্যাস অর্থাৎ—পরমহংসত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রমোচিত নিয়মাদি প্রতিপালন করিবেন। দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করিয়া গ্রামের বাহিরে বা তরুতলে অবস্থিতি করিবেন। অহিংসা, সত্যশীলতা, অচৌর্য্য, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি এতাবৎ আচরণ করিবেন। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদন, শীতনিবারণার্থ কন্থা বা কম্বল এবং পাদুকা ভিন্ন আর কোন দ্রব্যই নিজ নিকটে রাখিবেন না।

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সন্ন্যাসী একস্থানে সর্ব্বদা বাস করিবেন না। বৃদ্ধ, মুমূর্ষু, ভীরু ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। সমস্ত প্রকার লোকসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী বিচরণ করা কর্ত্তব্য। যাচ্ঞা, শঙ্কা, মমতা; অহঙ্কার, সঞ্চয়, দাসত্ব, পরনিন্দা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। সন্ন্যাসী গ্রাম্য আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত, সভাসমিতি বাদবিতণ্ডা, ও বক্তৃতাদি বর্জ্জন করিবেন। কাম-ক্রোধাদি মনেও স্থান দিবেন না। যথা :—

ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকদিগের মুখ দেখিবেন না; তাহাদিগের নিকটে থাকিবেন না এবং দারুময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবেন না, রমণীর সহিত রহস্যালাপ বর্জ্জন করিবেন। সর্ব্বপ্রকার বাসনা কামনা, সুখ দুঃখ শীত, আতপ, মান, অভিমান, মায়া, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলিয়া দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইবেন এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্ব ব্রহ্মময় দর্শন করতঃ ব্রহ্মভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন। তৎপরে আত্ম-স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্ব্ববিধিনিষেধ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরমহংস হইবেন। যথা :—

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তৌ।

শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

—শুকাষ্টক।

যে সকল মহাত্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য পথে বিচরণ করেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই। ঐরূপ ব্যক্তির পাপপুণ্য বিশীর্ণ হইয়া যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সংসার এবং বৃত্তি অর্থাৎ—ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি কেবল শব্দাতীত ও গুণত্রয় শূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে সন্ন্যাসী, পরমহংস-বাচ্য হন। পরমহংস অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ দ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না।

পরমহংস সন্ন্যাসী শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ সকল ব্যাখ্যা করিবেন, বিষয়বিমূঢ় লোক সকলকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা প্রবুদ্ধ করিবেন, শাস্ত্রীয় গুহ্যরহস্য গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়া সাধারণের সংশয়-গ্রন্থির উচ্ছেদ ও ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দিবেন। অধিকাংশ হিন্দু-শাস্ত্র এবং প্রধান প্রধান ভাষ্য ও টীকাকার সকলেই পরমহংস সন্ন্যাসী। পরমহংস পুণ্যতীর্থে কিম্বা পবিত্র-প্রদেশে বাস করিবেন এবং যথাশক্তি পর্য্যটন পূর্ব্বক দেশে দেশে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়া লোকদিগকে পবিত্র করিবেন। জগতের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধনই পরমহংসজীবনের মহাব্রত।

সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া বড়ই দুর্ল্লভ। তাই-বলিয়া কেহ যেন সন্ন্যাসীর নিন্দা করিওনা। কেন না, দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিষ্ণু, শাস্ত্র ও সন্ন্যাসীর নিন্দা করে, সে ব্যক্তি ষাট হাজার বৎসর বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কালযাপন করে। যথা :—

বিষ্ণুঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি সন্ন্যাসিনঞ্চ নিন্দতি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তদ্ধর্ম্ম

(*)

ভগবান্ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যখন পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণের * শূন্যবাদ ও নাস্তিকতার কঠোর কর্কশ আরাবে দিঙ্-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত; তখন অবসর বুঝিয়া বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও কাপালিকগণ বিকট বদনে বেদান্তু-গ্রহচ্ছায়াশ্রিত ভারতভূমিকে গ্রাস করিয়া বসিল—পঞ্চ ম-কারের সাধনার নামে মদ্য-মাংসের শ্রাদ্ধ ও নারীর সতীত্ব লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। জপ, তপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চ্চা উঠিয়া গেল; বিষয়াসক্তি ভারতবর্ষকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় গ্রাস করিয়া বসিল। তপস্তেজোবীর্য্যবান্ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ নিভৃত গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; মুনিগণ, যোগিগণ লোকসমাজের অগোচরে লুক্কায়িত হইলেন। সাধারণ লোক সকল বিষয়ের দাস হইয়া—সংসারে কীট হইয়া স্বর্গ-সুখাদি ভোগ কামনায় ব্রহ্মজ্ঞান—আত্মসমাধি আদি ভুলিয়া কর্ম্মকাণ্ডকেই আদর করিতে লাগিল। ভারত-সন্তানগণ জগৎপতিকে ছাড়িয়া জড়-জগতের সেবায় মনোনিবেশ করিল—ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া নরগণ নারায়ণকে বিদায় দিয়া সংসারকেই

* ভণ্ড বা ভ্রষ্টাচারী বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবের আলোচনায় প্রকৃত বৌদ্ধ, সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবের গৌরব নষ্ট হয় না; কেন না সে আলোচনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না।

সার ভাবিয়া স্বার্থসেবায় ব্রতী হইল। ভারত ভূমির বৈদিক-প্রতিভা অন্তর্হিত হইল,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উজ্জ্বল হেমপ্রভা কালের নিষ্পেষণে শুকাইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। ভারতের সর্ব্বত্র অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল।

সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া দেবগণ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন,—ভগবানের চিরসাধের ভারতের দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার অটল সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে শিবতেজবীর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবী-প্রসিদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতে আবির্ভূত হইয়া ভারত-সিংহাসনে বেদান্তশাস্ত্রের বিজয়মুকুট স্থাপন করিলেন। বেদান্তশাস্ত্রের পুনঃ প্রচার করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনিত্যতা, জগতের অসত্যতা, কুজ্ঝটিকাবৎ সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং ব্রহ্মই সত্য, ইহাই লোকসকলকে শিক্ষা দিলেন। তিনি বুঝাইলেন—জীবও ব্রহ্ম, জগৎও ব্রহ্ম, সমস্তই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার প্রতিভা ও তপস্তেজোবীর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ ব্রহ্ম, চীন, তিব্বৎ, লঙ্কা প্রভৃতি অনার্য্য দেশে যাইয়া আধিপত্য বিস্তার করিল। কেহ কেহ বা পর্ব্বতগুহায় কিম্বা নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল। মণ্ডনমিশ্র প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিভার নিকট জড় হইয়া গেলেন। সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গুরুর কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। দেশের আপামর সকলে তাঁহার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতি অল্পকালেই সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল, তিনি লোকগুরু—জগৎগুরুরূপে ভারতের সর্ব্বত্র শান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ মন্দিরে দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত এবং বৌদ্ধ মঠগুলি হিন্দুমঠে পরিণত হইল। আবার সকলে বেদবেদান্তোক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া

নব জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল; অপূর্ণ মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিয়া মর্ত্তেই অমরত্ব লাভ করিল।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং গান্ধার হইতে চট্টল পর্য্যন্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষকে পুনর্জ্জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। অশ্রুসিক্ত ভারতমাতার মলিন বদনে আবার বিদ্যুদ্বিকাশ দেখা দিল। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মমতপ্রতিষ্ঠাতাগণ ভগবানের কোন বিশেষ একটি লক্ষণ নিরূপণ করিয়া তাহা লাভের উপায় প্রচার করিয়াছেন। তাই যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে বিদ্বেষ কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নিরূপণ করিয়া যে বিশ্বব্যাপী উদার মত প্রচার করিলেন, তাহাতে সর্ব্বাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। তাই আজি হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শিখ, জৈন, পার্শি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিশাল গর্ভে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। এমন সর্ব্বমতসমন্বয়ী ও সর্ব্বধর্ম্মসমঞ্জসা উদার মত বা ধর্ম্ম আর কখনও কোন দেশে কাহারও কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। এমন ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, প্রেমিক প্রচারক বুঝি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বত্রিশ বৎসর মাত্র তাঁহার পরমায়ু; এই বয়সে তিনি সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত হইয়া সাধনদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, উপধর্ম্ম পরিপ্লাবিত ভারতবর্ষে তিনি পদব্রজে (তখন রেল, ষ্টীমার ছিল না) পর্য্যটন পূর্ব্বক সমগ্র ভারতে সত্য সনাতনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কত কত মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিতে হইয়াছিল,—কতবার কত দুর্ব্বৃত্তের হাতে জীবন সংশয় ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শারীরিক সূত্রের ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য, দশোপনিষদের ভাষ্য, যোগশাস্ত্রের টীকা, বাটখানি বৈদিক গ্রন্থ এবং ভক্তিগদ্গদ চিত্তে

কত দেব দেবীর স্তবাদি রচনা করিয়াছিলেন। মোহমুদ্গর, বিজ্ঞানভিক্ষু, আত্মবোধ, মণিরত্নমালা, অপরোক্ষানুভূতি, বিবেক চূড়ামণি, উপদেশ সহস্রী, সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত, সারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। পাঠক! একজনের বত্রিশ বৎসর আয়ুষ্কাল মধ্যে এরূপ কর্ম্মময় জীবন আর কাহারও দেখিয়াছ কি?—ভাবিতে গেলে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া যাইবে। তাই বুঝি আজি ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে শঙ্করের সুমহান্ নাম সমস্বরে উচ্চারিত হয়। ভারতের অন্যান্য প্রচারকগণ আপন দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া কোন সময়ে অন্য দেশের সাধারণ লোকের হৃদয় অধিকার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্কররূপে ভারতের ঘরে ঘরে পূজিত হইতেছেন।

তবে আসাম ও বঙ্গবাসীর মধ্যে অনেকেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মহিমা বুঝিবার সুযোগ পান নাই। যে দেশের লোক ভগবান্ বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার জানিয়াও হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিবর্ত্তে "বেদ-বিরোধী নাস্তিক" বলিয়া ঘৃণা করে, তাহারা যে শঙ্করাচার্য্যকেও "প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আবার বঙ্গের এক সম্প্রদায় স্বকপোলকল্পিত কাহিনী রচিয়া বলিয়া থাকে: "যখন ভগবান্ দেখিলেন যে ভারতের সমগ্র লোক ধর্ম্মবলে উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, তখন শিবকে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবসমাজকে বিপথে পরিচালনা করিতে তিনি আদেশ করেন, তাই শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব।" বলিহারি যুক্তি! এ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে। এরূপ কাহিনী প্রচারে শঙ্করাচার্য্যের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, কিন্তু ভগবানের "দয়াময়" নামের যে সপিণ্ডীকরণ হইয়া গেল—ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ যে ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহা সম্প্রদায়ান্ধগণ ভক্ত ও পণ্ডিত হইয়াও বুঝিতে

পারিল না। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে ঐতিহাসিক সত্যও বুঝি তাহারা জানিত না ; জানিলে নির্লজ্জের ন্যায় এ কাহিনী রচনা সম্ভবপর হইত না। তখন যে বেদ ও বেদপ্রতিপাদিত ভগবানের কথা ভুলিয়া নাস্তিকতা ও জড়ত্বের দানবী নিঃশ্বাসে ভারত অধঃপাতে গিয়াছিল ; তবে" লোক উদ্ধার হইয়া গেল" বলিয়া ভগবানের মাথা ব্যথা হইবে কেন ? বরং শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সেই নাস্তিকতা ও জড়ত্বের পরিবর্ত্তে ভারতের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দেন। তাই আজ কৃতজ্ঞতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বুঝি এই সকল কাহিনী প্রচারিত হইতেছে ; নতুবা এত বড় একটা অধঃপতিত জাতিকে অন্য দেশের লোক সহজে চিনিতে পারিবে কিরূপে ? বঙ্গদেশে কখনই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব ছিল না ; তাই আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বৈদিকব্রাহ্মণ আনয়ন পূর্ব্বক এতদ্দেশে স্থাপন করেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ তাঁহা-দিগেরই বংশধর। কালে তাঁহারা স্থানীয় ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া ভ্রষ্টাচারী হইয়া গেল। তাই এতদ্দেশে বৃক্ষ ছাড়িয়া পর-গাছার আদর হইয়া থাকে,—তাই বেদানুমোদিত ঋষিপ্রণীত স্মৃতির স্থলে রঘুনন্দনের ব্যবস্থা, পাণিনির স্থলে মুগ্ধবোধ—কলাপ, আয়ুর্ব্বেদের স্থলে বৈদ্যশাস্ত্র, আতপের স্থলে সিদ্ধ, সংযমের স্থলে স্বেচ্ছাচার অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ন্যায়দর্শনের শুষ্ক তর্কের রসাস্বাদে নৃত্য করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে কখনই বেদ-বেদান্তের আলোচনা হয় নাই। দুই এক জন পণ্ডিত বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিলেও অন্বয়, শব্দার্থ ব্যতীত, "জায়তে জ্ঞানমুত্তমং" দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই ; সগুণ নির্গুণের বিদ্যালয়ের বাল-কোচিত অর্থ করিয়া অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষিত যুবকগণ বেদান্তের আদর শিখিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহারাও উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ নানা মত বাহির করিয়া নাম জাহির করিয়া বেড়াইতেছে। তাই এতদ্দেশে বেদান্ত বা তৎপ্রচারক শঙ্করাচার্য্যের মহত্ত্ব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। যাহার চিত্ত যেরূপ অনুশাসিত, সে সেইরূপ বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে ; কিন্তু, সত্য-প্রত্যক্ষকারী ব্যতীত বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে কাহারও শক্তি নাই। তবে ক্রমশঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্য্যের সিংহাসন স্থাপিত হইতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুগ্রহে তাঁহার মিশনও এতদ্দেশে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। বাঙ্গালাদেশে কেহ বেদান্ত বা শঙ্করাচার্য্যের মহোচ্চ গম্ভীর ভাব ধারণা করিতে পারুক আর নাই পারুক, সুদূর ইউরোপ-আমেরিকার গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ শান্তিবারি ও কণ্ঠের ভূষণ জ্ঞানে বেদান্ত ও শঙ্করের মত সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারাই চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় ভারতের ধর্ম্মগৌরব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাই আজ বেদান্তশাস্ত্র পাশ্চাত্য ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড় দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি আট বৎসর বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেক রাজা মহারাজা তাঁহার সুকুমার দেহ, সুমিষ্ট যুক্তিপূর্ণ বাক্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদীয় সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে কৌশলে মাতার নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মদান ও ব্রহ্মগানে ভারতের ভূরিভার অবতারণার্থ শঙ্করাচার্য্য গৃহত্যাগ করিয়া স্বামী গোবিন্দপাদাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করতঃ সন্ন্যাসী হইলেন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—

উপনিষৎ ও তাহার মীমাংসা স্বরূপ শারীরিকসূত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার এবং প্রাচীন ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনের অভাবে—গুরুর অভাবে—সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকারানুরূপ তত্ত্বকথার প্রচারাভাবে ভারতে এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি অল্প সময়েই সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া বিপন্ন ভারতের উদ্ধারার্থ দৃঢ় সংকল্প হইলেন। বহু আলোচনা, বহু সময় ও বহু আয়াসসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার যে বিপুলবিঘ্ন-বিপত্তিসংকুল, একজনের জীবিত কালের মধ্যে সুসপন্ন হওয়া সুকঠিন, তাহা বুঝিয়াই তিনি সংসারের মায়ামমতা কাটাইয়া একাকী সহস্র জন-সাধ্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বেদান্ত ও উপনিষদাদির ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষা দিলেন। পদ্মপাদ, হস্তামলক, সুরেশ্বর (মণ্ডন) ও ত্রোটক এই প্রধান শিষ্য চতুষ্টয় সহ বেদান্ত শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারার্থ ভারতের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জন্য সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞানের ব্যবস্থা করিলেন ; সাধারণের জন্য সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি প্রতীকোপাসনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন ; চিত্তশুদ্ধির জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত নিষ্কাম কর্ম্মের বিধিও অনুমোদন করিলেন। তাই সর্ব্বাধিকারী জনগণ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের উদারগর্ভে স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। কাশ্মীরের সারদাপীঠে আরোহণ এবং সমগ্র ভারতের সর্ব্বাধিকারী জন-গণের গুরু হইবার সৌভাগ্য শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন প্রচারক লাভ করিতে পারেন নাই। তাই শঙ্করাচার্য্য জগদ্ গুরু নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কলিতে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিমত পুনঃ প্রচলন করিয়া—ভারতে জ্ঞানপ্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া—শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন রাখিবার সদুপায় দেখাইয়া দিয়া শিব-স্বরূপ শঙ্করাচার্য্য

কেদারনাথতীর্থে বত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য বেদোক্ত চারিটী মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী বৃহৎ মঠ স্থাপন করিলেন। পদ্মপাদাচার্য্য প্রভৃতি চারি জন প্রধান শিষ্যকে আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া—প্রত্যেক মঠের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ বেদ ও মহবাক্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাই সন্ন্যাসী মাত্রকেই নিজ নিজ মতানুসারে তাহার এক একটী গ্রহণ করিতে হয় ও তদনুসারে পরিচয় দিতে হয়। যথা :—

উত্তরে জ্যোতির্ম্মঠ (জ্যোসিমঠ) ক্ষেত্র—বদরিকাশ্রম, দেব—নারায়ণ, দেবী—পুন্নাগরী, তীর্থ—অলকনন্দা, বেদ—অথর্ব্ব এবং মহাবাক্য—অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

দক্ষিণে শৃঙ্গগিরি বা সিঙ্গেরী মঠ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর, দেব—আদিবরাহ, দেবী—কামাখ্যা, তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা, বেদ—যজু এবং মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি।

পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠ, ক্ষেত্র—পুরী, দেব—জগন্নাথ, দেবী—বিমলা, তীর্থ—মহোদধি, বেদ—ঋক্ এবং মহাবাক্য—প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।

পশ্চিমে শারদামঠ, ক্ষেত্র—দ্বারকা, দেব—সিদ্ধেশ্বর, দেবী—ভদ্রকালী, তীর্থ—গঙ্গা গোমতী, বেদ—সাম এবং মহাবাক্য—তত্ত্বমসি।

এই চারিটী প্রধান মঠ ব্যতীত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রায় বারশত মঠ ভারতের নানাস্থানে স্থাপিত আছে। মঠের প্রধান চারিজন আচার্য্যের মধ্যে আবার বিশ্বরূপাচার্য্যের তীর্থ ও আশ্রম এই দুইটী শিষ্য, পদ্মপাদাচার্য্যের বন ও অরণ্য এই দুইটী শিষ্য, ত্রোটকাচার্য্যের গিরি, পর্ব্বত ও সাগর এই তিনটী শিষ্য এবং পৃথ্বীধরাচার্য্যের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই তিনটী শিষ্য, সমুদায়ে দশটী শিষ্য হইতে দশটী সম্প্রদায় হইয়াছে। এই দশনামা সন্ন্যাসি-

দিগকে আপন আপন সম্প্রদায়ানুসারে সাধনাদি করিতে হয়; সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে, দশটীর উপাধির তাৎপর্য্য আছে। তীর্থ—

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণী-সঙ্গমতীর্থে যিনি স্নান করেন, তাঁহার নাম তীর্থ। আশ্রম—

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণং॥

যিনি আশ্রম গ্রহণে সুনিপুণ ও নিষ্কাম হইয়া জন্মমৃত্যু বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম আশ্রম। বন—

সুরম্যনির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥

যিনি বাসনাবর্জ্জিত হইয়া রমণীয় নির্ঝর নিকটবর্ত্তী বনে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম বন। অরণ্য—

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল॥

যিনি আরণ্য ব্রতাবলম্বী হইয়া সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া আনন্দপ্রদ অরণ্যে চিরদিন বাস করেন, তাঁহার নাম অরণ্য। গিরি—

বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥

যিনি সর্ব্বদা গিরিনিবাস-তৎপর, গীতাভ্যাসে তৎপর, যিনি গম্ভীর ও স্থির বুদ্ধি, তাঁহার নাম গিরি। পর্ব্বত—

বসেৎ পর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি পর্ব্বত মূলে বাস করেন, ধ্যান-ধারণায় সুনিপুণ, এবং যিনি সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহার নাম পর্ব্বত। সাগর—

বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাঞ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি সাগরতুল্য গম্ভীর, বনের ফল মূল মাত্র ভোজী ও যিনি নিজ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তাঁহার নাম সাগর। সরস্বতী—

স্বরজ্ঞানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যো হি সরস্বতী॥

যিনি স্বরতত্ত্বজ্ঞ, স্বরবাদী, কবিশ্রেষ্ঠ এবং যিনি সংসার-সাগর মধ্যে সারজ্ঞানী, তাঁহার নাম সরস্বতী। ভারতী—

বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যিনি বিদ্যাভারপরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখ ভার অনুভব করেন না, তাঁহার নাম ভারতী। পুরী—

জ্ঞানতত্ত্বেন সংপূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে॥

যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁহার নাম পুরী।

আজ তীর্থে-তীর্থে, বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে, গ্রাম-নগরে এবং ইউরোপ-আমেরিকায় যে গৈরিকধারী সন্ন্যাসী দেখিতেছ, তাঁহারা সকলেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অপারমহিমা বিঘোষিত করিতেছেন এবং তাঁহারই অমানুষী কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, প্রথম আশ্রম ত্রয়ের যথাবিধি ধর্ম্মপালন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্যবস্থা করিলেন, বৈরাগ্য উদয় হইয়া উপযুক্ত হইলেই যে কোন ব্যক্তি—যে আশ্রমী হউক না কেন একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে। তাই তাঁহার মতের উদারগর্ভে সকলেই আশ্রয় লাভ করিয়া তদীয় মহত্ত্ব বিঘোষিত করিতেছেন।

এই সন্ন্যাসিগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক দণ্ডী স্বামী,—দ্বিতীয় পরমহংস। প্রথম অবস্থায় দণ্ডীস্বামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানালোচনা করিবেন, পরে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হইলে পরমহংস হইয়া লোকশিক্ষা, শাস্ত্রব্যাখ্যা এবং জগদ্ধিতায় নিযুক্ত হইবেন। এই সন্ন্যাসিগণ হিন্দু সমাজে সর্ব্বসম্প্রদায়ের গুরু। কেন না, যে বেদবেদান্ত ও পুরাণের মতানুসারে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভগবান্ বেদব্যাসের রচিত ও ব্যাখ্যাত। সুতরাং ব্যাসদেব সর্ব্বসম্মত হিন্দু সমাজের গুরু। তাঁহার সন্তান ও শিষ্য শুকদেবাচার্য্য, শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্য, গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদাচার্য্য, গোবিন্দ পাদের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য এবং শঙ্করের শিষ্যোপশিষ্য বর্ত্তমান সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়। সুতরাং সন্ন্যাসিগণই হিন্দু সমাজের গুরু। আবার এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন মহাত্মা হইতে ভারতের আধুনিক যাবতীয় (ব্রাহ্ম ব্যতীত) সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। আধুনিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ আপন আপন সম্প্রদায়েরই

আচার্য্য হন, কিন্তু সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের আচার্য্যরূপে সেবিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি সন্ন্যাসী-মহাপুরুষগণ অপেক্ষা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্তব্যক্তি সাধারণের হৃদয়ের এমন শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

চারিটী প্রধান মঠের অধ্যক্ষ বা মহান্তগণ শঙ্করাচার্য্য নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রকৃত সন্ন্যাস

—(*)—

স্ত্রী-পুত্রাদি আশ্রিত পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে পলায়ন করার নাম সন্ন্যাস নহে। গৈরিকবসন পরিধান, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ ও মস্তক মুণ্ডন করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। মহাত্মা কবীর বলিতেন;—

মুড় মুড়ায়ে জটা রাখয়ে মস্ত ফিরে য্যায়সা ভৈঁষা।
খলরি উপর খাখ্ লাগায়ে মন য্যায়সা তো ত্যায়সা।

অর্থাৎ—মস্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে, জটা রাখিলেই বা কি হইবে, আর গাত্রোপরি ভস্মলেপন করিলেই বা কি হইবে?—মনোজয় পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে এই সকল বেশ-ভূষা কি কার্য্যকারক? যাহার আত্মানুভূতি নাই, মনস্থিরতা নাই, ভগবদ্ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস নাই, সে রঙ্গিন বসন পরিয়া, কৌপীন ও কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক জটাজুট বাড়াইয়া,

ভস্ম মাখিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিলে কি হইবে? সেরূপ সন্ন্যাসী যাত্রাসম্প্রদায়েও দৃষ্ট হইয়া থাকে।* আবার কেবল ফলাহারে, জলাহারে, স্বল্পাহারে বা অনাহারে মুক্তিভাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; তাহা হইলে পশু, পক্ষী, জলচর বা পন্নগগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিত। যথা:—

বায়ুপর্ণ-কণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃপশু পক্ষিজলেচরাঃ॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তবে সন্ন্যাস কি?—সং=সম্যক্ প্রকারে+ন্যাস=ত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসতত্ত্ব অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। কাম্যকর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস ইহাই সাধারণের মত। কারণ কাম্যকর্ম্মের ফল-জনকতা প্রযুক্ত তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্যকর্ম্মেরও পরিবর্জ্জন করার নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ফলাশা আদৌ করিবেন না। কামক্রোধাদি ত্যাগ যেমন একান্ত কর্ত্তব্য, কেহ কেহ সমস্ত কর্ম্মকেই সেইরূপ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপরূপ কর্ম্ম কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে নাই, কেন না এতদ্দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ ও কর্ম্মফল ত্যাগ, এই দুই ত্যাগের তারতম্য জিজ্ঞাসা করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—হে পার্থ!

---

* এ সকল বেশ-ভূষা ও নিয়ম-সংযমাদির যে সন্ন্যাসে প্রয়োজন নাই, আমি এমন কথা বলিতেছি না। প্রকৃত ঔষধের সঙ্গে অনুপান সেবনই ব্যবস্থা, আবার অনুপান ছাড়া ঔষধে কতকটা ফল লাভ হয়; কিন্তু ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনুপান সেবন করিলে কি হইবে? সেইরূপ প্রকৃত ত্যাগ বৈরাগ্য ব্যতীত বেশ-ভূষা ধারণও অনর্থক।

যজ্ঞ, দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদির ফল কামনা ত্যাগই আমার মতে শ্রেষ্ঠ। কাম্যকর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া মুমুক্ষুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ নিত্যকর্ম্ম কোন মতেই ত্যজ্য নহে। নিত্যকর্ম্ম বেদবিহিত পরমার্থ লাভের হেতু, ধর্ম্মসাধনের পরমানুকূল ও অবশ্যানুষ্ঠেয়, না বুঝিয়া বা হঠকারিতাবশতঃ যাহারা ইহা ত্যাগ করে, তাহারা তমোগুণী, কাপুরুষ ও জড়। অতএব—

কাম্যায়াং কর্ম্মাণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। দেহ সত্ত্বে, মনুষ্য সকল কর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র অর্থাৎ—পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মফলরাশি অত্যাগীকে দেহান্তে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগকে ইহা কদাচ স্পর্শও করিতে পারে না।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সাত্ত্বিক ত্যাগ, ফলকামনা সত্ত্বে যে কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা রাজস এবং ফলেচ্ছাসহ কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগের নাম তামসত্যাগ। কর্ম্ম ক্লেশ-সাধ্য বলিয়া ত্যাগ করা রাজস ও ভ্রান্তি পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষে সাত্ত্বিক ত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল গুণময় ত্যাগ ব্যতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" বলিয়া যে ত্যাগ বা সন্ন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্গুণাত্মক। এই গুণাতীত সন্ন্যাসই মুমুক্ষুগণের অবলম্বনীয়। কর্ম্মফলত্যাগরূপ সাত্ত্বিক সন্ন্যাসেও নিত্যকর্ম্মের কর্ত্তব্যবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার কর্ত্তব্য বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না

পারিলে সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার হয় না বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য এই যে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত না হইয়া উপস্থিত কর্ম্ম সকল ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিয়া যাওয়ার নাম নিগুর্ণ ত্যাগ। পদ্মপত্র যেমন জল মধ্যে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ যাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধি শূন্য হইয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মসকল যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্ম বা কর্ম্মফলে জড়িত হয়েন না। এইরূপ ত্যাগের নামই গুণাতীত ত্যাগ,—ইহাই প্রকৃত-সন্ন্যাস। এই ত্যাগ-সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;—

"সর্ব্বলোকেষ্বপি ত্যাগী সন্ন্যাসী মম দুর্ল্লর্ভঃ"।

ত্যাগী-সন্ন্যাসী সকল লোকের, এমন কি আমারও দুর্লভ। কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ত্যাগের ইহাই সুন্দর মীমাংসা। কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত বিষয়ভোগ-ত্যাগও সন্ন্যাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাও গুণাতীত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রবিধি না মানিয়া কঠোর তপস্যায় দেহ নষ্ট করাকে তামসত্যাগ, সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি আশায় ফলমূলাহারে তপস্বী হওয়ার নাম রাজসত্যাগ এবং চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যে বিধি-বিহিত সংযম, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কিন্তু এই সকল ত্যাগ গুণময় বিধায় সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয় নহে। সন্ন্যাসের ত্যাগ নিগু'ণাত্মক। প্রলুব্ধ না হইয়া অনাসক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্ব স্ব বিষয় ভোগ করার নাম, গুণাতীত ত্যাগ। নতুবা লেংটি পরিয়া বা লেংটা হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকার নাম ত্যাগ নহে। লেংটিতে আসক্তি আর গরদে বিরক্তি, কুটিরে আসক্তি আর কোঠায় বিরক্তি, শাকে আসক্তি আর মিষ্টান্নে বিরক্তি, কম্বলে আসক্তি আর গদিতে বিরক্তি, নিগু'ণ ত্যাগের লক্ষণ নহে। আসক্ত বা বিরক্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করাকেই গুণাতীত ত্যাগ বলে। এইরূপ নিগু'ণ ত্যাগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যথা :—

সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনেঽপি বা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসী চ কীর্ত্তিতঃ ॥

যাঁহার উত্তমান্ন ও নিকৃষ্টান্নে এবং মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত। তবে ত্যাগের অর্থ কি ?— শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

ত্যাগোঽসৌ কিমস্তি আসক্তিপরিহারঃ।

—মণিরত্নমালা।

আসক্তি পরিত্যাগের নামই ত্যাগ। জ্ঞান-গরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন :—

যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘবঃ।
মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমানঃ সুখাবহঃ ॥

—যোগবাশিষ্ট।

যাহা মন হইতে ত্যাগ করা যায় তাহাই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ মাত্র প্রশস্ত নহে। মন হইতে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সংকল্প-বিকল্প বর্জ্জিত হইয়া সুখী হও। অতএব যিনি মন হইতে ভোগ্য বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। অনেকে আপনার সকল বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্তিবশম্বদ হইয়া আপনাকেও পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তোমার "তুমিত্ব" ব্রহ্মস্বরূপে কিম্বা ভগবানের সত্তায় ডুবিয়া যাইবে,—যখন তোমার নিজ অস্তিত্বের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিবেনা ; তখনই তুমি ত্যাগী—তখনই তুমি বৈরাগী —তখনই তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী।

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, যিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধি শূন্য হইয়া উপস্থিত কর্ম্মসকল করিয়া যান এবং নির্লোভ হইয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয়-ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই নির্গুণ ত্যাগী। সম্যক্‌রূপে এই প্রকার ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ভগবান্ নির্গুণ—গুণের অভাব নহে, গুণের অতীত অবস্থা মাত্র; অর্থাৎ—তিনি গুণে লিপ্ত না হইয়া গুণের দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সন্ন্যাসীর ত্যাগ নির্গুণাত্মক, তাঁহারাও গুণে লিপ্ত না হইয়া গুণের কর্ম্ম করিয়া যান; তাহাতে বিরক্ত বা আসক্ত নহেন। এইরূপ ন্যাসই প্রকৃত "সন্ন্যাস" পদবাচ্য। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও মুমুক্ষুব্যক্তি সন্ন্যাসী হইতে পারেন; তাই জনক, অম্বরীষ প্রভৃতি গৃহিগণ সন্ন্যাসী পদবাচ্য। আর যাহারা কৌপীন-করঙ্গার মায়া ছাড়াইতে পারে না, তাহারা সন্ন্যাসাশ্রমী হইলেও গৃহস্থাধম। আবার যে কোন আশ্রমী হইয়া নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিতে পারিলে, তিনিই সন্ন্যাসী এবং মুক্তি লাভের অধিকারী। নির্লিপ্ত গৃহী এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী একাসনে অবস্থিত; তাঁহাদের মধ্যে ব্যবহারিক ভাবে পার্থক্য থাকিলেও পারমার্থিক ভাবে কোন ও বিভিন্নতা নাই। আমরা পুরাণের

হরিহর মূর্ত্তি

হইতে এ তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছি। এখানে হর শব্দে শ্মশানবাসী শিব এবং হরি শব্দে বৈকুণ্ঠ বিহারী বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে। হিন্দুমাত্রেই অবগত আছে যে, হরিহর অভিন্ন, যে মূঢ় তাঁহাদের ভেদ কল্পনা করে, সে নারকী যথাঃ—

গঙ্গাদুর্গাহরীশানাং ভেদকৃন্নারকী তথা॥

—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।

হরি ও ঈশানে ভেদ বুদ্ধি করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা উভয়ে যে এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহ্যতঃ আকাশ-পাতাল ভেদ দৃষ্ট হয়। একজন সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী,—খর্পর মাত্র সম্বল—বিরূপবেশে ভ্রমণ করিতেছেন; কাজেই হর ত্যাগী—বৈরাগী—সন্ন্যাসী। অপর একজন মণিমুক্তাখচিত ও নৃত্যগীতপূরিত বৈকুণ্ঠবিহারী, পার্শ্বে অনুপমা সুন্দরী; কাজেই হরি ভোগী—বিলাসী—গৃহবাসী। স্থূলতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্নতা নাই। শিব সন্ন্যাসী সত্য।—কিন্তু দেখিয়াছ কি, উহাঁর কোলে কে? বিশ্বমোহিনী রমণী, উনি কে? উনি জীবজগৎরূপা বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি। শিব সন্ন্যাসী হইয়া আমিত্ব ও আমিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়াছেন বটে; কিন্তু জগৎ-সংসারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, পরার্থে স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন,—তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই নাই বটে; কিন্তু তিনি প্রত্যেক ভূতের হিতসাধনের রত; তাই ভূতনাথ নামে পরিচিত। তাহা হইলে শিব সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারে লিপ্ত। আর আমরা হরিকে গোকুলবিহারীরূপে দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে মাতোয়ারা;—রাধা-প্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্য অবহেলাতে রাধাকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত। সকলেই জানিত শ্রীকৃষ্ণের রাধাগত জীবন;—রাধার ক্ষণকালের বিরহে বুঝি তিনি বাঁচিতেন না। কিন্তু কৈ? যেমন অক্রুর আসিয়া মথুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রওনা হইলেন, রাধার নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার আবশ্যক বোধ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন সংবাদ পাইয়া সঙ্গিনীগণ সহ রঙ্গিনী রাই আসিয়া পথিমধ্যে রথচক্রের নিম্নে বুক দিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমাদের হৃদয় চথচক্রে নিস্পে-ষিত করিয়া মথুরা গমন কর।" শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমোন্মাদিনী গোপ-রমণীর মর্ম্মভেদী কাতরতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মথুরা চলিয়া গেলেন। রাম

অবতারে পতিপ্রাণা জানকীকে বিনা অপরাধে কেবল রাজার কর্ত্তব্যে বনে দিলেন। তাহা হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রীপুত্র বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকুন না, কখনও স্ত্রীপুত্রের আঁচল ধরিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই; আত্মসুখে অন্ধ হইয়া তিনি জীবের দুঃখ বিস্মৃত হন নাই; আত্ম-স্বার্থে পরার্থ পদদলিত করেন নাই; আপন হিত করিতে জগতের হিত ভুলিয়া যান নাই, কাজেই হরি গৃহী হইলেও নির্লিপ্ত। তবেই হর সন্ন্যাসী হইয়াও লিপ্ত আর হরি গৃহী হইয়াও নির্লিপ্ত; আবার লিপ্তসন্ন্যাসী ও নির্লিপ্তগৃহী একই কথা—সুতরাং হরিহর অভেদ। এদিকে আবার গৃহীর আদর্শ হরি এবং সন্ন্যাসীর আদর্শ হর। অতএব যে গৃহী হরির আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন এবং যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই সমান,—তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। বরং হরির আদর্শে গঠিত জীবন গৃহস্থ—যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে এখনও জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর হরের আদর্শে গঠিত জীবন সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই সে কালের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যায় সমান পারদর্শী হইয়াও বিলাসী রাজাগণ ত্যাগী ব্রাহ্মণগণের নিকট জোড়হস্ত ছিলেন। তাই জনক রাজা অনেক ব্রাহ্মণের শিক্ষাদাতা গুরু হইয়াও তাঁহাদিগের নিকট শিষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। আর হরিহর অভিন্নাত্মা হইয়াও সন্ন্যাসী হরই "জগদ্‌গুরু" পদবাচ্য হইয়াছেন।

অতএব গৃহস্থ কিম্বা সন্ন্যাসীই হউন, যিনি আত্ম-স্বরূপে অবস্থান করতঃ নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিয়াও জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই গৃহী ব্যাসদেব এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য একই আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আসলে

কিম্বা বসনে, সংযমে কিম্বা স্বেচ্ছাচারে, কৌপীনে কিম্বা কন্থায়, দণ্ড কিম্বা কমণ্ডুলে, ছাই মাটী কিম্বা ত্রিপুণ্ড্রতিলকে অথবা দেশে দেশে ভেসে বেড়াইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার বলি যেন স্মরণ থাকে,—যে কোন আশ্রমভুক্ত হউন না কেন, যিনি আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বিশ্বময় প্রসারিত পূর্ব্বক সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল সার সম্বল করিয়াছেন, যিনি পরকে অমৃত বিলাইয়া নিজের জন্য কালকূট সঞ্চিত করিতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়াইয়া আপন কণ্ঠে ফণীহার দোলাইয়া আনন্দে গালবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আর এইরূপ সন্ন্যাসীর নিকট জগৎ গললগ্নী-কৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণত হয়।

আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব

যিনি শঙ্করাচার্য্য কিম্বা গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির মন্দাকিনী আমিত্বরূপ গোমুখীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া, সংসাররূপ হর-জটার জটীলবর্ত্ম পার হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়, যাহার উচ্ছ্বসিতবেগে নাস্তিক পাষণ্ডরূপী মত্ত ঐরাবতও তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হয়, সেই সন্ন্যাসের ত্যাগমন্ত্র-সমুদ্ভূত পুণ্যময় আনন্দ-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আত্মহারাবৎ চালিত হইতে পারিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হইল। এইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে প্রধানতঃ দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, একটী জ্ঞানপথ,—অপরটী ভক্তিপথ। যাহারা জ্ঞানকে জ্ঞানপথ এবং ভক্তিকে ভক্তিপথ বলিয়া মনে

করে, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত। জ্ঞানপথেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে যাইতে হয় এবং ভক্তিপথেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গমন করিতে হয়। সুতরাং উভয় পথেই গমনের উপায় একই প্রকার, কিন্তু পথের বিভিন্নতা আছে। জ্ঞানমার্গের নাম বিশ্লেষণ-পথ আর ভক্তিমার্গের নাম সংশ্লেষণ-পথ। কার্য্য ধরিয়া কারণে যাওয়ার নাম বিশ্লেষণ বিচার, আর কারণ লাভ করিয়া কার্য্য-রহস্য অবগত হওয়ার নাম সংশ্লেষণ বিচার। যাঁহারা জড়জগৎ ধরিয়া "নেতি" "নেতি" করিতে করিতে স্থূল সূক্ষ্ম অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহারাই জ্ঞানমার্গী, আর যাঁহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া এই জীব-জগৎ তাঁহারই বিকাশ মনে করতঃ লীলানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাহারাই ভক্তিমার্গী।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে স্বরূপলক্ষণ সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদার গর্ভে সর্ব্বাধিকারী জনগণ বিশ্রাম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। মানব এক নূতন চক্ষু লাভ করিয়া জড়-জগতের সুস্থূল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি করতঃ মরজগতে অমরত্ব লাভে ধন্য হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্যদেব যে উপায়ে ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করিবার পন্থা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ পথ—জ্ঞানমার্গ। আর ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব তাহা লাভ করিবার যে উপায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা সংশ্লেষণ পথ—ভক্তিমার্গ। তাই শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানাবতার এবং গৌরাঙ্গদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত হন।

জ্ঞানী বা ভক্তকে জ্ঞানমার্গের বা ভক্তিমার্গের লোক বলে না। জ্ঞানমার্গেও ভক্ত ও জ্ঞানী এবং ভক্তিমার্গেও জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয় শ্রেণীর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়া ব্যক্তি সকল এ অধ্যাত্ম সত্য অবগত না হইয়া স্ব স্ব বিদ্বেষ বুদ্ধি বশতঃ চালিত হইয়া অনর্থক কোলাহল করিয়া থাকে। জ্ঞানপথ বড় কি ভক্তি-

পথ বড়, এই বিচার করিতে গিয়া কেবল বাজে বাদ-বিতণ্ডা লইয়া কালাতিপাত করে।, যত মত তত পথ; রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার যে পথে অধিকার জন্মিয়াছে, তাহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে। মুর্শিদাবাদের নবাব ও বর্দ্ধমানের মহারাজা এই দুইজনের মধ্যে কে বড় তাহা বিচার করিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিলে পরপিণ্ডভোজী ভিখারীর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে কি?—ঐ সকল বাজে তর্ক ছাড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হওয়া যেমন ভিক্ষুকের কর্ত্তব্য; তদ্রূপ ধর্ম্মের ছোট বড় না বাছিয়া সর্ব্বদা আপন আপন অধিকারানুরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। নদীতীর-স্থিত গ্রামবাসী যেমন নদীর ঘাটে গমন করিবার জন্য আপন আপন বাসস্থান হইতে সুবিধানুরূপ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া লয়, তদ্রূপ মানবও জন্মান্তরের সঞ্চিত গুণ-কর্ম্মে যে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে এবার সেইস্থান হইতে গমন করিতে হইবে। অন্যের গম্য-পথ তাহার পক্ষে ভয়াবহ; সুতরাং পরের পথ লইয়া সাধকের আন্দোলন-আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অবতার লইয়া যাহারা ছোট বড় বিচার করিতে যায়, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী নারকী মাত্র। একটী অবতারকে চিনিতে পারিলে কোন অবতারের রহস্যই অজ্ঞাত থাকে না। খৃষ্টান অবতারবাদ বুঝে না, তাই শঙ্কর বা গৌরাঙ্গের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে। আবার যে হিন্দুসাধক অবতার তত্ত্ব বুঝিয়াছে, সে মহম্মদ বা যীশুকেও ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে সম্মান দান করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অস্মদ্দেশের লোকের ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে বুঝিবার কোন সময়েই সুযোগ হয় নাই; তবে গৌরাঙ্গদেবের এই দেশেই লীলাভূমি, কাজেই অধিকাংশ লোক তদীয় ভক্ত। কিন্তু তাহারা সংস্কার বশে গৌরভক্ত হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্প লোকেই তাঁহার মহিমা জ্ঞাত আছে। তাহারা গোঁড়ামির চসমায় চক্ষু আবৃত করিয়া

একের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে অন্যের নিন্দা প্রচার করিয়া থাকে। পরের ধর্ম্ম নিন্দায় নিজধর্ম্মের গৌরব হানি হয়; এই সোজা কথা যে সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই।

এক অবতার দয়াল; কিন্তু কোন্ অবতার দয়াল নহে?—একই ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জীবের অভাব-পূরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতার কথাটাই যে দয়ায় মাখা, জীবের প্রতি দয়া না হইলে তিনি স্বরূপ ছাড়িয়া জীবভাব অবলম্বন করিবেন কেন? আর কোন্ অবতার অপ্রেমিক আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যিনি রাজৈশ্বর্য্য, পতিব্রতা স্ত্রী ও শিশুপুত্র পরিত্যাগ করিয়া জীব-দুঃখ মোচনের জন্য যৌবনে সন্ন্যাসী হইলেন, সে বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি বিম্বিসার রাজার নিকট নিজের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে কতকগুলি ছাগলের প্রাণভিক্ষা চাহিয়া ছিলেন, সেই বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের জন্য দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই যিশু কি অপ্রেমিক? আর শঙ্করাচার্য্য তো প্রেমের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। পাপী-পুণ্যবান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল কিম্বা কীট-পতঙ্গকে সৎবুদ্ধিতে ভালবাসিতে যাওয়া কি সোজা কথা?—ধ'রে বেঁধে কি পীরিত হয়?—কিন্তু আমি "আমাকে" ভাল বাসি, ইহা বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না, আবার আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বেরই বিকাশ; ইহাই শাঙ্করমতের মূল-মন্ত্র। সুতরাং আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি লইলে আত্মপ্রীতি বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হইবে। অনেকে মনে করে, শঙ্করাচার্য্য ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন না। যিনি বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে মুক্তিসাধনের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে "ভক্তিরেব গরীয়সী" বলিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতেন না বলিলে নিজেরই মূর্খতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। আবার আর এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী ভগবান

গৌরাঙ্গদেবকে "শচী পিসির বেটা" মনে করিয়া মুন্সিয়ানা চালে নাসিকাটী কুঞ্চিত করিয়া থাকে। অথচ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলিয়াছেন, "যে দেশে গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশ এবং সে জাতি কখন হীন নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের দেশে এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত না," যাঁহার আবির্ভাবে পতিত দেশের ও পতিত জাতির কলঙ্ক ঘুচিয়া গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে ম্লেচ্ছ-দাসত্ব-উপজীবী-জীবের ঘৃণ্য-জীবনের উপায় হইবে কি? এমন দিন কবে হইবে, যে দিন দেখিব প্রত্যেক বাঙ্গালী ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-পদে প্রাণের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছে। গৌরাঙ্গদেব যে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, ঘরের ধন। বাঙ্গালী না যতদিন গৌরাঙ্গদেবের আদর শিখিতেছে, ততদিন তাহাদের জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত। ও'রে আজিও যে পাঁচশতবৎসর হয় নাই, এখনও বাঙ্গালার অনেক পল্লীর ধূলিতে তাঁহার পদধূলি মিশ্রিত রহিয়াছে;—বাঙ্গালার রজে লুটাইলেও তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ভগবানেরই অবতার হইয়া থাকে, সুতরাং অবতারমাত্রেই মূলতঃ এক। এক অবতার অন্য অবতারের মত বিনষ্ট করিয়া নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা ভ্রান্ত-ধারণা। আমারা জানি এক অবতার কর্ত্তৃক অন্য অবতারের মত পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। তবে সমাজের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য পরবর্ত্তী অবতার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের মত গুলির নিন্দা করিয়া নূতন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দেন। তাই বুদ্ধদেবকে কামনামূলক কর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে সময়ে সময়ে বেদের নিন্দা করিতে হইয়াছে। আবার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানের বহুপর যখন হিন্দুসমাজ কেলব জ্ঞানের শুষ্ক কথায় ভরিয়া গেল,—আত্মসমাধি, আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেবল বিরাট্ তর্কজাল বিস্তার করিয়া মুখে ব্রহ্মবিৎ

এবং কার্য্যে নাস্তিকতা ও ভোগলোলুপতা প্রযুক্ত হিন্দুগণ যখন উন্মার্গ-গামী হইয়া পড়িল, তখনই ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া সংশ্লেষণ-পথ অর্থাৎ ভক্তিমার্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট সোঽহং জ্ঞানীর সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য আত্মানাত্ম-বিচাররূপ বিশ্লেষণ-পথের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের নিন্দাবাদও তজ্জন্য তাঁহার প্রচার করিতে হইয়াছিল। দেশের লোক কি ভুলিয়া গিয়াছে গৌরাঙ্গদেব শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসধর্ম্মাশ্রিত ভারতীসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণান্তর বিশ্লেষেণ-পথে যাইয়া আত্ম-জ্ঞান লাভ করতঃ তিনি সংশ্লেষণ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই পথেই হিন্দু-সমাজকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অনেক বিকটভক্ত গৌরাঙ্গদেবের মহত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া বলিয়া থাকে যে মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং সন্ন্যাসীর নেতা শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়া তদীয় মত গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সাধক মাত্র, আর গৌরাঙ্গদেব অবতার। সাধক বুঝিতে পারিলে বিনা বিচারে অবতারের চরণে লুণ্ঠিত হইবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থিত করিলে তাঁহার আর মহত্ত্ব কি?—বরং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। এই সকল লোকের দ্বারা সমাজের মঙ্গল দূরে থাক্, হিংসাদ্বেষ বৃদ্ধি হইয়া সমাজের সমধিক অমঙ্গলই সাধিত হয়।

বিশ্লেষণ অর্থাৎ—জ্ঞানপথের সাধকগণ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া যান, লীলানন্দ ভোগ করিতে পারেন না; আবার সংশ্লেষণ-পথের লোক লীলা-নন্দে ডুবিয়া স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু যিনি বিশ্লেষণপথে গমন করিয়া সংশ্লেষণ-পথে ফিরিয়া আসেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মস্বরূপে লীলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। একমাত্র তাঁহার জীবনই সম্পূর্ণ।

যাঁহারা লীলানন্দে মাতিয়া যান তাঁহারা নিত্যানন্দের আস্বাদ না পাইয়া নিত্যাবস্থা কঠোর ও শুষ্ক জ্ঞানে বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আবার যাঁহারা কেবল নিত্যানন্দে মাতোয়ারা, তাঁহারা অনিত্যজ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবান্ যেমন নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত, ভগবানের লীলাও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং নিত্য ও লীলা, ভগবানের এই উভয় ভাব যুগপৎ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ—তিনিই প্রেমিক-শিরোমণি। ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে একটী পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি হয় না। উভয় মার্গাবলম্বন অর্থাৎ—জ্ঞান ভক্তির সমন্বয়ী-মার্গে গমন না করিলে পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না;—এবং হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া সার্ব্বভৌম উদারতা জন্মে না। কাজেই তাহারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়াইতে না পারিয়া হিংসাদ্বেষে ধর্ম্মজগৎ কলুষিত করিয়া থাকে। আর যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইয়াছে, তাঁহার নিকট কোন গোল নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সম্প্রদায়ে মিশিয়া, সকল রসে রসিয়া এবং সকলের নিকট বসিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। হনুমান্, প্রহ্লাদ, শুকদেব, জনক প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞানভক্তির মিলনে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও জ্ঞানভক্তির মিলনানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলনই জ্ঞানভক্তির সমন্বয়। আমরা

পরমহংসদেবের জীবনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়াছি। "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসী তাই কর" এই বলিয়া তিনি এক নিঃশ্বাসে ধর্ম্মজগতের যাবতীয় গোল মিটাইয়া দিয়াছেন। কেননা বিশ্লেষণ

অর্থাৎ—জ্ঞান-পথে অদ্বৈততত্ত্ব লাভ করিলে যে কোন সংশ্লেষণ অর্থাৎ ভক্তিপথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। কারণ জ্ঞান লাভ হইলে সাধক বুঝিতে পারে যে, একই অদ্বৈততত্ত্ব অনন্ত আধারে অনন্তরূপে—অনন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং তখন সমস্ত ভেদ-ভাব বিদূরিত হয়—হিংসা-বিদ্বেষ পলায়ন করে। আর এক স্থানে পরমহংসদেব বলিয়াছেন; জ্ঞানীরা নেতি নেতি করিয়া সিঁড়িগুলি অতিক্রম পূর্ব্বক ছাদে উঠিয়াযান, কিন্তু ছাদে যাইয়া দেখেন যে, ছাদও যে চুণ সুরকী-ইটের সমষ্টি, সিঁড়িগুলিও তাহাই। রামকৃষ্ণ সর্ব্বসাম্প্রদায়িকধর্ম্মের ভাব স্বতন্ত্র রাখিয়া, তাহাদের ঔৎপত্তিক কারণ একস্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দুর শাক্ত-বৈষ্ণবাদি, কাহারও ভাব নষ্ট করিয়া দেন নাই, সব ধর্ম্ম সত্য জানাইয়া নৈষ্ঠিক ভাবে আপন আপন সাম্প্রদায়িকভাবে সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলিলে এ কথা বুঝিও না যে, সব ভাব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক করিয়া দেওয়া। স্ত্রীজাতি এক হইলেও ভগ্নীভাবে মাতার ভাব বুঝা যায় না। আবার ভগ্নীতে স্ত্রীভাব উপলব্ধি করিতে যাইলে ভগ্নীভাব বিকৃত হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্য এক বস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাকা প্রযুক্ত, সেই সেই ভাব শিক্ষাদ্বারা সাধন করিলে তবে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। বৌদ্ধভাবে কি আর গোপীভাব উপলব্ধি করা যায়? আমার সাধন-পথটী একমাত্র সত্য, অন্য গুলি ভ্রান্ত, এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সকলের নিন্দা না করিয়া, সতী নারীর ন্যায় আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাক। যে যেরূপে উপাসনা করে, তাহার মনোরথ সেইরূপে সিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ভাব বহু কিন্তু মূলে এক, সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক ভাব নৈষ্ঠিক ভাবে সাধন করিলে একইসত্যে উপস্থিত করে।" নৈষ্ঠিক ভাব ও গোঁড়ামী এক কথা নহে। আপন ভাবে সতীর ন্যায় সাধনা কর, কিন্তু কাহারও ভাবের নিন্দা

করিও না। স্থূলে বিভিন্নতা নিশ্চিত হইলেও মূলে এক। ইহাই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়। ইহাই শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের পূর্ণ মিলনাদর্শ।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপ্লবকালে নিতান্ত প্রয়োজন,—এই সত্য সকলের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পূর্ণ সত্য—প্রকৃত ধর্ম্ম। সুতরাং সাধকমাত্রেই সযত্নে হৃদয়মন্দিরে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে একাসনে স্থাপন কর। আমরা কাহারও হৃদয়ে একাসনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে দেখিলেই, বিনা পরিচয়ে তাহাকে রামকৃষ্ণভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিব। গৌরাঙ্গের মধ্যে শঙ্করকে এবং রামকৃষ্ণের মধ্যে গৌরাঙ্গ ও শঙ্করকে একাসনে না দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে অবতার বলিতে জগৎ কুণ্ঠিত হইত। আমরা কবে দেখিব—এমন দিন কবে হইবে যে, প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে ওতঃপ্রোতভাবে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ অর্থাৎ—জ্ঞানভক্তির মিলন হইলেই ধর্ম্ম-জগতের যাবতীয় হিংসাদ্বেষ—দ্বন্দ্বকোলাহল দূরীভূত হইয়া শান্তির—প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত হইবে। তাঁহাদের অঙ্কে সাধারণ লোকও নির্ব্বিবাদে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলন হইলে জগতের যাবতীয় ভেদভাব দূরীকৃত হইয়া প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে।

জীবন্মুক্তি-অবস্থা

—()॰()—

যাঁহার হৃদয়ে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের এক সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে—যাঁহার হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা, জ্ঞানসমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তিনিই জগতে জীবন্মুক্ত। তাই জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণাদর্শ শুকদেবকে "শুকো মুক্তঃ" বলিয়া শাস্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানীনির্লিপ্ত গৃহস্থ এবং পরমহংস সন্ন্যাসিগণ জীবন্মুক্ত; এক কথায় ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিই মুক্ত। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞের মুক্তি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ বলিলে আধুনিক সমাজের লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; তাহারা ব্রহ্মবিৎ অর্থে স্বেচ্ছাচারী, সমাজদ্রোহী, দেব-গুরু নিন্দাকারী, বেদবিরোধী নাস্তিককে বুঝিয়া থাকে। যে দেশে শিবস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, সে দেশের লোক ব্রহ্মবিৎ সম্বন্ধে কেন এরূপ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইল, তাহা অঘটন ঘটন-পটিয়সী মায়াই বলিতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার নিকট যে ব্রহ্ম হইতে কীট পর্য্যন্ত সমান আদরে গৃহীত হয়। তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, পুরুষ-নারী, পাপী-পুণ্যবান্, জড়-চৈতন্য, অণু পরমাণু, বৃক্ষ-শিলা, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়; সুতরাং একটী অণুও যে তাঁহার নিকট আত্মবৎ প্রীতির বস্তু এবং ভগবানের ন্যায় ভক্তির সামগ্রী। সাধারণ লোক আপনার ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য বস্তুতে তুষ্ট হইতে পারে না, আর ব্রহ্মবিদের নিকট সকল বস্তুই ইষ্টদেবতার স্বরূপ। শাক্ত বলে শক্তি ভিন্ন গতি নাই, বৈষ্ণব আবার কালীর নাম শুনিলে কর্ণ-মধ্যে অঙ্গুলী দিয়া থাকে, কিন্তু

ব্রহ্মজ্ঞের নিকট কালী, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি সমান আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণ মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকট সকল শিলাই নারায়ণ, সাধারণ লোক তুলসীবৃক্ষকে পবিত্র মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী বৃক্ষমাত্রকেই তুলসীর ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করেন ; সাধারণ লোকে গঙ্গাকে পুণ্যনদী মনে করে, কিন্তু ব্রহ্মবিদের নিকট সকল নদীই গঙ্গাসদৃশ। সুতরাং যাহারা নারায়ণশিলাকে লাথি মারিয়া কিম্বা বহ্মজান্ চাচার পাচিত পক্ষীবিশেষের মাংস ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহারা কিরূপ ব্রহ্মবিৎ তাহা ব্যাস-বশিষ্ঠ-জৈমিনি-পতঞ্জলির বংশাবতংস হিন্দুগণের বুঝিবার শক্তি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তদীয় স্থাপিত মঠে শিব, বিষ্ণু, শক্তি প্রভৃতির মূর্ত্তিস্থাপন এবং ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে গঙ্গা, মনসার পর্য্যন্ত স্তোত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানীকে কি নাস্তিকতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন?—হায়রে! সকলই কালের প্রভাব। সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই এইরূপ সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞান বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, কিম্বা প্রেম-ভক্তির অমৃতধারায় ভাসিয়া যাইয়া ইষ্টচরণে লীন হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মবিৎ—তিনিই জীবন্মুক্ত। মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটী বিষয় যে জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান। যথা :—

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতঃ।
বালভাব-স্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥

—জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

যে জ্ঞানে জীব নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রা-বিবর্জ্জিত হয়, এবং বালকের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে। সুতরাং

সংযম বা স্বেচ্ছাচার ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ নহে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও মুক্ত ;—কাজেই জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হন। তাই শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে যে,—

বর্ত্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্ত্তিনি।
অহন্তা-মমতাঽভাবোঃজীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥

যিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্যায় অনুগমনকারী এই দেহে অহংত্ব ও মমত্বভাব শূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত।

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্ব্বত্রে সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥

গুণ দোষ স্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট এবং জগতে নিখিলবস্তুতে সমদর্শিতা জীবন্মুক্তের চিহ্ন।

ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণা ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত-লক্ষণঃ।

যিনি বিশুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ কোন প্রকারে বিদিত নহেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

ইষ্টানিষ্টার্থ-সংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥

ইষ্ট বিষয় বা অনিষ্ট বিষয় সম্যক্ প্রাপ্ত হইলেও সমদর্শিতা দ্বারা আপনাতে ইষ্টবিষয়ে বা অনিষ্টবিষয়ে বিকৃতভাব না লওয়াই জীবন্মুক্তের চিহ্ন। সুধীগণ পরমাত্মা জীবাত্মার শোধিত একভাবপ্রাপিকা বিকল্পরহিতা

চিন্মাত্রবৃত্তিকে প্রজ্ঞা বলিয়া থাকেন। ঐ প্রজ্ঞা সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। দুঃখকষ্টে যাঁহার মন বিষাদিত না হয়, আর সুখভোগেও যাঁহার স্পৃহা না থাকে, এবং অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে।* যিনি ব্রহ্মে বিলীনচিত্ততা-হেতু নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় হইয়া নিত্যানন্দসুখানুভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এইরূপ যাঁহার প্রজ্ঞা নিশ্চল ও যাঁহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি স্বপ্নের ন্যায় প্রপঞ্চ বিস্মৃত প্রায় তিনিই জীবন্মুক্ত।

যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥

প্রেম-ভক্তির অসমোর্দ্ধ রসমাধুর্য্যে যাঁহার চিত্ত ইষ্টদেবতার চরণে চিরকালের জন্য সংলগ্ন হইয়াছে; যিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রাণের ঠাকুরের প্রেমরসার্ণবে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এবং এই জীবই ইষ্টদেবতার স্বরূপ, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন; এরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত কহা যায়। সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্য স্বরূপ জগদীশ্বর, তাঁহাকে যিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। †

প্রকৃত ব্রহ্মগত-প্রাণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি যে স্থানে বাস করেন, তথায় রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্যু-দুঃখ-দরিদ্রতা এ সকল কিছুই

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

নাই। সাধুগণকর্তৃক পূজ্য হইলে কিম্বা অসাধুগণ কর্তৃক পীড্যমান হইলেও উভয় অবস্থাতে তাঁহার চিত্ত সমভাবে থাকে। তাঁহাদ্বারা লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, তিনিও কাহারই কর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন হন না। তাই তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রহ্মলোকবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান ও সুস্থ, দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্য্যবান্ এবং ভিখারী অবস্থাতে রাজচক্রবর্ত্তী। বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মর্ত্ত্যজীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি করেন যে, সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁহার সে উচ্চতার পরিমাণ নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা করে, এবং বিবিধপ্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে আর অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না। শান্তিরূপ খড়্গ যাঁহার হস্তে আছে, দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহার কি করিবে?—তিনি স্বীয় করস্থ শান্তিরূপ মহাখড়্গ দ্বারা তাহাদিগের সকল আক্রমণকেই ব্যর্থ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন। যথা

তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে।

—বেদান্ত রত্নাবলী।

বাস্তবিক যে জীবন্মুক্ত পুরুষ অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করেন না, এবং অতিমাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয়বাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হন্তার অমঙ্গল হউক এরূপ ইচ্ছাও করেন না, ত্রিলোকে তদপেক্ষা আর পূজ্য কে?—তাঁহার এই মহদ্ভাব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বাহ্যিক ভাব দৃষ্টে লোকে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি

আত্মবৎ, অব্যক্তচিহ্ন এবং বাহ্য বিষয়াসক্তি-বর্জ্জিত হন. তিনি দিব্য-রথরূপ এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ করেন। তাঁহাদিগের চিন্তাহীন, দীনতাপ্রকাশ শূন্য, ভিক্ষান্ন আহার, নদীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবার্য্যরূপে অবস্থিতি, নির্ভয় হেতু শ্মশান বা কাননে নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোষণাদি শূন্য দিগ্ রূপ-বসন, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদান্তরূপমার্গে গতিবিধি এবং পরব্রহ্মেই রমণ হয়। আবার—

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালকবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৫৪২

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কখন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান, কখন বল্কল বা চর্ম্মাম্বর ধারণ, কখন বা জ্ঞানাম্বর গ্রহণ করিয়া, কখন উন্মত্তবৎ, কখন বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায় ধরা ভ্রমণ করেন।

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ,
ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচার-কলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সতত পরমানন্দসুখিতঃ ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৫৪৩

নিত্য পরমানন্দে আনন্দিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কোন স্থানে মূর্খের ন্যায় কোন স্থানে পণ্ডিতের ন্যায়, কোন স্থানে বা রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী কোন স্থানে ভ্রান্তবৎ, কোন স্থানে প্রশান্ত, কোন স্থানে অজগর ধর্ম্মাবলম্বী কোন স্থানে দানপাত্রবৎ, কোন স্থানে অবমানিত, কোন স্থানে বা অপরিচিত, এইভাবে ভ্রমণ করেন। কাজেই অল্প বুদ্ধি লোক সকল তাঁহাদিগকে

বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া আপন শিক্ষার তুলনায় মতামত প্রকাশ করে। কেহ বা সাধুর সৌভাগ্যসম্মানে ঈর্ষান্বিত হইয়া মহাপুরুষদিগের অযথা কুৎসা প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাদৃশ মহাত্মার কৃপা দেবতাদিগেরও বাঞ্ছনীয়। যথা :—

বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মাবিষ্ণ্বিন্দ্রশঙ্করাঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ।

ব্রহ্মবিচার দ্বারা নিজস্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মায় প্রকাশ যাঁহার সম্বন্ধে হয়, তদ্রূপ আত্মবিৎ জীবন্মুক্তের দয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব প্রভৃতি দেবতারাও আকাজ্ক্ষা করেন।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই বিদেহকৈবল্য অর্থাৎ দেহান্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুব্যক্তি মৃত্যুবাসরে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ আত্মস্বরূপে লীন হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন, ভক্ত অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ দেহান্তে ঈশ্বরলোকে বাস করেন, তৎপরে কল্পান্তে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সূক্ষ্ম ও কারণদেহ বিনষ্ট হওয়ায় রক্তমাংসের দেহধারী হইয়াও তিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন,—তাই তিনি জীবন্মুক্ত। সুতরাং তাঁহার স্থূলদেহ নাশে অন্য কোন প্রকার দেহ না থাকায় উৎক্রান্তি হয় না, একেবারে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনুষ্যের দেহত্যাগে যে মুক্তি হয়, সেই মুক্তি জীবদ্দশাতেই লাভ হয়,—দেহধারী হইয়াও তিনি নির্ব্বাণ-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্তি ঘটিলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যায়; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, সুখ, দুঃখ, শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ, হিংসা, দ্বেষ, মদ, মোহ,

ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া যাইবে। তখন কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাওয়ারি নাম জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি, এবং অন্তে নির্ব্বাণ বলিয়া কথিত হয়।

সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ—আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘজীবনেও আনন্দ প্রকাশ করেন না. অর্থাৎ—তিনি আসন্ন-মৃত্যু ও দীর্ঘজীবন, এতদুভয়কে সমভাবে দেখেন। তিনি মরণভয় তুচ্ছ করিয়া প্রেমে মাতোয়ারা—বিহ্বল হইয়া গদ্গদস্বরে প্রাণেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি কালকে কলা দেখাইয়া রামপ্রসাদের সুরে গাহিয়া থাকেন—

আমি তোর আসামী নইরে শমন, মিছা কেন কর তাড়না।

আবার "সুধাগে তোর যমরাজাকে আমার মত নিয়েছে ক'টা" বলিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া তিনি যমদূতকে তাড়াইয়া দেন। বস্তুতঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইষ্ট দেবতার চরণে বিক্রয় করিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে, তাঁহার সে প্রেম ও আনন্দ অনন্তকাল ব্যাপী, কস্মিন্‌কালে কোন জগতে ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিনি যাঁহার সহ-বাসের আনন্দ ও যে প্রেম সম্ভোগ করিয়াছেন, দেহান্তেও তিনি তাঁহার নিকটে থাকিবেন এবং সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং মৃত্যু তখন আর তাঁহার নিকট প্রকৃত মৃত্যুরূপে অগ্রসর হয় না, অর্থাৎ—উহা তাঁহার পক্ষে আর তখন ইহ-পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। ইহাকেই সাধকের অমর জীবন, অনন্ত জীবন বা সত্য জীবন লাভ

করা বলে। এইরূপে সত্যজীবন লাভ করাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। আবার ইহলোকে যিনি জীবন্মুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে—

উপসংহার

কালে গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে, পাঠক! পরলোকে পরমা গতি লাভ হইতে পারে, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্তে কাল ক্ষয় করিও না; সকলেরই সাধনাদ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যত প্রকার সাধন আছে, মুক্তি-বিষয়ক সাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান;—মানবের পরমপুরুষার্থ। ইহাই মানবজীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য; তজ্জন্য আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ যাহারা মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে মনুষ্য-গর্ভজাত গর্দ্দভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা।—

জাতস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু-জীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ॥

—যোগবাশিষ্ঠ।

পাঠকগণ! সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ মদ্গুরু যে গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া ছিলেন, আজ পাঁচ বৎসর পরে সে ভার হইতে পার পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনি আমাকে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করিয়া সমস্ত শাস্ত্রার্থ প্রকাশ ও সাধনপন্থা প্রকটিত করিয়া গ্রন্থ প্রচার করিতে আদেশ করেন। যদিও আমি তাঁহার সেবক-বৃন্দের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে অধম, তথাপি তাঁহার আশীর্ব্বাদাদেশে,—তিনি যেরূপ জ্ঞান ও শক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ এবং ভক্তি এই কয় প্রধান স্তরে বিভক্ত করিয়া, তাহার

স্থূলমর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যসাধন, যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিকগুরু, এবং এই প্রেমিকগুরু গ্রন্থে বিবৃতকরতঃ সাধারণের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কতদূর তাঁহার আদেশ পালিত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বিষম কাল পড়িয়াছে,—হিন্দু সমাজের উপযুক্ত নেতার অভাব হওয়ায় সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। লোকসকল উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের অধিকাংশ লোক বিপথগামী; অথচ সকলেই শাস্ত্রবেত্তা, ধর্ম্মবক্তা ও উপদেষ্টা। তাহারা আপন আপন শিক্ষা-দীক্ষানুসারে যাহার যেমন সংস্কার বা ধারণা জন্মিয়াছে, সে সেইরূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছে। ইহাতে নিজে ত প্রতারিত হইতেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনকেও বিপথগামী করিতেছে। কেহ কেহ অবিদ্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া আত্মদর্শী ও সত্যমর্ম্মী ঋষিগণের ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আপন কৃতিত্ব জাহির করিতেছে। কেহ বা একই শাস্ত্রের কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্জিত এবং কতক মিথ্যা লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বাদদিয়া আপন মতলবসিদ্ধির উপযোগী অংশ বাছিয়া লইয়া ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়াছে। কেহ কেহ পুরাণ-তন্ত্রগুলি বালিকার পুতুলখেলা ভাবিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মবিৎ হইয়া বসিতেছে। কেহ বা কোন শাস্ত্রকে আধুনিক, কোন শাস্ত্রকে স্বার্থপর ব্রাহ্মণের রচিত বলিয়া মুন্সিয়ানা চা'লে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। কেহ ব্যাকরণের তাপে পুরাণগুলি গলাইয়া তাহার খাদ বাহির করিয়া দয়াপরবশ হইয়া খাঁটি অংশ বাহির করিয়া দিতেছে,—সে তাপে ঐতিহাসিক সত্য পর্য্যন্ত পুড়িয়া যাইতেছে। কোন দল বা নিয়ম-সংযম-বিধিনিষেধ কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছে। কিন্তু সকলেই ধর্ম্মহীন,—বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছে। ধর্ম্মের লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছে,—অথচ মুখে বড় বড় কথা; দর্শন, উপনিষৎ, যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহারা ছোট

কথার ধারই ধারে না তাহারা কেহ বেদান্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শূন্যবাদী, কেহ গীতোক্ত কর্ম্মযোগী, কেহ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানী, কেহ তন্ত্রোক্ত কৌলাচারী, কেহ উজ্জ্বলরসাস্বাদী আর কাহারও মুখে যোগ সমাধি।

এইত গেল শিক্ষিত নেতা ও উপদেষ্টা এবং তাহাদিগের চেলার কথা। আর যাহারা ধর্ম্মের নিম্নস্তর লইয়া আছে, তাহারা কেবল তিলকমাটী, মালা ঝোলা, চিনি-কলা, বাহ্য শৌচাচার ও চৈতন চুট্‌কী লইয়া সময় কাটাইতেছে। তিন-বেলা সন্ধ্যাহ্নিকের ঘটা, অথচ মিথ্যা মোকদ্দমা, মিথ্যা-সাক্ষ্য, পরনিন্দা, পরস্বাপহরণ ও পরদারগমনে নিবৃত্তি নাই। এই শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের প্রাণ ছাড়িয়া সংস্কার বশে হাড়মাস লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছে। একটা কথায় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—হিন্দু সমাজে ব্রত ও পর্ব্ব উপলক্ষে উপবাস করিবার বিধি আছে। উপ=সমীপে+বাস, অর্থাৎ ভগবানের নিকটে বাস করাই উপবাস; তজ্জন্য পূর্ব্বদিন হইতে সংযমাদি করিয়া চিত্তশুদ্ধ রাখিতে হয়, পরে পর্ব্বদিন দিবারাত্র সংযত ভাবে ভগবদারাধনা ও ধ্যানধারণায় নিযুক্ত থাকাই ব্যবস্থা। কিন্তু মিথ্যাকথা বলিয়া পরনিন্দা ও কলহ করিয়া দিবারাত্র কাটাইয়া জলটুকু না খাইয়া অনাহারে থাকিতে পারিলেই উপবাসের সার্থকতা হইল বলিয়া তাহারা মনে করে। প্রথম শ্রেণীর লোক জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বাঁধনের উপর বাঁধন কষিয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িতেছে।

আর এক শ্রেণীর লোক হিন্দুসমাজে দেখা দিয়াছে, তাহারা জারজ-ধর্ম্মাবলম্বী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাত হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া ইহারা অজ্ঞসমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া বসিতেছে। তাহাদের মুখে কেবল কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার ধুয়া, কেবল ধর্ম্মসভা ও বক্তৃতার উচ্চনিনাদ; যাহারা

গীতার প্রথম শ্লোকটী অনুবাদ করিতে গিয়া সাতটী ভুল করিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগের সমালোচিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করতঃ এই শ্রেণীর লোক পণ্ডিত হইয়া হিন্দুদিগের গুরু হইতেছে। ঋষিগণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বুঝিয়া তাহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদির ভ্রমসংশোধন ও শ্লোকাঙ্গকর্ত্তন করিয়া তাহারা হিন্দুসমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে। এই শ্রেণীর লোকদ্বারা হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পপাদপ ফল-ফুল-পত্রাদি যুক্ত শাখা-প্রশাখা শূন্য হইয়া স্থাণুবৎ শোভিত হইবার যোগাড় হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহারা অবতার। নিজে কিম্বা ভক্তগণ দ্বারা সমাজে অবতাররূপে পরিচিত হইতেছে। ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের পর হইতে এতদ্দেশ অবতারগণে পরিপূর্ণ। প্রতি জেলাতেই দু'একটী অবতারের অভ্যুদয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। ইতিমধ্যে দুই একটী অবতারের কারা ও দ্বীপান্তর বাসের লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে। তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ সরল লোকগণ দলে দলে যাইয়া অবতারের দলপুষ্ট করিতেছে। এই শ্রেণীর লোকদ্বারা হিন্দুসমাজ খণ্ড খণ্ড হইতেছে; এবং প্রকৃত সাধুচরিত অবতারের অন্তরালে পড়িয়া লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। অবতারের সংশয়জাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া সাধু মহাত্মার ত্যাগবৈরাগ্য বা জ্ঞান ভক্তির আদর্শ সাধারণে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

এক্ষণে সাধারণের উপায় কি?—তাহারা কি করিবে, কোন পথ ধরিবে এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে? তাই বলিয়াছি, বিষম কাল পড়িয়াছে। আর বিষম কাল পড়িয়াছে বলিয়াইত ভয় হয়। বিশ্বাস করি কার কথায়? যে বলিতেছে "গৃহস্থ জাগরিত হও," আবার সেই বলিতেছে "উঠিওনা, রাত্রি আছে," এখন কি করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, আমাদের ঈশ্বরদত্ত যে মনুষ্যত্ব—তাহাকেই আশ্রয় করা—কেন না, তিনি আমাদের

কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য, প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তখন একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া— বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিলে কোনই গোলে পড়িতে হইবে না। আমাদের দেহরথে বিবেক শ্রীকৃষ্ণ, সংশয়াকুলিত বিষাদমগ্ন শিষ্য ও সখা অর্জ্জুনরূপী মনকে নিয়তই গীতামৃত পান করাইতেছেন। অতএব বিবেকের শরণাগত হইয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। কিন্তু যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, সে'ত মায়ার সম্মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পরিচালিত হইতেছে, বিবেকের বশবর্ত্তী নহে। সুতরাং প্রথমতঃ বিবেক জাগ্রত করিবার জন্য বিধিমত চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। আর চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছা থাকিলে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলিও সর্ব্বদা পালনীয়। তাই ঋষিগণ মানবজীবনের প্রথম সোপানে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শাস্ত্রাদি পাঠে জ্ঞানলাভ এবং আহারাদি ও শমদমাদি অভ্যাসে চিত্তশুদ্ধি হইত। তাই ধর্ম্মের ভিত্তিই ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য অভাবেই আমাদের সমাজের এই দুরবস্থা। চিত্তশুদ্ধ না হইলে কোন ধর্ম্মেই অগ্রসর হওয়া যায় না। খৃষ্টান-মুসলমানে মতভেদ, শাক্ত বৈষ্ণবে মতভেদ, পৌরাণিক-দার্শনিকে মতভেদ; কিন্তু চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েই মতদ্বৈধ দেখা যায় না। চরিত্র গঠন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা খৃষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনুমোদিত। চুরি কর, মিথ্যা কথা বল ইহা কোন সম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত নহে। সুতরাং আমরা প্রথম জীবনে সর্ব্বসম্মত চিত্তশুদ্ধির সাধনা আরম্ভ করিতে পারি। ইহাতে প্রতারিত হইবার ভয় নাই, এবং ইহার অভ্যাস বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক চিন্তার অভ্যাস করিলেই সহজে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতে শরীর নীরোগ ও সুস্থ হইবে এবং বিশ্বাস ভক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে।

চিত্তশুদ্ধি হইলে যাহার যে ভাবে, যে মতে বিশ্বাস হইবে, তাহাই

অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অন্যমত শ্রেষ্ঠ ও নিজমত নিকৃষ্ট মিথ্যা ও কুসংস্কারপূর্ণ শুনিয়াও বিচলিত হইওনা। নিজমত দৃঢ় করিয়া ধারণ-পূর্ব্বক, তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য চেষ্টা করিবে। কেননা কোন মতই,—কোন সম্প্রদায়ই নিরর্থক নহে। অজ্ঞতাপ্রযুক্ত লোক সকল সাম্প্রদায়িক মতগুলির সমালোচনা করিয়া দুর্ব্বলাধিকারীর মন বিগড়াইয়া দেয়; কিন্তু কোন মতই মিথ্যা নহে, সকল মতেরই আশ্রিতগণ পূর্ণসত্যে কিম্বা সত্যের একদেশে উপনীত হইবে। যখন মানবসমাজের জনগণ পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির, তখন তাহাদিগের মতে বৈষম্য থাকা অবশ্য-ম্ভাবী; সুতরাং মতগুলিকে পথ মাত্র জানিয়া,—কোন মতের নিন্দা না করিয়া কিম্বা সকল মতের করিম, কালী, কৃষ্ণ, খৃষ্টের খিঁচুড়ী না পাকাইয়া সতী নারীর ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকিবে। জন্মান্তরের সংস্কার এবং শিক্ষা ও রুচিভেদে অধিকারানুরূপ যে কোন একটী মত অবলম্বন করিবে। অনন্তর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া, ভাব পুষ্ট হইয়া লক্ষ্য স্থির হইলে তদনুরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিবে। সাধনায় লক্ষ্য বস্তু উপলব্ধি হইলেই তৎপ্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে—তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইবে। তখন সংসারের যাবতীয় বস্তুতে বিরাগ জন্মিয়া অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তের অবিচ্ছিন্না একমুখী গতি হইবে। কাজেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হইবে। তখন আত্মস্বরূপ লাভে কৃতার্থ হইয়া মুক্তিপদে অবস্থিতি করিবে।

কিন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে একজন মুক্ত ব্যক্তির সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রে তিনিই গুরু নামে অভিহিত হন। গুরুর কৃপা না হইলে মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরু শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার না করিলে, অধ্যাত্ম-জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হওয়া যায়না। সুতরাং গুরুর আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিবে। যিনি আত্মস্বরূপ লাভ

করিয়াছেন তিনিই গুরু। নতুবা অন্যের নিকটে যাইলে গুরুর অভাব পূর্ণ হইবে না। এরূপ গুরু না পাইলে তজ্জন্য সরলভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে। অকপট ভাবে সরলপ্রার্থনা আমাদের পক্ষে বড়ই কার্য্যকরী। যখন যে দুর্ব্বলতা অনুভব করিবে, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও, হাতে হাতে ফল পাইবে। সুতরাং গুরুর প্রয়োজন বুঝিলে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিও—ভগবান তাহা পাঠাইয়া দিবেন। উপযুক্ত সময়ে গুরু আপনা হইতে লাভ হইয়া থাকে। গুরু পাইলে আর ভাবনা কি? সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া তদীয় আদেশ পালন করিয়া যাও, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে।

তবে দেখ, প্রকৃত ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তির এ জগতে কিছুরই অভাব হয়না। দূর হইতে হাটের উচ্চরোল শুনা যায়, কিন্তু হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলে আর কোন গোল নাই। তদ্রূপ ধর্ম্ম জগতেও বাহিরে বাদবিতণ্ডা, বিদ্বেষ কোলাহল, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের নিকট কোন বিসম্বাদ নাই। মুক্তাবস্থা আমাদের স্বভাব, সুতরাং তাহা লাভ যাবতীয় কার্য্য অপেক্ষা সহজ। ধর্ম্মলাভ করিতে বিদ্যাবুদ্ধি, মূলধন কিম্বা বলবীর্য্যের প্রয়োজন হয় না; কেবল প্রাণভরা বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। মানবমনে স্বতঃই দুইটী প্রশ্নের উদয় হয়—ভগবান্ আছেন কিম্বা নাই; যদি না থাকেন ত কথাই নাই—চার্ব্বাক মতানুসরণ কর; নতুবা 'তুমি কে' তাহা অনুসন্ধান কর। আর যদি থাকেন অবশ্য কেহ দেখিয়াছেন; যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার নিকট দেখিয়া লও কিম্বা তিনি যেরূপে দেখিয়াছেন সেই উপায় জানিয়া লও, তাহা হইলে কৃতার্থ হইবে। আর যাহার ভগবানে বিশ্বাস নাই, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি সংস্কারগুলি ভুলিয়া সরল ভাবে—সমাহিতচিত্তে অনুসন্ধান করুক তাহার অভাব কি?—সে চায় কি? আমরা সুখের কাঙ্গাল—চিরদিনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণসুখ প্রার্থনা করি। কিন্তু সুখ

কোথায়?—ধনে জনে, বিদ্যাবুদ্ধিতে, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে কিম্বা মান, যশ প্রভৃতি অনিত্য পার্থিব পদার্থে কেহ কখনও সুখী হইতে পারে নাই; সুতরাং তাহাতে তোমারও সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি নিজেই আনন্দময়; তুমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিলেই সুখী হইবে। যে ব্যক্তি ভগবান্ মানেনা কিন্তু সুখ চায়, আর যে ব্যক্তি সুখ চাহেনা, ভগবান্ লাভ করিতে ব্যাকুল তাহারা উভয়েই প্রকারান্তরে একবস্তুর ভিখারী। কেননা সুখ যে সুখস্বরূপ ভগবান্ ব্যতীত কোথাও নাই, আবার ভগবান্ লাভ করিতে পারিলেই সুখলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং উভয়েই এক পথের পথিক। কিন্তু অনভিজ্ঞ স্থূলদর্শী ব্যক্তি তাহাদের নাস্তিক ও ভক্ত নামে আখ্যা দিয়া জগতে দলাদলি ও হিংসাদ্বেষের সৃষ্টি করিবে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তব্যক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, তবু তাহাকে নাস্তিক বলিও না; কারণ সে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া জানেনা বা বুঝিতে পারে নাই। সেরূপ ধার্ম্মিককেও বৈষ্ণবের কৃষ্ণভক্ত বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা সকলেই প্রবাহের বারি—অনন্তধামের যাত্রী; যদিও আপন আপন বাসস্থান হইতে যাত্রা করার নানা পথের সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি সকলের গতি একই কেন্দ্রে—ভগবচ্চরণে। তবে আর হিংসা বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল কর কেন? যদি সুখ চাহ, সর্ব্বাবচ্ছেদে ভগবানের শরণাগত হও, তাঁহার কৃপায় অনন্ত সুখশান্তির অধিকারী হইয়া নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।

অতএব ধর্ম্মলাভ করিতে কাহারও কোন বাধা হইতে পারেনা। যে কেনও একটী মতের আশ্রয়ে পরিচালিত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হইতে পারিবে। একটী আলপিন সাহায্যে আত্মহত্যা করা যায়, কিন্তু অপরকে হত্যা করিতে হইলে যুদ্ধশিক্ষা ও ঢাল তরবারির প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ নিজে ধর্ম্মলাভ করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। তবে যাঁহারা লোক-শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নানাশাস্ত্র, নানাপথ, নানামত—বিভিন্ন

সাধন প্রণালী প্রভৃতি জানিতে হয়। কিন্তু সত্য প্রত্যক্ষ না করিয়া গুরু হইবার স্পর্দ্ধা এবং শাস্ত্রালোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শ্রেণীর লোক-দ্বারাই হিন্দু-সমাজ অধঃপাতে গিয়াছে। অনধিকারী হইয়া যাহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মপ্রচার করে, তাহারা দেশের, দশের, সমাজের ঘোর শত্রু। সত্য লাভ না করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ নির্ণয় ও তাহার মর্ম্ম-রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হওয়া যায়না। হিন্দুশাস্ত্র অনন্ত; সর্ব্বাধিকারী জনগণকে স্থান দিবার জন্য প্রবৃত্তি পথে শত শত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, নিবৃত্তিপথে স্তরে স্তরে অনন্ত দেশে উঠিয়া গিয়াছে। সুকুমার কুমারগণের সুকোমল হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপনের জন্য বর্ণাশ্রমোচিত ব্রত নিয়ম হইতে ব্রহ্মগত প্রাণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসকের সন্ন্যাস পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্মের দেহ। গুরুকৃপায় প্রকৃত জ্ঞান না হইলে শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহা বুঝা যায়না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ফলও এক। তবে উদ্দেশ্যপথে যাইবার পদ্ধতি বা প্রণালী বিভিন্ন হইতে পারে। শাস্ত্র সকল সত্যদর্শী ঋষিগণের রচিত; সত্য এক, সুতরাং শাস্ত্র সকল কি পরস্পর ভিন্ন ও বিসম্বাদী হইতে পারে? কিন্তু অন-ধিকারী স্থূল বুদ্ধিতে শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরস্পর বিভিন্ন দেখিয়া থাকে। তাই আজ একই শাস্ত্রের পাঁচজনে আপনার সংস্কার ও শিক্ষানুরূপ পাঁচ-প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া হিংসাবিদ্বেষের বহ্নিতে সমাজ দগ্ধ করিতেছে। এক অধিকারীর উপদেশ অন্য অধিকারীর নিকট,—গৃহস্থের উপদেশ সন্ন্যাসীকে আবার সন্ন্যাসের উপদেশ ব্রহ্মচারীর নিকট ব্যক্ত করিয়া হিন্দুসমাজকে উন্মার্গগামী করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণ লোক এই সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা ও উপদেশদাতা প্রচার কর্ত্তাগণের বিভিন্ন মতবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবিডুবি খাইয়া মরিতেছে। অতএব সত্যলাভ না করিয়া কখনও শাস্ত্রের গোলক ধাঁধায় প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে আর এ জীবনে বাহির

হইতে পারিবেনা। লোক সকল ব্যবহারিক বুদ্ধিতে শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অজ্ঞ সমাজে বিজ্ঞ সাজিয়া কেবল বিরাট তর্কজাল বিস্তার করতঃ বৃথা কচকচি করিয়া বেড়ায়। এইরূপ পল্লবগ্রাহী কখনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা; উপরন্তু আরপাঁচজনকেও বিপথে পরিচালিত করিয়া সমাজে দলাদলির সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং সাধকগণ ভক্ত ও ভগবানের লীলাগ্রন্থ এবং স্ব স্ব সাধনপথের সারভূত কার্য্যসাধনোপযোগী শাস্ত্রাংশমাত্র পাঠ করিবে। তৎপরে সত্য লাভ করিয়া সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। তখন দেখিবে, হিন্দুশাস্ত্রে কিরূপ সুশৃঙ্খলে কত অগণিততত্ত্ব স্তরে স্তরে সজ্জিত। কোন শাস্ত্র মিথ্যা বা নিরর্থক নহে, কোন না কোন অধিকারীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি এমন কোন নূতন কথা কেহ বলিতে পারিবেনা, যাহা বিশাল হিন্দুশাস্ত্রের কোন না কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। আমরা উপযুক্ত গুরু অভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত বলিয়া অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্য্যবংশে জন্মিয়াও অকর্ম্মণ্য নগণ্য হইয়াছি এবং সর্ব্বদা রোগে শোকে এবং সঙ্কল্পিত কর্ম্মনাশে হা-হুতাশ করিয়া মরি।

অতএব সত্যলাভ করিয়া যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন তিনিই হিন্দুশাস্ত্ররূপ কল্পভাণ্ডারের দ্বারী হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকারানুরূপ তত্ত্বকথা প্রচার দ্বারা সমাজের সুখশান্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন। ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণের শুষ্ককণ্ঠে ধর্ম্মের অমৃতধারা ঢালিয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন। পাঠক! আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য-সাধন, যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিক-গুরু ও প্রেমিকগুরু * এই পাঁচখানি পুস্তক হিন্দু শাস্ত্রের সারভূত;

* গ্রন্থকারের এই পুস্তক কয়খানি ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে—সমগ্র বঙ্গদেশ আলোড়িত করিয়াছে। এমন সহজ ও সরল ভাবের আধ্যাত্মিক-রহস্য-

হিন্দুশাস্ত্র, সমুদ্রমন্থনে এই সুধার উদ্ভব হইয়াছে, এ সুধাপানে মরজগতের মানুষ অমরত্ব লাভ করিবে—আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইবে। আমরা যেরূপ নির্ব্বিবাদে ধর্ম্মলাভ করিবার উপায় উপরে বিবৃত করিয়াছি, উক্ত পুস্তক কয়খানির সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হইবে। এই পুস্তক কয়-খানি ঘরে থাকিলেই আর বিশাল হিন্দুশাস্ত্রগুলি ঘাঁটিয়া মাথা খারাপ করিতে হইবেনা, ইহাতে চিত্তশুদ্ধি যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সার তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি প্রথমতঃ আপন আপন বর্ণাশ্রমাচারের সহিত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" গ্রন্থোক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। তৎপরে মনঃস্থিরের জন্য "যোগীগুরু" গ্রন্থোক্ত আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনাদি অভ্যাস করিবে। তৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের জন্য "জ্ঞানীগুরু" গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব বিচার করিবে। তৎপরে জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইলে, স্থূলভাবে "তান্ত্রিকগুরু" গ্রন্থোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা সূক্ষ্মভাবে "যোগীগুরু" বা "জ্ঞানী গুরু" গ্রন্থোক্ত যোগ সাধন করিয়া লক্ষ্য বস্তু উপলব্ধি করিবে। তৎপরে এই "প্রেমিকগুরু" গ্রন্থোক্ত প্রেমভক্তির অমৃত প্রবাহে ভাসিয়া গিয়া চিরদিনের

পূর্ণ উচ্চ দরের পুস্তক আর বঙ্গভাষায় বাহির হয় নাই। জীবন্ত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও মনোহারিত্বে ইহার চমৎকারিত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকগুলি লণ্ডন ও বৃটিশ্ মিউজিয়ম্ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তদীয় গুণগ্রাহী সেক্রেটারী পুস্তকগুলির গুণে মুগ্ধ হইয়া বিরাট্ প্রশংসাপত্রে পুস্তক ও তাহার প্রণেতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছেন। ভারতবাসীর আর কথা কি? পুস্তক কয়খানি গ্রন্থকারের জীবনব্যাপী সাধনার সুধাময় ফল। এই সকল গ্রন্থোক্ত পন্থায় খ্রীষ্টান্ মুসলমানগণও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাব বজায় রাখিয়াও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করিতে পারিবে। মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধনে যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের এই পুস্তক কয়খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—প্রকাশক

জন্য লক্ষ্য বস্তুতে মগ্ন হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে। এই গ্রন্থ কয়খানিতে সাধকের অধিকারানুরূপ নানাপ্রকার সাধনপন্থাও প্রকটিত করা হইয়াছে। এমন কোন নূতন তত্ত্ব কেহ বলিতে পারিবে না, যাহা এই কয়খানি গ্রন্থের মধ্যে কোন না কোন খানিতে বিবৃত হয় নাই। তৎপরে হিন্দুশাস্ত্র বুঝিবার জন্য এই সকল গ্রন্থে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে—ধর্ম্মের জটিল ও গুহ্য-তত্ত্বের যেরূপ রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে, শাস্ত্রের গূঢ় ও কূটস্থানের যে নিয়মে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিভেদে যেরূপ আচার ও সাধনার তারতম্য দেখান হইয়াছে—যোগ, যাগ, তপ, জপ, পূজা ও সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও যুক্তি যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে—যেরূপ নিয়মে তন্ত্র ও পুরাণোক্ত দেব, দেবী লীলা কাহিনী, মূর্ত্তিতত্ত্ব, মন্ত্র, যন্ত্র, অবতারবাদ, মতবাদ, প্রভৃতির মর্ম্ম অবগত হইবার উপায় করা হইয়াছে এবং সমন্বয় ও সামঞ্জস্যভাবে অধিকারানুরূপ শিক্ষাদানের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—তাহা শিক্ষা করিয়া হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে অতি সহজে তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে শাস্ত্রকার ঋষিগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে। সকলে তোমার উদার মতের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। নতুবা বহু-কালের বহু মহাপুরুষ পরম্পরায় প্রকাশিত শাস্ত্র সমুদ্র গণ্ডুষে উদরসাৎ করিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইতে যাইবে মাত্র। আশা করি স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের হিতসাধক ব্যক্তিগণ এই কথা ভুলিয়া যাইও না।

পরিশেষে দেশের মহামান্য নেতাগণ এবং ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারকগণের নিকট গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে, তোমরা পথ ছাড়িয়া বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছ কেন? গৃহের ভিত্তি ছাড়িয়া আগেই ছাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছ কেন? ধর্ম্ম ও সমাজ থাকিলে তো তাহার সংস্কার করিবে

এখন যে ভায়ে ভায়ে, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে বিভিন্ন সমাজ ও বিভিন্ন ধর্ম্ম। তোমরা তবে সংস্কার করিবে কি? মাথা নাই, মাথা ব্যথা হইবে কিরূপে? আগে একতার বন্ধনে সমাজ সংস্থাপন কর, তৎপরে দোষ দেখিলে সংস্কার করিও। মৃত সমাজদেহে আঘাত করিয়া দেহের সমস্ত অঙ্গ গলিত করিওনা; আগে সমাজদেহ সঞ্জীবিত কর, তৎপরে দূষিত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিও, দেখিবে ঔষধ ও পথ্যে দুই দিনেই ক্ষতস্থান আরোগ্য হইয়া উঠিবে। আগে নিজে সংস্কৃত হও, ধর্ম্মলাভ কর, তৎপরে সংস্কার বা ধর্ম্মপ্রচার করিও। নিজে অন্ধ হইয়া, অন্য অন্ধের পথ দেখাইতে গিয়া উভয়ে খানায় পড়িওনা। ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবার পূর্ব্বে, অন্য জাতির ভাবিয়া দেখা উচিত, সে জাতীয় ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত কিনা। ভণ্ড সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর অধঃপতনে দুঃখ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, আমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিতেছি কিনা? আমরা যে আপন ভুলিয়া পরের দোষ দেখিতে শিখিয়াছি, ইহাই আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ। পরনিন্দা, পরালোচনা করিয়া দিন দিন আমরা অধঃপাতের চরমস্তরে নামিয়া পড়িতেছি। সুতরাং আমরা প্রথমতঃ পরের চিন্তা না করিয়া নিজকে ভাল করিতে চেষ্টা করি, পরে পরের ভাল করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিব। বড় বড় কথার বক্তৃতা না দিয়া সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা কর। আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা কর। প্রকৃত শিক্ষা লাভে যখন জীব, জগৎ ও ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥"

এই সুমহান্ উদার-ভাব—অচ্ছেদ্য প্রেমের ভাব বুঝিতে পারিবে। তখন আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বিশ্বময় প্রসারিত হইবে, জগতের স্বার্থে আত্ম-স্বার্থ

পদদলিত হইয়া যাইবে। আমিত্বের একটী শৃঙ্খলে রাজা প্রজা, দীনদরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িবে। তখনই প্রকৃত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তোমরা একতার হার গলে পরিয়া বিশ্বজয় করিতে সক্ষম হইবে। পঠিত শিক্ষায় গঠিত জীবন না হইলে সে শিক্ষার নামে যে ধিক্কার পড়িবে। অতএব প্রথমতঃ শিক্ষালাভ করিয়া তদনুযায়ী চরিত্রগঠন কর। তৎপরে সাধু শাস্ত্রের কৃপায় এবং সাধনাবলম্বনে সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া জগতের হিতে জীবন উৎসর্গ করিও। কাহারও নিন্দা না করিয়া—অনর্থক সমালোচনা না করিয়া পাপী, তাপী, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দাও,—সকলকে স্কন্ধে বহন করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের বন্ধুর সিঁড়িগুলি পার করিয়া দাও। কাহারও বিশ্বাস নষ্ট না করিয়া পারত তোমার নূতন দ্রব্যগুলি তাহাকে দান কর। চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান, এক পথের যাত্রী, সকলেই একই স্থানে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিব। ক্রমশঃ দেখিবে জগৎ হইতে হিংসাদ্বেষ বিদূরিত হইয়া প্রেমের বন্ধনে সকলে বাঁধা পড়িবে। একতার পবিত্র বন্ধনে—প্রেমের সুধা সম্পৃক্ত মলয়হিল্লোলে সমাজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে অচিরে হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয়পতাকা ভারত গগনে উড্ডীয়মান হইবে, আবার হিন্দু দেশের ও হিন্দুজাতির গৌরবরব দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইবে।

পাঠকগণ! ভারতের সুবর্ণযুগে দেবকল্প ঋষিগণ সাধনা-পর্ব্বতের সমাধিরূপ উন্নতশৃঙ্গে বসিয়া জ্ঞানের দীপ্তবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যে সকল নিত্যসত্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহারই সুধাময় ফল হিন্দুশাস্ত্র। সেই আর্য্য ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে জানিত ও লোক-হিতার্থ প্রচারিত অমূল্য শাস্ত্র অগ্রাহ্য পূর্ব্বক স্বকপোল কল্পিত ধর্ম্মমতের অসারভিত্তি অবলম্বন করিয়া স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের কলঙ্ক রটনা

করিওনা। আত্মশক্তি, আত্মপ্রতিভা, আত্মসাধনা ও যুক্তি বিচারে জলাঞ্জলি দিয়া পরানুকরণে প্রতারিত হইওনা। পরের কথায় করস্থিত পরমান্ন পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টিভিক্ষার জন্য পরের দ্বারস্থ হইওনা। আপন কানে হাত না দিয়া দেখিয়া পরের কথায় বায়সাপহৃত কুণ্ডলের অনুসন্ধানে বাহির হইওনা। পরের কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া জড়ত্ব বশতঃ জড়, পৌত্তলিক ও কুসংস্কারের ধুয়া ধরিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের এবং স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিওনা, রসনা কলুষিত হইবে। আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া পরপদ লেহন করতঃ সমগ্রজাতির কলঙ্ক ঘোষণা করিওনা। যে দেশে—যে জাতির মধ্যে জন্ম হইয়াছে, তুমি তাহার গৌরব উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিওনা। এদেশের বৃক্ষলতাগণও যে তপস্বী,—এ দেশের প্রতি ধূলিকণা কত মহাপুরুষের, কত অবতারের কত যোগী ঋষি সাধু সন্ন্যাসীর পদে লাগিয়া পবিত্র হইয়া আছে। এ দেশের মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে পারিলেও বিনা সাধনায় জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। ভারতের পবিত্র বক্ষে কত ধর্ম্মসম্প্রদায়,—কত মঠ-মন্দির—কত ধর্ম্মশালা বিরাজ করিতেছে, ঘুরিয়া দেখিয়াছ কি? কত আশ্রম,—কত তীর্থ—কত ত্যাগী বৈরাগী আছে, কোন দিন অনুসন্ধান করিয়াছ কি? এদেশের অশিক্ষিত বালকে পরলোক সম্বন্ধে যে অধ্যাত্মসংস্কার রাখে, অন্য দেশের নামজাদা শিক্ষিত ব্যক্তির তাহা লাভ করিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। এই পতিত দেশে—পতিত জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করা আমরা সমধিক সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। এ দেশে জন্মিয়া বালক কাল হইতে এদেশের সংস্কার লাভ করিয়া তুমি যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ধারণা করিতে পারনা, অন্য দেশের লোক সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসিয়া তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? তুমি তাহাদের কথায় ভুলিয়া—তাহাদের মতে চলিয়া আত্মগৌরব বিনষ্ট করিবে কেন? দুর্ভাগ্য বশতঃ তুমি যাহা

বুঝিতে পারনা ;—তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে সকল তত্ত্ব ধারণা হয়না, তাহা তুমি গ্রহণ করিওনা, কিন্তু অজ্ঞহইয়া তাহার নিন্দা প্রচার করিলে বিজ্ঞ সমাজে অবজ্ঞাত হইবে মাত্র। সর্ব্বাগ্রে শৃঙ্খলাবদ্ধক্রমে জীবন গঠন পূর্ব্বক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কর ; তখন অজ্ঞানের সুস্থূল যবনিকা ভেদ করিয়া দৃষ্টি প্রসারিত হইলে, বুঝিতে পারিবে এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি রাজ্যের সীমা কোথায়—তখন বুঝিতে পারিবে, আর্য্য ঋষিগণের যুগ যুগান্তরের আবিষ্কৃত শাস্ত্রে কি অমূল্য রত্ন সজ্জিত রহিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রের বিশাল কল্পভাণ্ডারে ইহ পরকালের কত অগণিত, অজানিত, অপ্রকাশিত তত্ত্ব স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া—সাধনা করিয়া মানবজন্ম সার্থক ও পরমানন্দ উপভোগ কর। হিন্দুধর্ম্মের বিমল স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত হইয়া ভারতের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তাহার বিজয়দুন্দুভি-বাদ্যে দিগদিগন্তর প্রতিধ্বনিত কর। আমিও এখন বিদায় গ্রহণ করি। এস ভাই! তা'য়ে ভা'য়ে গলা জড়াইয়া ধরিয়া এই পতিত দেশ ও পতিত জাতির মঙ্গলের জন্য কৃপা ভিক্ষা করিয়া, সেই পতিত পাবন, কাঙ্গালশরণ, অধমতারণ, ভয়নিবারণ, সর্ব্বমতবাদ সমঞ্জসী, সত্য-স্বরূপ সনাতন গুরু ব্রহ্মের ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষপ্রদ অতুল রাতুল চরণ উদ্দেশে প্রণাম করি।

নিত্যংশুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্॥

ওঁ শান্তিরেব শান্তি ওঁ

—•:•:•—

সম্পূর্ণ

ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

ওঁ তৎসৎ

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের-রচিত

সারস্বত-গ্রন্থাবলী

——(*)——

দর্শন, বিজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বে জ্ঞানগুরু, যোগ তন্ত্র ও স্বর-শাস্ত্রোক্ত সাধনরহস্যবিৎ পরিব্রাজক পরমহংস শ্রীমদাচার্য্য স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব বিরচিত সারস্বত-গ্রন্থাবলী ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। পুস্তক কয়খানি তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার সুধাময় ফল। সাধন সম্বন্ধে এমন সহজ ও সরলভাবে উচ্চদরের আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর বাহির হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের সার সংগ্রহকরতঃ এই কয়খানি অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পুস্তকগুলি লণ্ডন বৃটিশ মিউজিয়ম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদীয় গুণগ্রাহী সেক্রেটারীমহোদয় পুস্তকগুলির গুণে মুগ্ধ হইয়া বিরাট প্রসংশাপত্রে পুস্তক ও তাহার প্রণেতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়াছেন। ভারতবাসীর আর কথা কি? এমন কি সুদূর ব্রহ্ম, লঙ্কা প্রভৃতি হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীও পুস্তকের গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহ কৃতজ্ঞচিত্তে কত পত্র দিতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশ পুস্তক কয়খানিতে আলোড়িত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে; তাই গ্রন্থকারের এই বিরাট আয়োজন। এই পুস্তক কয়খানি ঘরে থাকিলে আর বিশাল হিন্দুশাস্ত্রগুলি ঘাঁটিয়া মাথা খারাপ করিতে হইবে না; ইহাতে চিত্তশুদ্ধি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সারতথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থোক্ত পন্থায় খৃষ্টান, মুসলমানগণ আপন আপন সাম্প্রদায়িক ভাব বজায় রাখিয়াও সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। পুস্তক দৃষ্টে স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। এই পুস্তকের

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করতঃ সুস্থ ও নীরোগ দেহে অপার আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত মুক্তিপথে অগ্রসর হইবেন। পুস্তক কয়খানি শীঘ্রই হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত ও মানবজীবনের পূর্ণত্ব-সাধনের যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদের এই পুস্তক কয়খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ব্রহ্মচার্য্য-সাধন

অর্থাৎ

ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি; চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে উন্নীত হওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্য চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি এই ব্রহ্মচর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই পুস্তকখানিতে ব্রহ্মচর্য্য সাধনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাহার উপকারিতা বিবৃত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার (বীর্য্যধারণের) কতকগুলি যোগোক্ত সাধনপ্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা **ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন** না করিয়া শিক্ষাভাবে ও সংসর্গ-দোষে ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ও প্রমেহাদি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য স্বরশাস্ত্রোক্ত ও অবধৌতিক ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী সকল শ্রেণীর লোকের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপযোগী করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চিত্রসহ মুদ্রিত। ষষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ॥• আনা মাত্র।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন আসামী ভাষাতেও অনুদিত হইয়াছে। আসামী সংস্করণের মূল্যও ॥• আনা মাত্র।

৺

যোগীগুরু

বা

যোগ ও সাধন পদ্ধতি

পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সূচীগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

প্রথম অংশ—যোগকল্প

দ্বিতীয় অংশ—সাধনকল্প

তৃতীয় অংশ—মন্ত্রকল্প

চতুর্থ অংশ – স্বরকল্প

শ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম, বাম নাসিকার শ্বাস ফল, দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস ফল, সুষুম্নার শ্বাস ফল, রোগোৎপত্তির পূর্ব্বজ্ঞান ও প্রতিকার, নাসিকা বন্ধ করিবার নিয়ম, নিঃশ্বাস পরিবর্ত্তনের কৌশল, বশীকরণ, বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য, রক্ত পরিষ্কার করিবার কৌশল, কয়েকটী আশ্চর্য্য সঙ্কেত, চিরযৌবন লাভের উপায়, পূর্ব্বেই মৃত্যু জানিবার উপায় ও উপসংহার। ষষ্ঠ সংস্করণ, গ্রন্থকারের চিত্রসহ মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

জ্ঞানী গুরু

বা

জ্ঞান ও সাধন পদ্ধতি

ইহাতে জ্ঞান ও যোগের উচ্চাঙ্গ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। সূচীগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

প্রথম খণ্ড—নানাকাণ্ড

ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম্মে বিধি-নিষেধ, গুরুর প্রয়োজনীয়তা, শাস্ত্র বিচার, তন্ত্র-পুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতারহস্য, পূজা পদ্ধতি ও ইষ্টনিষ্ঠা, একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন, হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, হিন্দুদিগের অবনতির কারণ, হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব, গীতার প্রাধান্য, আত্মার প্রমাণ ও দেহাত্মবাদ খণ্ডন, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার, কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ, ঈশ্বর দয়াময় তবে পাপ-প্রণোদক কে? ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

দ্বিতীয় খণ্ড – জ্ঞানকাণ্ড

জ্ঞান কি, জ্ঞানের বিষয়, সাধনচতুষ্টয়, শ্রাবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, দুঃখের কারণ ও মুক্তির উপায়, তত্ত্বজ্ঞান বিভাগ, আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব পুরুষতত্ত্ব,

ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মবিচার, ব্রহ্মবাদ, প্রকৃতি ও পুরুষ, পঞ্চীকরণ, জীবাত্মা ও স্থূলদেহের বিশ্লেষণ, অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রবৃত্তি, ব্রহ্ম ও জীবে বিভিন্নতা, সমাধি অভ্যাস, ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা, ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ।

তৃতীয় খণ্ড—সাধনকাণ্ড

সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুণ্ডলিনীসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ ও তৎ-সাধন, প্রাণায়াম, সহিত প্রাণায়াম, সূর্য্যভেদ প্রাণায়াম, উজ্জায়ী প্রাণায়াম, শীতলী প্রাণায়াম, ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম, ভ্রামরী প্রাণায়াম, মূর্চ্ছা প্রাণায়াম, কেবলী প্রাণায়াম, সমাধি সাধন, কুণ্ডলিনী উত্থাপন বা প্রকৃতি পুরুষযোগ, যোনিমুদ্রা সাধন, ভূতশুদ্ধি সাধন, রাজযোগ বা ঊর্দ্ধরেতার সাধন, নাদ বিন্দুযোগ বা ব্রহ্মচর্য্য সাধন, অজপা গাত্রী সাধন, ব্রহ্মানন্দ রস সাধন, জীবন্মুক্তি, যোগবলে দেহত্যাগ ও উপসংহার।

এই গ্রন্থখানিকে যোগীগুরুর দ্বিতীয় খণ্ড বলা যাইতে পারে। প্রকাণ্ড পুস্তক অথচ পঞ্চম সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারের চিত্রসহ মূল্য ২৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

পুস্তক দুইখানি হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে ও হই-তেছে। আত্মজ্ঞানের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত ও মানব জীবনের পূর্ণত্ব সাধনে যাঁহাদের ইচ্ছা, তাঁহাদিগকে এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তান্ত্রিক গুরু

বা

তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি

এতদ্দেশে তন্ত্রমতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে। সুতরাং এ পুস্তকখানি যে সাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রচলিত যাবতীয় সাধন পদ্ধতি এবং তত্ত্বাদি যুক্তির সহিত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণ, গ্রন্থকারের চিত্রসহ—মূল্য ১৸০ পৌণে দুই টাকা মাত্র

৫ প্রেমিক গুরু

চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ২৲ মাত্র।

৬ মায়ের কৃপা

এই গ্রন্থে মা—কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা অধিকারী ভেদে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীগুরুর কৃপাই যে সাধনা ও সিদ্ধির মূল, তাহা সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। উপদেশগুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি সকল ভাবেই হিন্দু মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ।• চারি আনা মাত্র।

৭ হরিদ্বারে কুম্ভযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী

বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহারই বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কুম্ভযোগ কি, স্থান ও সময়, সাধু সম্মিলনী, কি কি উদ্দেশ্যে কাহার কর্ত্তৃক স্থাপিত, সাধুগণের বিবরণ, ধর্ম্মশালা ও সভাসমিতি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বঙ্গ ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী। মূল্য আনা মাত্র।

৮ তত্ত্বমালা

এই পুস্তকে হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবীর গভীর তত্ত্বসমূহ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতঃ দেখান হইয়াছে—দেবদেবী কি? বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রধানতঃ এই দুইটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত। বর্ত্তমান খণ্ডে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, মহাবিদ্যাতত্ত্ব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় পূজা-পার্ব্বণ ও উৎসবাদির তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ১ম খণ্ড মূল্য ।৵• দশ আনা মাত্র।

৯ তত্ত্বমালা—দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে,—ভগবত্তত্ত্ব, অবতার তত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী ও নন্দযাত্রা, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

১০ সাধকাষ্টক

সাধুসঙ্গই ধর্ম্ম লাভের জনক, পোষক বর্দ্ধক ও রক্ষক। কিন্তু প্রকৃত সাধু চিনিবার ক্ষমতা সাধারণের নাই। তাই সাধুব্যক্তির জীবন চরিত আলোচনা সৎসঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার আজকাল স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল সমাজের লোকের বিশ্বাস, সংসার না ছাড়িলে ধর্ম্মলাভ হইতেই পারে না। ইহাদিগের ভ্রম নিরাস করিয়া গৃহস্থাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পূত জীবন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে জীবনের লক্ষ্য স্থির ও চরিত্র গঠনে সহায়তা হইবে। মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

১১ বেদান্ত-বিবেক

মায়া-মরীচিকাময় দৃশ্য-জগৎ রহস্যের মূল উচ্ছেদ করতঃ যে সকল মুমুক্ষুগণ মুক্তিরূপ অমৃতফল লাভে সচেষ্ট, সেই সকল বিচার-নিপুণশীল বিবেকীদিগের জন্যই এই পুস্তকখানা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে নিত্যানিত্য-বিবেক, দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক, পঞ্চকোষ-বিবেক, আত্মানাত্ম-বিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ॥৶৹ দশ আনা মাত্র।

১২ উপদেশ রত্নমালা

এই পুস্তকখানিতে ঋষি ও সাধু মহাপুরুষদিগের কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-মূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পূর্ণ উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য